প্রায় প্রতি সপ্তাহের 'বেস্ট সেলার' প্রাপ্ত অ্যাডভেঞ্চার সমগ্র

ফ্রান্সিস সমগ্র

অনিল ভৌমিক

সোনার ঘর . শায়িত দেবতাদের মন্দির গর্ভগৃহে ধনভাণ্ডার রাজা আলফ্রেডের স্বর্ণখনি

ফ্রান্সিস সমগ্র (৭)

অনিল ভৌমিক

শায়িত দেবতাদের মন্দির

মাস্তুলের ওপর থেকে নজরদার পেড্রো অনেক আগেই জানিয়েছিল ফ্রান্সিসদের জাহাজ একটা বন্দরের কাছে এসেছে।

ফ্রান্সিস আর মারিয়া জাহাজের রেলিং ধরে দাঁড়িয়েছিল। মারিয়া সূর্যাস্ত দেখছিল। প্রতিদিন জাহাজের ডেকে এসে মারিয়া সূর্যাস্ত দেখে। সমুদ্রে বিরাট বিরাট ঢেউ। তারই মাথায় সূর্য নেমে এসেছে। পশ্চিম দিককার আকাশে কত রঙ ফুটে উঠেছে। সূর্যকে ঘিরে লাল আলোর বলয় যেন। আস্তে আস্তে সেই আলো মিলিয়ে গেল। নামল অন্ধকার।

হ্যারি ফ্রান্সিসের কাছে এল। সঙ্গে শাঙ্কো। হ্যারি বলল, ফ্রান্সিস, এখন কী করবে? বন্দরে জাহাজ ভেড়াবে, নাকি বন্দর ছাড়িয়ে চলে যাবে?

ঠিক বুঝতে পারছি না কোথায় এলাম। এটা তো সবার আগে জানা দরকার। ফ্রান্সিস বলল।

তাহলে তো বন্দরে গিয়ে জাহাজ নোঙর করতে হয়।

তাই করব। তারপর বন্দরে নেমে খোঁজখবর নেব। ফ্রান্সিস বলল।

তাহলে ফ্রেজারকে গিয়ে বলি। হ্যারি বলল।

যাও।

কিছু পরে ফ্রেজার এল। বলল, ফ্রান্সিস, এখন কী করবে?

জাহাজ বন্দরের কাছে নিয়ে চল। নোঙর কর। জাহাজ থেকে নেমে এই বন্দরের নাম জানতে হবে। এটা কোনো দ্বীপ না দেশ জানতে হবে। তাহলেই বুঝব আমরা কোথায় এলাম। এখান থেকে আমাদের দেশই বা কতদূর!

বেশ। জাহাজ নোঙর করছি। ফ্রেজার বলল।

ফ্রেজার জাহাজের গোল হুইল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে জাহাজটা জাহাজঘাটার কাছে নিয়ে এল। নোঙর করল।

সন্ধ্যের খাবার খেয়ে ফ্রান্সিস হ্যারিকে সঙ্গে নিয়ে জাহাজে পাতা কাঠের পাটাতন দিয়ে হেঁটে জাহাজঘাটায় উঠল।

বন্দরটা খুব ছোট না। বেশ কয়েকটা জাহাজ নোঙর করে আছে। চাঁদের আলো উজ্জ্বল। সেই আলোয় দেখল—বাজার মতো এলাকা। ফলটল, জামাকাপড়, দড়ি, পালের কাপড় বিক্রি হচ্ছে।

কাছের দোকানের সামনে এল। দোকানিকে ভাঙা ভাঙা তলতেক ভাষায়

বলল, এই দেশের নাম কী? দোকানি বুঝল না। বলল, বুঝতে পারছি না। এবার হ্যারি হাত-মুখ নেড়ে বোঝাল এই জায়গার নাম কী? এবার দোকানি বুঝল। বলল, আলকাবা। কিন্তু শুধু এইটুকু জেনে তো আন্দাজ করা যাবে না ইউরোপ কতদূর।

কিছুক্ষণ বাজার এলাকায় ঘোরাঘুরি করে দুজনে জাহাজে ফিরে এল। বন্ধুরা এগিয়ে এল। ফ্রান্সিস বলল, বিশেষ কিছু খবর পেলাম না। শুধু জানলাম এ দেশের নাম আলকাবা। মা মেরিই জানেন ইউরোপ থেকে কতদূরে আছি আমরা।

এখানেই ঘোরাঘুরি করি। নিশ্চয়ই হদিস পাব। তখন দেশের দিকে যাত্রা করবো। হ্যারি বলল।

রাতের খাওয়া-দাওয়া শেষ হলো। ফ্রান্সিস কেবিনঘরে এল। মারিয়া বলল, তাহলে কী ঠিক করলে।

এই এলাকায় ঘোরাঘুরি করে জানতে হবে ইউরোপ কোনদিকে। এখান থেকে কতদূর? তারপর দিক ঠিক করে নিয়ে জাহাজ চালাবো। ফ্রান্সিস বলল।

শাঙ্কো আর ওর দু'তিনজন বন্ধু ডেকে উঠে এল। ওখানেই শুয়ে পড়ল। আকাশে উজ্জ্বল চাঁদ, জোর হাওয়া ছুটেছে। শাঙ্কোরা ঘুমিয়ে পড়ল।

শেষ রাতের দিকে হঠাৎ কিসের শব্দে শাঙ্কোর ঘুম ভেঙে গেল। ও কান খাড়া করল। হালের দিকে অস্পষ্ট শব্দ। শাঙ্কো নিঃশব্দে সিঁড়িঘরের আড়ালে গিয়ে দাঁড়াল। একটু পরেই দেখল হাঁটুঝুল চিত্রবিচিত্র আলখাল্লা মতো পরা একজন বয়স্ক লোক নীচে নামার সিঁড়ির দিকে যাচ্ছে। আস্তে আস্তে। নিঃশব্দে। লোকটির আলখাল্লা ভেজা নয়। তাহলে বয়স্ক লোকটি নৌকোয় চড়ে এসেছে।

শাঙ্কো দ্রুতপায়ে এসে লোকটির সামনে দাঁড়াল। লোকটি বেশ চমকেই উঠল। শাঙ্কো বলল, আপনি কে?

লোকটি আস্তে আস্তে বলল, আমি রাজপুরোহিত পিরেল্লো।

আমাদের জাহাজে কীভাবে এলেন?

গাছের গুড়ি কুঁদে বানানো আমার নৌকোয় চড়ে।

কেন এলেন? শাঙ্কো জানতে চাইল।

তোমরা কারা? পিরেল্লো জিগ্যেস করলেন।

আমরা ভাইকিং। শাঙ্কো বলল।

আমি তোমাদের জাহাজটা দেখলাম। কোনো পতাকা উড়ছে না। বুঝলাম তোমরা দূর দেশের মানুষ। আমিও সেটাই চেয়েছিলাম। আমি ঠিক করেছি কাছাকাছি নয়, দূরের কোন দেশে চলে যাব। পিরেল্লো বললেন।

আপনি রাজপুরোহিত। কত সম্মান আপনার। দেশের লোক আপনাকে কত ভক্তি-শ্রদ্ধা করে। তবে কেন দেশত্যাগ করতে চাইছেন? শাঙ্কো জানতে চাইল।

সে অনেক কথা। পিরেল্লো বললেন।

ততক্ষণে শাঙ্কো আর রাজপুরোহিতকে ঘিরে কয়েকজন ভাইকিং বন্ধুও দাঁড়িয়েছে। রাজপুরোহিত বললেন, তোমাদের দলনেতা কে? তার সঙ্গে কথা বলব।

ঠিক আছে। আপনি এখানে অপেক্ষা করুন। আমাদের দলনেতাকে নিয়ে আসছি।

শাঙ্কো ফ্রান্সিসের কেবিনঘরের সামনে এল। দরজায় টোকা দিল।

কে? ফ্রান্সিসের গলা।

ফ্রান্সিস, একটু এসো। এদেশের রাজপুরোহিত আমাদের জাহাজে এসেছেন তোমার সঙ্গে কথা বলতে চান।

আসছি।

ফ্রান্সিস কেবিনঘর থেকে বেরিয়ে এল। পেছনে মারিয়াও এল।

ডেকে উঠে এল দুজনে। আসবার সময় শাঙ্কো ফ্রান্সিসকে রাজপুরোহিতের সঙ্গে যা কথা হয়েছে তা বলল।

ফ্রান্সিস রাজপুরোহিত পিরেল্লোর সামনে এসে দাঁড়াল।

আপনার কথা বন্ধুর মুখে শুনলাম। আপনি কী চান, স্পষ্ট করে বলুন। ফ্রান্সিস বলল।

আমি আপনাদের জাহাজে আশ্রয় চাইছি।

কেন?

আমি সাতটি দেবতার মূর্তি চুরি করে এনেছি। এই আলকাবা দেশ থেকে পালাতে চাই। মূর্তিগুলো গালালে প্রচুর সোনা পাব। তাই দিয়ে আরামে বাকি জীবনটা নিজের দেশ পর্তুগালে কাটাতে পারব।

ফ্রান্সিস একটু চুপ করে থেকে বলল, সেই সাতটি দেবতার মূর্তি কোথায়?

আমার নৌকোয় রেখেছি। পিরেল্লো বললেন।

ঠিক আছে। বিস্কোকে বলল, যাও তো মূর্তিগুলো নিয়ে এসো।

বিস্কো চলে গেল। পিরেল্লো বললেন, তাহলে এই সুযোগে আপনি আমার মূর্তিগুলো নিয়ে নেবেন মানে চুরি করবেন।

ফ্রান্সিস রেগে গেল, চোর আপনি। কোনো চোরকে আমরা আমাদের জাহাজে আশ্রয় দিই না।

তাহলে আমার মূর্তিগুলো রেখে আমাকে তাড়িয়ে দেবেন?

আমি চোরের উপর বাটপাড়ি করব না। এই মূর্তির সঠিক মালিক আলকাবার রাজা। মূর্তিগুলো তাঁকেই দিয়ে দেব। আর আপনি মূর্তিগুলো চুরি করেছেন এটাও বলব। তারপর রাজা যা করার করবেন।

বিস্কো একটা বোঁচকা কাঁধে করে ফিরে এল।

তখন ভোর হয়েছে। সূর্যের আলো পড়েছে জাহাজে, সমুদ্রের জলে, আকাশে। চারদিক ঝলমল করছে।

ফ্রান্সিস বোঁচকা থেকে একটা মূর্তি বের করল। কী সুন্দর মূর্তি। ফ্রান্সিসরা অবাক হয়ে দেখল মূর্তির মাথায় মুকুট, গায়ে নানারকম কাপড়ের টুকরো দিয়ে তৈরি আলখাল্লা। বাকি মূর্তিগুলো আর খোলা হল না।

ফ্রান্সিস রাজপুরোহিতকে জিগ্যেস করল, বলুন, এখন আপনি কী করতে চান?

এই সাতটি মূর্তি নিয়ে আপনাদের জাহাজে চড়ে পালাব।

ফ্রান্সিস হ্যারির দিকে তাকাল। বলল, হ্যারি কী করবে বল।

হ্যারি বলল, দেখুন রাজপুরোহিত, আমরা আগেই বলেছি কোনো চোরকে আমরা আশ্রয় দিই না। আপনাকেও আশ্রয় দেওয়া হবে না। আপনি একটু ভাঙা-ভাঙা পর্তুগীজ ভাষায় কথা বলছেন। আপনি এ দেশের অধিবাসী নন। তাহলে আপনি কি করে এখানে এলেন? আর কিভাবেই বা রাজপুরোহিত হলেন?

আপনার অনুমান ঠিক। আমি পর্তুগীজ। দাস-ব্যবসায়ীদের হাতে ধরা পড়েছিলাম। এক দুঃসহ পরিবেশে জাহাজের নীচের খোলে বন্দী হয়ে ছিলাম। আমাদের দলনেতার নির্দেশে এক রাতে আমরা বিদ্রোহ করলাম। লোহার গরাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম একসঙ্গে। একটা লোহার গরাদ আমাদের চাপে নড়ে গেল। ঐ গরাদের ওপরেই আমরা ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগলাম। গরাদটা খুলে গেল। আমরা নিরস্ত্র। দাস-ব্যবসায়ীর রক্ষীরা আমাদের আটকাতে চেষ্টা করল। আমরা ওদের হাত থেকে তরোয়াল ছিনিয়ে নিলাম। ওদের সঙ্গে লড়াই করলাম। অনেক রক্ষী মারা গেল। আমাদের মধ্যেও অনেকের মৃত্যু হল। আমি সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। রাতের অন্ধকারে সাঁতরাতে-সাঁতরাতে তীরে এলাম। একটু থেমে আমার বলতে লাগলেন, তীরভূমির চারদিকে তাকিয়ে অন্য বন্দীদের কাউকে দেখতে পেলাম না। আমি বালিয়াড়ির ওপর শুয়ে রইলাম। ক্রমে ভোর হল। চারদিকে আলো ছড়াল। বারবার চারপাশে দেখলাম। সঙ্গীরা বোধহয় দূরে কোথাও তীরে উঠেছে। যাই হোক, এভাবেই আমি আলকাবায় এলাম।

পিরেল্লো থামলেন। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ফের শুরু করলেন, বেলা বাড়ল। জন-বসতিতে এলাম। খিদেয় পেট জ্বলছে। এক পাত্র জলও খেতে পারিনি। একটা ঘর দেখলাম। অন্যরকম। নারকেলপাতার ছাউনি। দেয়াল কাঠ কেটে তৈরি। মেঝে মাটির।

ঘরটার দরজায় টোকা দিলাম। পর্তুগীজ ভাষায় বললাম, আমি খুব ক্ষুধার্ত। কিছু খেতে দিন। একবার দু'বার বললাম। ভিতর থেকে গম্ভীর গলায় কে পর্তুগীজ ভাষায় বললেন, চলে এসো। দরজা খোলা।

আমি ঘরটায় ঢুকলাম। অন্ধকারটা চোখে সয়ে আসতে দেখি একজন বয়স্ক লোক গাছের ডাল কেটে তৈরি বিছানায় শুয়ে আছেন। তাঁর মাথার চুল, দাড়ি, গোঁফ সব সাদা। লোকটি বলল, ডানদিকে দেখ একটা টেবিল। তাতে খাবার ঢাকা দেওয়া আছে। যতটা খেতে পারো খাও।

কথামতো আমি টেবিলটার কাছে গেলাম। সেটাও বিছানার মতো গাছের ডাল কেটে করা। তার ওপর ঢাকা দেওয়া কয়েকটি মাটির পাত্র। ঢাকনা খুলে দেখলাম কিছু রুটি। অন্যটায় মাছের ঝোল। অন্য দুটো পাত্রে ভাজা-টাজা।

আমি খেতে বসে গেলাম। খাচ্ছি, তখন বৃদ্ধ বললেন, তুমি পর্তুগীজ?

হ্যাঁ।

এখানে কি করে এলে?

আমি তাঁকে সব বললাম। ক্রীতদাস বেচাকেনার হাটে আমাদের নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। আমরা কি করে পালিয়ে এসেছি শুনে উনি বললেন, এখানে থাকবে স্থির করেছো?

হ্যাঁ। উপায় কী?

কিন্তু তুমি তো পর্তুগীজ। এখানকার ভাষা জানো না। কী করবে তুমি?

আসার সময় দু'পাশে দেখেছি তুলার খেত। সে সব খেতেই কোনো কাজ নেব। আমি বললাম।

দরকার নেই। একটা কথা, তোমাকে আমি বিশ্বাস করতে পারি?

নিশ্চয়ই পারেন। আমি বললাম।

তাহলে শোন, আমি রাজপুরোহিত হোমক। তুমি আমার সহকারী হিসেবে কার করবে? রাজি?

হ্যাঁ, রাজি। আমি সাগ্রহে উত্তর দিলাম।

হোমক আস্তে আস্তে বিছানা থেকে উঠলেন। বললেন, তুমি এখানকার পূজিত সাতটি দেবতার কথা জানো না?

না। আমি বললাম।

ঠিক আছে। আমি সব শিখিয়ে-পড়িয়ে নেব। আমি মন্দিরে তাঁদের পুজো করতে যাচ্ছি। তুমি এখানেই থাকবে। খিদে পেলে আরো খাবে। আমি কিছুক্ষণ পরে ফিরে আসছি।

হোমক বেরিয়ে গেলেন।

তারপর? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

তারপর হোমকের শিষ্য হয়ে আমি তাঁকে পুজোর সময় সাহায্য করতে লাগলাম। আমার থাকা-খাওয়ার কোনো অসুবিধেই আর হল না। আমার পুরোহিতের কাজ শেখা হয়ে গেল। হঠাৎ হোমক অসুস্থ হয়ে পড়লেন, আমিই পুজোর কাজ চালাতে লাগলাম। রাজবৈদ্য হোমকের চিকিৎসা করতে লাগলেন। কিন্তু তাঁকে সুস্থ করতে পারলেন না। রাজ পুরোহিত হোমক মারা গেলেন।

এবার এখানকার রাজা কানবহনা আমাকে রাজপুরোহিত করলেন। প্রতিদিন রাজপুরোহিতের কাজ করে আমার বেশ ভালোই দিন কাটছিল।

ফ্রান্সিস বলল, এই সাতটি দেবতারই পুজো করতেন আপনি?

হ্যাঁ। রাজপুরোহিতের সব দায়িত্বই আমি পালন করতাম। একটা কথা বলা

হয়নি। যে রাতে হোমক মারা যান সেই রাতে হঠাৎই আমাকে হাতের ইশারায় বিছানার কাছে যেতে বললেন। আমি গেলাম। উনি আমাকে কান পাততে বললেন। আমি মাথা নিচু করলাম। থেমে থেমে উনি বললেন, আমার লতাপাতায় তৈরি বাক্সটায় একটা চামড়ার টুকরো পাবে। তাতে অতীতের এক রাজা—রাজা হানম, যিনি এই মন্দির তৈরি করিয়েছিলেন তিনি প্রাচীন স্প্যানিশ ভাষায় লিখে গেছেন একটা ছড়া।

ছড়াটা মনে আছে আপনার? ফ্রান্সিস জিগ্যেস করল।

হ্যাঁ। পিরেল্লো বললেন।

শোনান তো ছড়াটা। ফ্রান্সিস বলল।

পিরেল্লো বললেন ঃ

ছোট্ট সাজের ঘরে
রেখেছি বড় আদরে।
ধনসম্পদ কার তরে?
বুদ্ধিমান উদ্ধার করে।
বোকারা হা-হুতাশ করে।

ফ্রান্সিস বলল, সহজ ছড়া। ধনসম্পদের কথা বলা হয়েছে। সেই গুপ্ত ধনসম্পদ উদ্ধারের জন্যে এই ছড়াটা খুব কাজে লাগবে বলেই মনে হয়।

আমারও তাই মনে হয়। পিরেল্লো বললেন।

এই ছড়াটা পাওয়ার পর আপনি কি পুজোর ঘরে, সাজঘরে খোঁজাখুঁজি করেছিলেন?

হ্যাঁ। কিন্তু কোনো হদিস করতে পারিনি। পিরেল্লো বললেন।

আপনি দেবতার মূর্তি চুরি করে পালাতে চাইছেন কেন? হ্যারি বলল।

কতদিন এই বিদেশে পড়ে আছি। ভালো লাগছিল না। শুধু পর্তুগাল চলে যেতে মন চাইছিল।

দেবতার মূর্তিগুলো চুরি করে নিয়ে যাচ্ছিলেন কেন? ফ্রান্সিস বলল।

মূর্তিগুলো নিখাদ সোনায় তৈরি। বিক্রি করলে খুব ভালো দাম পাবো এই আশায়। পিরেল্লো বললেন।

ফ্রান্সিস হ্যারিকে বলল, এঁকে নিয়ে কী করবে?

এখানকার রাজা কানবহনার কাছে ওঁকে নিয়ে চল। দেবতার মূর্তির কথা বলব। মূর্তিগুলো পেলে রাজা যা করতে চাইবেন করবেন। এ দেশের যা বিচার তাই-ই হবে। একটা চোরের সঙ্গে আমরা কোনো সম্পর্ক রাখতে চাই না। হ্যারি বলল।

তাহলে সকালের খাবার খেয়ে রাজসভায় চলো। ফ্রান্সিস বলল।

ঠিক আছে, তাই চলো। হ্যারি বলল।

খাওয়া-দাওয়ার পর হ্যারি পিরেল্লোকে বলল, আমাদের রাজসভায় নিয়ে চলুন।

পিরেল্লো হাউ-মাউ করে কেঁদে উঠলেন। বললেন, এই দেশের যা আইন তাতে যে অপরাধ আমি করেছি তার জন্য ফাঁসি দেওয়া হবে। আমাকে রাজার কাছে নিয়ে যাবেন না।

এছাড়া উপায় নেই। হ্যারি বলল। পিরেল্লো কাঁদতে লাগলেন।

পিরেল্লো দেবতার মূর্তি বোঝাই পোঁটলাটা কাঁধে নিলেন। ফ্রান্সিস, হ্যারি আর শাঙ্কো এগিয়ে এল।

দড়ির মই বেয়ে চারজনে জাহাজের সঙ্গে বেঁধে রাখা ছোট্ট নৌকোয় নেমে বসল। ফ্রান্সিস বৈঠা বাইতে লাগল। অল্পক্ষণের মধ্যেই নৌকো তীরে পৌঁছল।

তীরে উঠল সবাই। পিরেল্লো পশ্চিমমুখে হাঁটতে লাগলেন।

বেশ কিছুক্ষণ পরে ওরা রাজবাড়ির সামনে এল।

রাজবাড়ির সামনে বেশ ভিড়। ফ্রান্সিসরা বিচারসভার ঘরের সামনে এল। ফ্রান্সিস পিরেল্লোকে বলল, আমাদের ভেতরে নিয়ে চলুন।

দরজায় পেতলের বর্শা হাতে দুই প্রহরী দাঁড়িয়ে। ওরা পিরেল্লোকে দেখে মাথা একটু নোয়াল। পিরেল্লো ওদের সঙ্গে কথা বলে ফ্রান্সিসদের বললেন, আসুন।

চারজনে রাজসভায় ঢুকল। পাথর দিয়ে তৈরি ঘরের ভেতরটা বেশ অন্ধকার অন্ধকার। রাজা কাঠের সিংহাসনে বসে আছেন। সিংহাসনের গদিটা পাখির পালক দিয়ে তৈরি। দু'পাশে মন্ত্রী, সেনাপতি ও অমাত্যরা। পিরেল্লো তখন প্রায় কাঁদতে শুরু করেছেন। চাপা গলায় বারবার বলছেন, আমাকে চলে যেতে দিন। নইলে আমাকে রাজা মৃত্যুদণ্ড দেবেন।

উপায় নেই। অভিযুক্ত হলেও রাজা আপনাকে মুক্তি দেবেন। ফ্রান্সিস বলল।

অসম্ভব। আমার নিশ্চিত মৃত্যু। পিরেল্লো বললেন।

দেখা যাক। তবে মূর্তিগুলো ফেরৎ পেলে রাজা খুশিই হবেন। হয়তো আপনাকে সাধারণ শাস্তি দেবেন।

না-না। আমাকে মরতে হবে। পিরেল্লো কাঁদো-কাঁদো স্বরে বললেন।

বললাম তো দেখা যাক। ফ্রান্সিস বলল।

হ্যারি ডাকল, ফ্রান্সিস।

বলো।

দেখ এই আলকাবা দেশ আমাদের কাছে বিদেশ। এখানে কে কী চুরি করল সে-সব ব্যাপারে আমরা জড়াব কেন?

তাই বলে একটা চোরকে জেনে-শুনে পালাতে দেব? ফ্রান্সিস বলল।

এ-ব্যাপারে আমাদের না জড়ানোই ভালো। তুমি পিরেল্লোকে ছেড়ে দাও। উনি যেখানে যেতে চান যান।

ফ্রান্সিস পিরেল্লোকে বলল, আপনিও এটাই চান?

হ্যাঁ। একবার আমার ব্যাপারটা রাজার কানে গেলে আমার রেহাই নেই।

আপনি যে মূর্তিগুলো চুরি করেছেন সে-সব ঠিক জায়গায় রেখে দেবেন? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

নিশ্চয়ই রেখে দেবো। পিরেল্লো বললেন।

আমাদের ধোঁকা দিয়ে মূর্তি নিয়ে পালাবেন না তো? হ্যারি বলল।

না-না। আপনারা যা বলবেন আমি তাই শুনবো।

ঠিক আছে। এবার আমি রাজার সঙ্গে কথা বলবো। আপনি ব্যবস্থা করে দিন। ফ্রান্সিস বলল।

দেখছি। বলে পিরেল্লো এগিয়ে গেলেন। একজন বৃদ্ধ অমাত্যের কাছে গিয়ে মুখ নিচু করে কী বললেন। বৃদ্ধ অমাত্যটি আসন থেকে উঠে রাজার কাছে গেলেন। রাজাকে কী বললেন। রাজা মাথা নেড়ে সায় দিলেন। যিনি বিচারপ্রার্থীদের নাম ডাকছিলেন বৃদ্ধ অমাত্য তাঁকে ডেকে কিছু বললেন। তিনি এবার ডাকলেন, রাজপুরোহিত যাঁদের নিয়ে এই সভায় এসেছেন তাঁরা এগিয়ে আসুন।

ফ্রান্সিস আর হ্যারি রাজার কাছে এগিয়ে এল। ফ্রান্সিসরা মাথা একটু নুইয়ে রাজাকে সম্মান জানাল। রাজা খুশি হলেন। বললেন, শুনলাম তোমরা বিদেশী।

আজ্ঞে হ্যাঁ, আমরা জাতিতে ভাইকিং। আপনার রাজপুরোহিতের সঙ্গে আমাদের হঠাৎই পরিচয় হয়েছে। তিনি জানালেন আপনাদের এক মন্দিরে নীচের ঘরে রাজা হানম ধনসম্পদ গোপনে রেখে গেছেন।

হুঁ। আমাদের বংশের অনেকেই সেই ধনভাণ্ডার খুঁজেছিলেন। কিন্তু কেউ উদ্ধার করতে পারেননি।

পিরেল্লোর গুরুদেব রাজপুরোহিত হোমক মৃত্যুর পূর্বে পিরেল্লোকে চামড়ার ওপর লেখা একটা ছড়া দিয়ে গিয়েছিলেন।

পিরেল্লো তো এ-কথা আমাদের বলেননি। রাজা পিরেল্লোর দিকে তাকিয়ে বললেন।

মান্যবর রাজা, আমি ঐ ছড়াটার কোনো গুরুত্ব দিইনি। পিরেল্লো বললেন।

ঠিক আছে। তোমরা কী বলতে চাও। রাজা ফ্রান্সিসকে জিগ্যেস করলেন।

আমাদের যদি আপনার রাজত্বের যেখানে খুশি যাওয়ার অনুমতি দেন তবে আমরা সেই গুপ্ত ধনভাণ্ডার উদ্ধার করতে পারবো।

বলো কি! রাজা বেশ আশ্চর্য হলেন। বললেন, তোমরা পারবে?

এখনই খুব জোর দিয়ে বলতে পারছি না। এক সপ্তাহের মধ্যে সব দেখেশুনে বিচার-বিবেচনা করে সঠিক বলতে পারব ঐ ধনসম্পদ উদ্ধার করতে পারব কি না। ফ্রান্সিস বলল।

বেশ, সেই চেষ্টা কর, আর তোমাদের স্বাধীন গতিবিধির জন্যে সেনাপতিকে বলে দিচ্ছি। রাজা বললেন।

মহামান্য রাজা, আর একটা নিবেদন। ফ্রান্সিস বলল।

বলো কী নিবেদন। রাজা জানতে চাইলেন।

আলকাবা বন্দরে আমাদের জাহাজ নোঙর করে আছে। অতদূর থেকে যাতায়াত করা অসুবিধেজনক। এখানে আপনার প্রাসাদে যদি একটা ঘরে আমাদের থাকতে দেন তাহলে খুবই ভালো হয়। ফ্রান্সিস বলল।

বেশ। রাজা বললেন। তারপর ইশারায় সেনাপতিকে ডাকলেন। সেনাপতি আসন ছেড়ে দ্রুত রাজার কাছে এলেন। রাজা ফ্রান্সিসদের ব্যাপারে সেনাপতিকে সব বললেন। সেনাপতি রাজার কথা শুনে ফ্রান্সিসদের কাছে এল। বললে আপনারা আমার সঙ্গে আসুন।

ফ্রান্সিসরা আবার রাজাকে সম্মান জানিয়ে রাজসভা থেকে বেরিয়ে এল। রাজবাড়ির বাইরে বিরাট মাঠ, কয়েকজন অশ্বারোহী সৈন্য সেই মাঠে ঘোড়া চালানো অভ্যেস করছিল। সেনাপতি একজনকে ডাকলেন। সৈনিকটি কাছে এলে সেনাপতি বললেন। এই তিনজন ভাইকিং-এর থাকবার মতো একটা ভালো ঘর দেখ। এদের সেখানে নিয়ে যাও। সেনাপতি রাজপুরোহিত পিরেল্লোকে বললেন, আপনার তো কোনো ঘরের প্রয়োজন নেই।

না-না। আমার থাকা-খাওয়ার কোনো অসুবিধে নেই। পিরেল্লো বললেন।

যাও। সেনাপতি বলল।

সৈন্যটি ফ্রান্সিসদের একটা ঘরের সামনে নিয়ে এল। বলল, এই ঘরটা খুবই ভালো। এখানেই আপনারা থাকবেন।

ফ্রান্সিস, শাঙ্কো ও হ্যারি ঘরটায় ঢুকল। সত্যিই বেশ খোলামেলা সুন্দর ঘর। মেঝেয় খড়ের বিছানা। ফ্রান্সিস বসে পড়ল। শাঙ্কো, হ্যারিও বসল। সৈন্যটি বলল, খাওয়ার সময় আপনাদের ডেকে নিয়ে যাবো। মাননীয় সেনাপতি আমাকেই দায়িত্ব দিয়েছেন আপনাদের দেখাশোনার জন্যে। কোনো প্রয়োজন পড়লে আমাকে ডাকবেন।

সৈন্যটি চলে গেল।

এতক্ষণ পিরেল্লো দেবমূর্তি ভরা বোঁচকাটা কাঁধে নিয়ে ফ্রান্সিসদের সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন। ওঁর ভয় ফ্রান্সিস না সেনাপতিকে বলে দেয় যে তিনি চোর। দেবমূর্তি চুরি করে নিয়ে পালাচ্ছিলেন। দেখলেন ফ্রান্সিস কাউকে কিছু বলল না।

এবার ফ্রান্সিস পিরেল্লোকে বলল, দুপুরের খাওয়া সেরে আমরা যাব মন্দিরে। দেবমূর্তিগুলো যেখানে ছিল সেখানেই রাখা হবে।

কী, রাজি তো? শাঙ্কো বলল।

হ্যাঁ-হ্যাঁ তাই চলুন। পিরেল্লো বললেন।

দুপুরের খাবার খেয়ে দরজা বন্ধ করে বাইরে বেরিয়ে এল সবাই।

মন্দিরে চলুন। ফ্রান্সিস বলল।

চলুন, আমি নিয়ে যাচ্ছি। পিরেল্লো বললেন।

পিরেল্লো পুবমুখো চললেন। সবাই যেতে লাগল। রাজারবাড়ির চৌহদ্দি

ছাড়িয়ে ওরা হাঁটতে লাগল। সূর্যের আলো চড়া। ওরা ঘেমেনেয়ে উঠল। কিন্তু যাচ্ছে তো যাচ্ছেই। হ্যারি জিজ্ঞেস করল—ও ঠাকুরমশাই আর কতদূর যেতে হবে?

—আর একটুখানি। যে বনটা দেখা যাচ্ছে—ওটার মধ্যেই মন্দির।

হাঁটতে হাঁটতে বনের কাছে এল ওরা। ঘন ঘন গাছপালা নয়, বেশ ছাড়া ছাড়া গাছগাছালি। বনের মধ্যে ঢুকল সবাই। সূর্যাস্ত হতে বেশী দেরি নেই। বনের নীচে অন্ধকার জমেছে।

—মন্দির কোথায়? ফ্রান্সিস জিজ্ঞেস করল।

—এই সামনেই। পিরেল্লো বললেন।

হঠাৎ সামনেই দেখা গেল গাছ কেটে এক উঠোনমতো জায়গা। চারধারে বাড়িঘর। পাতায় ছাওয়া। গাছের কাটা ডাল দিয়ে তৈরি বাড়ি। উঠোনমতো জায়গায় গাছের ছাল বিছোনো। তার ওপর এক বৃদ্ধ বসে আছে। হঠাৎ পিয়েল্লো গলা চড়িয়ে কী বলে উঠল। বাড়িঘর থেকে বন থেকে বেশ কিছু লোক ছুটে এল। তারা ফ্রান্সিসদের ঘিরে দাঁড়াল। ফ্রান্সিস মৃদুস্বরে বলল—হ্যারি—পিরেল্লো বিশ্বাসঘাতক।

পিরেল্লো গাছের ছালের ওপর বসা লোকটির কাছে গেলেন। কী কথাবার্তা বলল দুজনে। ফ্রান্সিসরা দেখল—লোকগুলোর চেহারা একটু অদ্ভুত। মাথায় টানটান বাঁধা চুল। গালে লালচে রঙের দাড়ি গোঁফ। চোখগুলো বেশ গোল গোল। কারো কারো হাতে বর্শা।

পিরেল্লো ফ্রান্সিসদের কাছে এল। সেই মাটিতে বসা লোকটিকে দেখিয়ে বলল—উনিই এদের দলপতি। এরা বুনো। ভীষণ হিংস্র। আমার ওপরে খুব ভক্তি।

—তাহলে এখানে মন্দির নেই। শাঙ্কো বলল।

পিরেল্লো দাঁত বের করে হাসল। বলল—না। আপনাদের চারপাঁচদিন এখানে আটকে রাখার জন্য এনেছি। আমি কথাবার্তা শুনেই বুঝতে পেরেছি শুধু আপনারা আপনাদের রাজা হানমের গুপ্তসম্পদ খুঁজে বের করতে পারবেন। কাজেই আপনাদের কোনভাবে গুপ্তধন উদ্ধারের সুযোগ দেওয়া হবে না। আমিই দুজন ভক্ত নিয়ে ঐ গুপ্তধন উদ্ধার করবো।

—ভালো কথা। ফ্রান্সিস বলল—আপনারাই যদি উদ্ধার করতে পারেন তাহলে আমাদের ওপর সেই ভার দিতে চাইছিলেন কেন?

—বাজিয়ে দেখছিলাম। পিরেল্লো হেসে বললেন।

—কী দেখলেন। হ্যারি বলল।

—আপনারা গর্দভ।

—তা ঠিক। নইলে জানা নেই। শুনো নেই আপনাকে বিশ্বাস করে বসলাম।

—আমরা মানুষকে বিশ্বাস করে থাকি। আমরা ইচ্ছে করলে আপনাকে

ফাঁসিতে ঝোলাতে পারতাম। কিন্তু আমরা করিনি। কারণ আপনি চোর হলেও আমাদের আশ্রয়প্রার্থী। তাই আপনাকে বাঁচালাম।

—যাই হোক—গুপ্তধন আপনি উদ্ধার করতে পারবেন না। অত তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, চিন্তাশক্তি আপনার নেই। তবু দেখুন চেষ্টা করে। শাঙ্কো বলল।

—চেষ্টা তো করি। দেখি। এবার তোমাদের কয়েদঘরে ঢোকানো হবে। পিরেল্লো বললেন। পিরেল্লো বুনোদের ভাষায় কী বললেন গলা তুলে। কয়েকজন যোদ্ধা এগিয়ে এল। দাঁড়াল ফ্রান্সিসদের সামনে। ওরা ইঙ্গিত করল কয়েদঘরে ঢোকার জন্যে। শাঙ্কো বলল—কী করবে ফ্রান্সিস?

—যা করতে বলছ কর। সুযোগের জন্য অপেক্ষা করতে হবে। ফ্রান্সিস বলল।

ফ্রান্সিসরা এগিয়ে চলল যোদ্ধাদের নির্দেশমতো। কয়েদঘরের কাছাকাছি এসেছে তখন বোঁচকা কাঁধে পিরেল্লো ওদের কাছে এল। হেসে বলল—এবার রাজা হানমের গুপ্তধনের স্বপ্ন দেখোগে। ঐ স্বপ্ন দেখতে দেখতেই একদিন মরে যাবে। গুপ্তধন আর পাওয়া যাবে না।

ফ্রান্সিসরা কিছু বলল না। শাঙ্কো এক কাণ্ড করল। ও পিরেল্লোর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। পিরোল্লোর বোঁচকা এক হ্যাঁচকা টানে নিয়ে নিল। বোঁচকা ছুঁড়ে ফেলল কয়েদঘরের মধ্যে। পিরেল্লো পর্তুগীজ ভাষায় চিৎকার করে—চোর, চোর—আমার বোঁচকা চুরি করেছে। যোদ্ধারা কয়েদঘরের দরজা বন্ধ করে দিল। পিরেল্লোর কথা ওরা কিছুই বুঝল না।

এবার পিরেল্লো নিজেই কয়েদঘরের সামনে এল। বারবার বলতে লাগল—আমার বোঁচকা ফিরিয়ে দাও।

—তার আগে আমি দলপতির সঙ্গে কথা বলবো। ফ্রান্সিস বলল।

—বেশ। সে ব্যবস্থা আমি করে দেব। দলপতি এই উঠোনেই গাছের বাকলের বিছানায় দিনরাত শুয়ে থাকে। অবশ্য কখনও কখনও উঠে বসে। সে অল্পক্ষণ। তারপরেই শুয়ে পড়ে।

—দলপতি কোথাও যায় না? হ্যারি জানতে চাইল।

—দলপতি যখন বসে থাকে তখনই আমাকে কথা বলিয়ে দিন। ফ্রান্সিস বলল।

—সে ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। তার আগে আমার বোঁচকাটা দাও। পিরেল্লো বলল।

—না। আগে দলপতির সঙ্গে কথাবার্তা, তারপর। ফ্রান্সিস বলল।

—ঠিক আছে। আমি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি তারপর—পিরেল্লো বললেন।

—হ্যাঁ, তারপর যা কিছু ঘটুক। ফ্রান্সিস বলল।

দুপুরে খাবার দিল অন্য লোকেরা এনে। একটা বড় শুকনো পাতায় রুটির মতো কিছু সঙ্গে তারকারি আর পুঁটি মাছের মতো মাছ। বরাবরের মতো ফ্রান্সিস

বলল—পেটপুরে খাও। খেতে ভালো না লাগলেও খাও। শরীরের শক্তি ঠিক রাখো।

খাওয়া শেষ। ফ্রান্সিসরা অপেক্ষা করতে লাগল কখন দলপতি উঠে বসে। একসময় দেখল উঠানের বিছানা ছেড়ে দলপতি উঠে বসেছে। পিরেল্লো কাছেই ছিল। ছুটে কয়েদঘরের সামনে এল। বলল, দলপতি উঠে বসেছে। চলো। একজন পাহারাদারকে বলল—দরজা খুলে দাও। পাহারাদার দরজা খুলে দিল। ফ্রান্সিস আস্তে বলল—হ্যারি থাকো। শাঙ্কো বোঁচকা নিয়ে আমার সঙ্গে এসো।

দুজনে কয়েদঘরের বাইরে এল। শাঙ্কোর মাথায় বোঁচকা। পিরেল্লো ছুটে এল। বলল—বোঁচকাটা আমাকে দাও। শাঙ্কো এক ধাক্কায় ওকে সরিয়ে দিল। পিরেল্লো তবু পিছু ছাড়ল না।

তিনজনেই দলপতির কাছে এল। পিরেল্লো মুখ নিচু করে দলপতিকে কী বলল। দলপতি মুখ তুলে ফ্রান্সিসদের দিকে তাকাল। কিছু বলল। কিন্তু ফ্রান্সিসরা কিছুই বুঝতে পারল না। পিরেল্লোকে বলল—আপনি দলপতিকে কী বললেন। উনিই বা আমাকে কী বললেন?

—আমি বললাম—তোমরা চোর। আমার বোঁচকা নিয়ে পালাবার জন্যে চেষ্টা করছো।

এই সময় একজন দাড়ি গোঁফ কাটা লোক এল। উঠোনে এসে দাঁড়াল। তারপর দলপতির পাশে এসে বসল। দলপতিকে কী বলল। দলপতি মাথা ঝাঁকাল। দলপতি আর আগত লোকটি কথাবার্তা বলতে লাগল। পিরেল্লোকে দেখে বলল—ভাঙা ভাঙা পর্তুগীজ ভাষায়। লোকটি বলল—কী ব্যাপার পুরুতমশাই। আপনি এখানে কেন?

—আমি সমস্যায় পড়েছি। পিরেল্লো প্রায় কাঁদ কাঁদ স্বরে বলল।

—কী সমস্যা? লোকটি বলল।

ফ্রান্সিসদের দেখিয়ে বলল—এরা আমার বোঁচকা চুরি করেছে।

ফ্রান্সিসদের দিকে তাকিয়ে লোকটি বলল—আপনারা—চুরি—পুরুতমশাই বলছেন।

—আমরা চুরি করিনি। কেড়ে নিয়েছি। শাঙ্কো বলল।

—কিন্তু কেন? লোকটি বলল।

—আমরা চুরি করা জিনিস কেড়ে নিয়েছি। শাঙ্কো বলল।

—তাহলে—পুরুতমশাই—চুরি—।

বাজে কথা—মিত্তাল। আমি চুরি করিনি।

রাজামশাই আমার কাজে সন্তুষ্ট হয়ে আমাকে দিয়েছেন। পিরেল্লো বললেন।

ফ্রান্সিস বলল—অসম্ভব। শায়িত দেবতাদের মূর্তি কখনো রাজা বিকিয়ে দেবেন না। পিরেল্লো চুরি করেছেন।

—সেই মূর্তিগুলো কোথায়? মিত্তাল জানতে চাইল।

—শাঙ্কো—মূর্তি বের কর। ফ্রান্সিস বলল।

শাঙ্কো বোঁচকা খুলে একটা মূর্তি বের করল। ফ্রান্সিস সেটা নিয়ে মিত্তালকে দিল। দলপতিও মূর্তিটার দিকে তাকিয়ে রইল। মিত্তাল মূর্তিটা কপালে ঠেকাল। দলপতির হাতে দিল। দলপতিও মূর্তিটা কপালে ঠেকাল। তারপর মূর্তিটার দিকে তাকিয়ে রইল। সোনার জিনিস সম্পর্কে দলপতির কোন ধারণাই নেই। দলপতি মিত্তালকে কী বলল। মিত্তালও দলপতিকে কিছু বলল। ফ্রান্সিসরা বুঝল না।

—এটা আপনাদের উচিৎ হয়নি। মিত্তাল বলল।

পিরেল্লো বলল—আমি তো বললাম, রাজা আমার কাজে সন্তুষ্ট হয়ে এই মূর্তিগুলো আমাকে দিয়েছেন।

—এটা কি বিশ্বাসযোগ্য? যেখানে হাজার হাজার দেশবাসীরা পুতপবিত্র দেবমূর্তিগুলো পুজো করে নৈবেদ্য দেয়। সেই দেবমূর্তিগুলো রাজা কামবহনা আপনাকে পুরস্কারস্বরূপ দেবেন—এটা অসম্ভব। তাছাড়া আমাদের জাহাজে যখন আশ্রয় নিতে এসেছিলেন তখন মূর্তি চুরি করেছেন একথাই বলেছিলেন। ফ্রান্সিস বলল।

—তোমরা বিদেশী। মূর্তিচুরির কথা তোমরা জানলেও কোন ক্ষতি নেই—এই ভেবে তোমাদের বলেছি। মিত্তাল বলল—যাহোক পুরুতমশাই। মূর্তিগুলো স্বস্থানে রেখে আসুন। চুরি ধরা পড়লে রাজা নিশ্চয়ই খোঁজাখুঁজি শুরু করবেন। প্রথমেই সন্দেহ করবেন আপনাকে। আপনার খোঁজ শুরু হবে। চুরির দায় আপনার ঘাড়ে চাপবে। তখন ধরা পড়লে আপনার নির্ঘাৎ ফাঁসি হবে।

—ঠিক আছে। তাহলে মিত্তাল এখন আমি কী করব? পিরেল্লো জানতে চাইল।

—চুরির ব্যাপারে কোন কথা কাউকে বলবেন না। দেবমূর্তিগুলো স্বস্থানে রেখে দেবেন। মিত্তাল বলল।

—ঠিক আছে। পিরেল্লো বলল।

স্থির হল পরদিন সকালে পিরেল্লোকে নিয়ে ফ্রান্সিসরা রওনা হবে রাজধানীর উদ্দেশ্যে।

সন্ধ্যে হল। ফ্রান্সিসরা বিকেলের খাবার খেল। দলপতি একজন যোদ্ধাকে বলল ফ্রান্সিসদের একটা ঘরে রাখতে। কথাটা ফ্রান্সিসদের বুঝিয়ে বলল পিরেল্লো। ভালো একটা ঘরে ফ্রান্সিসদের নিয়ে এল দুই যোদ্ধা। পিরেল্লোও ওদের সঙ্গে থাকতে এল।

ঘরে ঢুকতে যাবে তখনই অল্প অন্ধকারে শাঙ্কো দেখল কোনার দিকে কয়েকটি কলাগাছে পাকা কলার কাঁদি ঝুলছে। শাঙ্কো ছুটে গিয়ে ওর ছোরা দিয়ে একটা কাঁদির অর্দ্ধেক কাটল। সেই কাঁদি ওরা বোঁচকার ওপরে রাখল। যারা দেখবে তারা ভাববে বোঁচকায় কলা আছে। কারুর মনে কোন সন্দেহ হবে না। নিশ্চিন্তে চলাফেরা করা যাবে।

রাতের খাওয়ার সময় ফ্রান্সিসদের যোদ্ধারা ডেকে নিয়ে গেল। ঘরটায় ঢুকে ফ্রান্সিসরা বুঝল এটা রান্না করার ও খাওয়ার ঘর।

ফ্রান্সিসদের শোয়ার ব্যবস্থা হল একটা ঘরে। ফ্রান্সিসরা খেয়েদেয়ে এসে ঐ ঘরে শুয়ে পড়ল। তখনও বর্শা হাতে যোদ্ধারা বাড়িঘর পাহারা দিতে লাগল। ফ্রান্সিস ওদের এত সতর্কভাবে পাহারা দেবার কী অর্থ বুঝল না। এত সাবধানতার কী কারণ বুঝল না।

তখন রাত গভীর। সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। শুধু একদল যোদ্ধা ঘুরে ঘুরে পাহারা দিচ্ছে।

হঠাৎ যোদ্ধাদের একটা ধ্বনি—আ—আ—আ। শোনা গেল তারপরেই অন্য একদলের চিৎকার। ফ্রান্সিসদের ঘুম ভেঙে গেল। ওরা উঠে বসল। ফ্রান্সিস বলল—পিরেল্লো—বাইরে চিৎকার চেঁচামেচির কারণ কী? পিরেল্লো উঠে বসল। বলল—পেছনেই ইরা নদী। নদীর ওপারে থাকে আর এক বুনো মানুষেরা। ওদের সঙ্গে এপারের বুনোদের ঝগড়াঝাঁটি লেগেই আছে। শুধু ঝগড়াঝাঁটি নয়। লড়াইও চলে। নদীর ওপারের বুনোরা আক্রমণ করেছে। লড়াই চলছে। মানুষের চিৎকার গোঙানি শোনা যাচ্ছে। ফ্রান্সিসকে হ্যারি বলল—কী করবে?

—এখন ঘর থেকে বেরুলে বিপজ্জনক। আমরা বিদেশী। কোন দলের সঙ্গে আমাদের মিতালি নেই—একথা বলতে হবে। এখন দেখা যাক কারা জেতে। ফ্রান্সিস বলল।

—নদীর ওপারের বুনোরা দুর্ধর্ষ। ওদের হারানো মুস্কিল। পিরেল্লো বললেন।

লড়াই চলল। সেই সঙ্গে চিৎকার গোঙানি জোরে শ্বাস ফেলার শব্দ শোনা যাচ্ছে।

কিছুক্ষণ লড়াই চলল। তারপর আস্তে আস্তে পরিবেশ শান্ত হল। শুধু আহতদের আর্তস্বর শোনা যাচ্ছে।

হঠাৎ ফ্রান্সিসদের ঘরের বন্ধ দরজাটায় দমাদম লাথি শোনা গেল। আবার এক দফা লাথি মারা শুরু হতেই অর্দ্ধেকটা দরজা ভেঙে পড়ল। মশাল হাতে দুজন যোদ্ধা ছুটে এসে ঘরে ঢুকল। মশালের আলোয় ফ্রান্সিসদের দেখল। ফ্রান্সিসদের দেখে থমকে গেল। এই বিদেশী ভূতগুলি এখানে এল কী করে! আরও দুতিনজন যোদ্ধা ঘরে ঢুকল। ফ্রান্সিস পিরেল্লোর দিকে তাকাল। দেখল, পিরেল্লোর মুখ শুকিয়ে গেছে। ফ্রান্সিস বলল—পিরেল্লো কী ব্যাপার?

—ওরা নদীর এপারের বুনোদের দলপতিকে খুঁজছে। নদীর ওপারের বুনোদের জয় হয়েছে।

একজন যোদ্ধা এগিয়ে এসে মুখ বেঁকিয়ে কী বলল।

—পিরেল্লো? ফ্রান্সিস বলল।

পিরেল্লো বলল—জানতে চাইছে তোমরা এখানে কী করে এলে?

—বলো যে জাহাজ চালিয়ে এসেছি। পিরেল্লো বলল সেটা। এবার পিরেল্লো মারফৎ কথা চলল।

—তোমরা এখানে কেন এসেছো? লোকটি বলল।

—বেড়াতে, দেশ দেখতে। ফ্রান্সিস বলল।

—হতে পারে। কিন্তু আমার মনে হয় তোমরা রাজা হানমের গুপ্ত ধনভাণ্ডার চুরি করতে এসেছো। লোকটি বলল।

—যাক গে—তোমরা ইরানদীর ওপারে আমাদের রাজ্যে বন্দী থাকবে। লোকটা বলল। পিরেল্লোর দিকে তাকিয়ে বলল—আপনাকে চিনি। আপনি অলিকাস দেশের রাজ পুরোহিত। আপনাকে বন্দী করা হবে না।

—না-না। আমাকেও বন্দী কর। পিরেল্লো বলল। আরো বলল—আমি এই বিদেশীদের সঙ্গেই থাকবো।

—বেশ থাকবেন। লোকটি বলল। তবে বন্দীর মতো নয়। দুজন যোদ্ধা ঘরে ঢুকল। লোকটি মাথা একটু নুইয়ে সম্মান জানিয়ে কী বলল। লোকটিও কী বলল। পিরেল্লো মৃদুস্বরে বলল—ফ্রান্সিস, এই লোকটা নতুন দলপতি। আগের দলপতিকে আমি চিনতাম। এরা লড়াইয়ে জিতেছে। এ পারের দলপতি কিছু যোদ্ধাসহ পালিয়েছে। তাদের ধরবার জন্যে ওপারের যোদ্ধারা ছুটোছুটি করছে। লক্ষ্য করে দেখ ইরা নদীর এপারে যারা থাকে তারা গোঁফ দাড়ি কামায় না। নদীর ওপারে যারা থাকে তারা গোঁফ দাড়ি কামায়।

দলপতি গলা চড়িয়ে হুকুম করল—এদের সবাইকে বন্দী করে নিয়ে চল। যোদ্ধারা কয়েকজন এগিয়ে এল ছোট দড়ি হাতে। দলপতি পিরেল্লোকে বন্দী করতে মানা করল।

ফ্রান্সিসদের ঘরের বাইরে আনা হল। ফ্রান্সিস মৃত ও আহত এপারের যোদ্ধাদের দেখল। ওদের মধ্যে জীবিত আহতদের বন্দী করা হল। পিরেল্লো ছাড়া ফ্রান্সিসদের হাতও বাঁধা হল। ফ্রান্সিস মনে মনে ভাবল—আবার কষ্টের দিন দুঃখের দিন শুরু হল। কবে মুক্তি পাওয়া যাবে কে জানে। এরা মুক্তি দেবে সে আশা নেই। নিজেদের মুক্তির ব্যবস্থা নিজেদেরই করে নিতে হবে।

দুজন যোদ্ধা ফ্রান্সিসদের নিয়ে চলল। আহত বন্দীদেরও নিয়ে যাচ্ছে ওরা। কিছু পাথর কাঠের বাড়ি। লম্বা লম্বা শুকনো ঘাসের ছাউনি বাড়ি এ রাস্তার দুপাশে। বাড়িগুলোর ধারে কাছে কেউ নেই। বেশ দূরে হেঁটে আসতে হয়েছে। পূব আকাশে লাল আভা। একটু পরেই সূর্য উঠল। ফ্রান্সিসদের বড় ভালো লাগে সূর্যোদয়। কিন্তু আজ ভালো লাগল না। বন্দীদশা বন্ধুদের জন্যে মারিয়ার জন্য দুশ্চিন্তা। ভালো লাগছিল না কিছু।

নদীর ওপারের বুনোরা ফ্রান্সিসদের হাত দড়ি দিয়ে বাঁধল। শুধু পিরেল্লোর হাত বাঁধা হল না। ওরা লড়াইয়ে আহতদের সঙ্গে নিল না। তবে ওদের আহত যোদ্ধাদের মোটা কাপড়ে চাপিয়ে নিয়ে চলল।

সবাই ইরা নদীর ধারে যখন পৌঁছল তখন রোদের তাপ বাড়ছে।

ইরা নদী ছোট নদী। তবে স্রোতের টান আছে। নদীতীরে দুটো লম্বাটে

নৌকো। নৌকো দুটোয় দুজন মাঝি বসে আছে। ঢালু তীর দিয়ে সবাই নৌকোর কাছে এল। নৌকোয় উঠতে লাগল। শাঙ্কো উঠতে গিয়ে সমস্যায় পড়ল। কানের কাছে শুনল পিরেল্লোর কথা—দুহাতই বাধা। তুমি ওটা নিয়ে যেতে পারবে না। আমাকে দাও। শাঙ্কোর এবার পিরেল্লোর দিকে তাকাল। তারপর পাশে বসা যোদ্ধাদের ইঙ্গিতে জানাল বোঁচকাটা নিতে ওর অসুবিধে হচ্ছে। যদি সে নেয় তবে ও সহজে যেতে পারবে। যোদ্ধাটি কিছু বলল না। বোঁচকাটা নিল।

নৌকো পরপারে পৌঁছাল। এবার নামবার পালা। আস্তে আস্তে সবাই নেমে এল। হাত বাঁধা অবস্থায় নৌকোয় ওঠা নামা অত্যন্ত কষ্টকর। ফ্রান্সিস মৃদুস্বরে বলল—হ্যারি—তোমাকে সাহায্য করবো।

—পারবে না। তোমারও তো হাত বাঁধা। ভেবো না। ঢালু নদীতীর দিয়ে উঠতে পারবে।

—দেখ চেষ্টা করে। তুমি আমার পাশেই থাকবে। দুজনে চলল। বুনোরা অনায়াসে নদীর উঁচু তীরে উঠে গেল অল্পক্ষণের মধ্যে।

হঠাৎ হ্যারির পা ধুলো মাটিতে একটু ঢুকে গেল। হ্যারি আর দাঁড়াতে পারল না। ধুলো মাটিতে পড়ে গেল। ঢালু তীর বেয়ে গড়িয়ে পড়ে গেল। নদীর জলের কাছাকাছি এসে বুনো ঘাসের ঝোপের মধ্যে পড়ে নেমে গেল। বুনো যোদ্ধারা হেসে উঠল। ফ্রান্সিস নীচে নেমে চলল। হ্যারির কাছে এসে হ্যারির হাত ধরল। হাত টেনে বলল—চলো—আমাদের উঠতে হবে। চলো। হ্যারির কোমরে হাত ধরে কিসে বলল—ওঠো। হ্যারি আস্তে আস্তে উঠতে লাগল। ফ্রান্সিসও হ্যারির কোমরে চাপ দিয়ে হ্যারিকে উঠতে সাহায্য করতে লাগল। দুজনে তীরে উঠে এল। সবাই নদীতীরে জড়ো হল। দলপতির আদেশ হল। চলল সবাই।

বুনোদের গ্রামে এল। সেই কাঠ আর পাথর দিয়ে তৈরি বাড়িঘর। ফ্রান্সিসদের আসতে দেখে ওরা অবাক হয়ে গেল। ওরা হাঁ করে তাকিয়ে রইল। দরজায় জানালায় ওরা এসে দেখতে লাগল ফ্রান্সিসদের।

ফ্রান্সিসরা হাঁটতে হাঁটতে একটা বড় উঠোনমতো জায়গায় এল। জায়গাটার মধ্যে একটা বিরাট শিশু গাছের নীচে একটা বড় কাঠের আসন। দলপতি গিয়ে আসনটায় বসল। একটু হাঁপাতে লাগল। তারপর গলা চড়িয়ে আদেশ দিল কিছু। চার-পাঁচজন যোদ্ধা ফ্রান্সিসদের দিকে এল। ওরা ফ্রান্সিসদের অন্য জায়গায় নিয়ে এল। এসময় পিরেল্লো এগিয়ে এল। দলপতিকে কিছু বলল। আঙ্গুল তুলে শাঙ্কোর হাতের বোঁচকাটা দেখাল। দলপতি আঙুল তুলে ইশারায় শাঙ্কোকে তার কাছে আসতে বলল। শাঙ্কো বুঝল সেটা। শাঙ্কো এগিয়ে দলপতির কাছে গেল। বোঁচকাটা দেখিয়ে পিরেল্লো দলপতিকে বললো। দলপতি হাত তুলে মাথা ওঠানাম করল।

—দলপতি কি বলছে? শাঙ্কো জিজ্ঞেস করল পিয়েল্লোকে।

হেসে বলল—আমার জিনিস আমাকে ফেরৎ দেওয়া হবে।

—না। সব জিনিস আমার। শাঙ্কো বলল।

—তুমি চোর। পিরেল্লো বলল।

—এইবার জিজ্ঞেস করি দলপতি যদি বোঁচকার ভেতর কী আছে সেটা দেখতে চায় তখন আপনি কী বলবেন? শাঙ্কো বলল।

—অ্যাঁ? হ্যাঁ হ্যাঁ মানে—পিরেল্লো—বলতে গিয়ে থেমে গেল।

—সোনার দেবমূর্তিগুলো দেখতে চাইলে আপনি বিপদে পড়বেন। আপনাকে স্বীকার করতে হবে যে পুরোহিত হিসেবে থাকায় আপনি অতি সহজে দেবমূর্তিগুলো চুরি করেছেন। কারণ সেটা আপনার পক্ষেই সম্ভব। পিরেল্লো ঘাবড়ে গেল। সত্যিই তো—দেবমূর্তিগুলো দেখলে দলপতির মনে এ প্রশ্ন উঠতেই পারে।

—তা ঠিক। পিরেল্লো বলল।

এবার দলপতি শাঙ্কোকে জিজ্ঞেস করল—তুমি কি এই বোঁচকাটা পিরেল্লোর কাছ থেকে চুরি করেছো?

—না। এই বোঁচকা আমার। শাঙ্কো বলল।

—রাজ পুরোহিত—ওতো বলছে এই বোঁচকা ওর। দলপতি বলল।

—তাহলে পিয়েল্লোকে জিজ্ঞেস করল। উনি বলুন বোঁচকায় কি কি জিনিস আছে? ফ্রান্সিস বলল।

—রাজপুরোহিত বলুন তো আপনার বোঁচকায় কী কী জিনিস আছে। দলপতি বলল।

—আমি রাজপুরোহিত হিসেবে কাজ করে যা অর্থ সঞ্চয় করেছি এই বোঁচকায় রেখেছি। পিরেল্লো বলল।

এবার দলপতি শাঙ্কোকে জিজ্ঞেস করল তুমি বলো তো কী আছে বোঁচকায়?

—দামি কিছুই নয়। পুরনো কাপড়চোপড় আর একহাত পিঠে আর গোটা দশেক আপেল। শাঙ্কো বলল।

—ঠিক আছে। দেখা যাবে। দলপতি একজন যোদ্ধাকে ইঙ্গিত করল। যোদ্ধাটি বর্শাটা মাটিতে রাখল। তারপর বোঁচকাটা শাঙ্কোর হাত থেকে নিয়ে খুলতে লাগল।

কাপড়ে জড়ানো সোনার মূর্তিগুলো দেখা গেল।

—রাজপুরোহিত—দলপতি পিরেল্লোকে জিজ্ঞেস করল—এই মূর্তিগুলো কি সোনার?

—আসল সোনার। পিরেল্লো বলল।

—অ্যাঁ? বলেন কী! দলপতি হাঁ করে দেবমূর্তিগুলোর দিকে তাকিয়ে রইল।

—ঠিকই বলেছি। পিরেল্লো বলল।

দলপতি দ্রুত একটা মূর্তি তুলে নিল। মূর্তিটার পোশাক খুলে ফেলল। বিমুগ্ধ চোখে তাকিয়ে রইল মূর্তিটার দিকে। তারপর হো হো করে হেসে উঠল।

চারপাশে দাঁড়ানো যোদ্ধারাও হাসল। দলপতি যোদ্ধাটিকে বলল—ক'টা মূর্তি আছে দ্যাখতো। যোদ্ধাটি গুণে গুণে বলল—

—সাতটা।

—আমার কাঠের সিন্দুকে রেখে আয়। দলপতি বলল।

—আজ্ঞে চাবি? যোদ্ধাটি বলল।

—ওটা খোলাই থাকে। যোদ্ধাটি চলে গেল।

দলপতি এবার ফ্রান্সিসদের দিকে তাকিয়ে বলল—তোমরা দুজনেই মিথ্যে বলেছো। তোমাদের কয়েদ করবো।

—আমি মিথ্যে বলেছিলাম আপনার শাস্তির হাত থেকে বাঁচতে। শাঙ্কো বলল।

—আমাকেও বন্দী থাকতে হবে? পিরেল্লো বলল।

—হ্যাঁ আপনিও। দলপতি বলল।

দলপতি পাহারাদারদের বলল—যা, এই চারজনকেই কয়েদঘরে বন্দী করে রাখ।

—কয়েদঘরে বন্দী হওয়ার মতো কোন কাজ করিনি। ফ্রান্সিস বলল।

—সে সব বিচার পরে হবে। দলপতি বলল। শাঙ্কো কিছুটা এগিয়ে এসে বলল—মূর্তিগুলো তো নিলেন। মূর্তিদের পোশাকগুলো আমাকে দিন।

—বেশ। দলপতি একজন যোদ্ধাকে ডাকল। বলল—ঐ পোশাকের বোঁচকাটা একে দে।

যোদ্ধাটি ডাঁই করে রাখা পোশাকগুলো শাঙ্কোকে দিল। কয়েকজন প্রহরী এগিয়ে এল ফ্রান্সিসদের দিকে। মাথা নেড়ে ইঙ্গিত করল ওদের সঙ্গে যাবার জন্যে। ফ্রান্সিসরা চলল কয়েদঘরের দিকে।

চারজনে কয়েদঘরে ঢুকল। প্রহরী বাইরে থেকে দরজার হুড়কোটা আটকে দিল।

ঘরে ঢুকে ফ্রান্সিস টান টান হয়ে শুয়ে পড়ল। শুকনো লম্বা লম্বা ঘাসের বিছানামতো। আর সবাই বসল। হ্যারি ডাকল—ফ্রান্সিস?

—বলো।

—এখন কী করবে? হ্যারি বলল।

—দলপতির মাথা কাটবো। ফ্রান্সিস হেসে বলল।

—ইয়ার্কি করো না। কী করবে এখন তা ভেবেছো? হ্যারি বলল।

—ভাবছি। ভাবা এখনও শেষ হয়নি। ফ্রান্সিস বলল।

—তাহলে তো অপেক্ষা করতে হবে। শাঙ্কো বলল।

—সে তো বটেই। ফ্রান্সিস পিরেল্লোর দিকে তাকাল। বলল—পিরেল্লো আপনি কী বলেন?

—কোন ব্যাপারে? পিরেল্লো বলল।

এখান থেকে পালানোর ব্যাপারে ফ্রান্সিস বলল।

—অসম্ভব। এখান থেকে পালানো যাবে না। চেষ্টা করে লাভ নেই। বরং সেটা বিপজ্জনক হবে। পালাতে গেলে ওরা বর্শা বুকে ঢুকিয়ে দেবে। কাজেই চুপ করে থাকুন। কী হয় দেখুন। তবে দেখে আর ভেবে কী হবে। পিরেল্লো বলল।

—হবে। এরা কীভাবে পাহারা দেয়। কতজন একএকবার পাহারা দেয়। কেমন করে খেতে দেয় এসব দেখতে হবে। সব দেখে টেখে পালানোর উপায় ভাবতে হবে এবং সেটাকে কাজে লাগাতে হবে। ফ্রান্সিস বলল।

—দেখুন চেষ্টা করে। পিরেল্লো ঠোঁট উলটে বলল।

ফ্রান্সিস আর কোন কথা বলল না। হ্যারিও শুয়ে পড়ল। ফ্রান্সিস চমকে উঠে বলল—হ্যারি শরীর ভালো আছে তো?

—ঐ একটু—হ্যারি বলল।

—কী হয়েছে বলো। ফ্রান্সিস বলল।

—শরীরটা একটু দুর্বল লাগছে। তোমরা আমার জন্যে ভেবো না। হ্যারি বলল।

—ওষুধটষুধ সঙ্গে রেখেছো তো? ফ্রান্সিস বলল।

—হ্যাঁ হ্যাঁ—ভেন আমাকে ওষুধ দিয়ে রেখেছে।—হ্যারি বলল।

—তাহলে সময়মতো ওষুধ খেও। ফ্রান্সিস বলল।

—ঠিক আছে। একটু জল খাবো। হ্যারি একটু দুর্বল স্বরে বলল। শাঙ্কো সঙ্গে সঙ্গে ঘরটার কোনার দিকে গেল। মশালের আলো এতদূর ভালোভাবে এসে পৌঁছয়নি। শাঙ্কো কাঠের গ্লাসে জল নিয়ে এল। হ্যারি এক গ্লাস জল খেয়ে আবার চাইল। শাঙ্কো আবার জল নিয়ে এল। হ্যারি খেল। তারপর জোরে শ্বাস ফেলল।

শাঙ্কো নিজের জায়গায় এল।

হঠাৎ ফ্রান্সিস উঠে বসল। ডাকল—শাঙ্কো। শাঙ্কো ওর দিকে তাকাল।

ফ্রান্সিস বলল—মূর্তিগুলো পরানো কাপড়চোপড়গুলো কোথায়?

—গ্রামপতির ঘরেই পড়ে আছে। আমি আনি নি। শাঙ্কো বলল।

—খুব ভুল করেছো। এখন ঐ টুকরো কাপড়গুলো খুব দরকার। ফ্রান্সিস ডাকল—পিরেল্লো। পিরেল্লো বললেন—বলুন।

—দেবমূর্তিতে পরানো কাপড়গুলো কোথায় জানেন? ফ্রান্সিস বলল।

—হ্যাঁ গ্রামপতির ঘরে। পিরেল্লো বললেন।

—এখন আপনি আর শাঙ্কো গ্রামপতির ঘরে যান। গিয়ে গ্রামপতিকে বুঝিয়েসুজিয়ে কাপড়গুলো নিয়ে আসুন। ফ্রান্সিস বলল।

পিরেল্লো উঠতে উঠতে বলল—কাপড়গুলো কোথায় ফেলেই দিয়েছে কি না কে জানে।

—গিয়ে দেখুন তো। ফ্রান্সিস বলল।

পিরেল্লো দরজার কাছে এল। পেছনে শাঙ্কো। গাছের ডাল কেটে তৈরি দরজার কাছে এল। পিরেল্লো প্রহরীকে ডাকল। প্রহরী এল। পিরেল্লো কী বলল। একটু পরেই দরজা খুলে গেল। পিরেল্লো আর শাঙ্কো ঘর থেকে বেরিয়ে এল। দুজন যোদ্ধা ওদের দুপাশে দাঁড়াল। ওরা চলল গ্রামপতির ঘরের দিকে।

ঘরের সামনে এল দুজনে। গ্রামপতির ঘরের সামনে দুজন প্রহরী। হাতে বর্শা। পিরেল্লো ওদের কী বলল। একজন ঘরের দরজার কাছে গেল। দরজায় শব্দ করল। ভেতর থেকে গম্ভীর গলা শোনা গেল।—কে? প্রহরীটি কিছু বলল। একটু পরে দরজা খুলে গেল। গ্রামপতি দরজার কাছে এল। বলল—এসে নিয়ে যাও। শাঙ্কো ছুটে ঘরে ঢুকল। মশালের আলোয় দেখল কাপড়গুলো ঘরের এক কোণায় স্তূপাকার করে রাখা। শাঙ্কো প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ল ঐ কাপড়ের স্তূপের ওপর। দ্রুতহাতে কাপড়গুলো বের করতে লাগল আর কোমরে পাঁচ্যাতে লাগল। গ্রামপতি দেখল সেটা। কিন্তু কিছু বলল না। যখন শেষ হল শাঙ্কোর কাছে তখন গ্রামপতি বলল—কী করবে এই কাটা কাপড় দিয়ে?

—খুবই পবিত্র এই পোষাক। যথাস্থানে কাপড়গুলো রেখে দেওয়া হবে। নতুন পোশাক পরানো হবে। সেই উপলক্ষে খুব আনন্দ উৎসব হয় ঐ দেশে। পিরেল্লো বলল।

গ্রামপতি মুখে শব্দ করল—হুঁ।

সাত দেবতার পোশাকের কাপড় নিয়ে ওরা কয়েদঘরে ফিরে এল। পিরেল্লো হেসে বললেন—কী হবে এসব নিয়ে?

—সময়মতো দেখবেন। ফ্রান্সিস বলল।

শাঙ্কো নিজের কোমর থেকে কাপড়গুলো খুলে খুলে একত্র করল। এক জায়গায় রেখে দিল।

কেউ কোন কথা বলছে না। দুপুরে পাহারাদাররা খাবার নিয়ে এলো। ফ্রান্সিস লক্ষ্য করল দুজন প্রহরী ওদের খাবার নিয়ে আসে। একজন বাইরে পাহারায় থাকে। প্রহরীরা ডেকচিতে মাংস, বড় লোহার থালায় রুটি আর একটা ছোট মাটির হাঁড়িতে ডালপাতা আর বুনো আলুর তরকারি। খেতে খেতে ফ্রান্সিস বরাবর যা বলে তাই বলল—পেট পুরে খাও। রান্না ভালো না লাগলেও খাও।

খাওয়া শেষ। প্রহরীরা এঁটো থালাটালা নিয়ে চলে গেল।

সন্ধ্যে হল। ফ্রান্সিসরা শুয়ে বসে আছে। সবাই চুপ। হ্যারি মৃদুস্বরে বলল—ফ্রান্সিস কিছু ভাবলে?

—আমার সব ছক হয়ে গেছে। এবার কাজে নামা। ফ্রান্সিস বলল। শাঙ্কো মৃদুস্বরে ধ্বনি তুলল—ও-হো-হো। হ্যারিও সঙ্গে যোগ দিল। ফ্রান্সিস হাসল। বলল—সিদ্ধান্ত নিলাম কাল রাতের খাওয়া-দাওয়ার পর পালাবো।

—আজ রাতেও তো পালানো যায়। পিরেল্লো বলল।

—না। শুধু পালানো নয়। মূর্তিগুলো নিয়ে পালাতে হবে। তার জন্য একটু ভেবেচিন্তে এগোতে হবে। ফ্রান্সিস বলল।

অন্যেরা একটু তাড়াতাড়িই শুয়ে পড়ল। ঘুমিয়েও পড়ল। ফ্রান্সিসের চোখে ঘুম নেই। ওর একটা চিন্তা কী করে রাজা হানমের গুপ্তধন খুঁজে বের করবে। তারপর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব জাহাজে ফেরা।

পরের দিনটা একইভাবে কাটল। চুপচাপ ঘাসের বিছানায় শুয়ে বসে।

সন্ধ্যে হল। রাত হল। রাতের খাওয়া-দাওয়ার পর ফ্রান্সিস বলল—শাঙ্কো—কিছু কাপড় নিয়ে দড়ির মতো পাকাও। প্রহরীর, গ্রামপতির মুখ বাঁধতে হবে।

রাত একটু গভীর হল। ফ্রান্সিস দ্রুত উঠে দাঁড়াল। ওর দেখাদেখি আর সবাই উঠে দাঁড়াল। ফ্রান্সিস পিরেল্লোকে বলল—দেখুন প্রহরী ক'জন?

—দু'জন? ফ্রান্সিস বলল—এদের নিয়ম অনুযায়ী থাকার কথা ছিল একজনের। গতরাতেই পাহারায় ছিল একজন। যাক গে—ফ্রান্সিস বলল।

—আমরা দু'জনকে অকেজো করে দিতে পারবো। শাঙ্কো বলল।

—শাঙ্কো। শোন। পাহারাদার দুজনকেই ডাকা হবে। ওরা দরজা একটু খোলার সঙ্গে সঙ্গে দরজাটা প্রচণ্ড জোরে মুখের ওপর ধাক্কা দেব। বুঝতেই পারছো কী হবে তাহলে। অন্যটাকেও কাছে আসতে বলবো। কাছে এলে আমি মারবো ধাক্কা আর তুমি ওর মুখ বেঁধে দেবে। সব কাপড় সঙ্গে নাও। কখন কোন কাজে লাগবে বলা যায় না। একটু থেমে বলল—পিরেল্লো আপনি একজন প্রহরীকে ডাকুন।

পিরেল্লো দরজার কাছে গেল। ওদের ভাষায় গলা চড়িয়ে কী বলল। একজন এগিয়ে দরজার কাছে এল। ফ্রান্সিস ফিস্‌ফিস্ করে বলল—ভেতরে আসতে বলুন। পিরেল্লো বলল সেটা।—ভেতরে এসো।

একজন প্রহরী ঘরের ভেতরে আসার জন্যে দরজার কাছে এল। হুড়কো খুলতেই ফ্রান্সিস আর শাঙ্কো দরজার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। দরজাটা প্রচণ্ড জোরে প্রহরীর নামে মুখে লাগল। নাক দিয়ে রক্ত ছুটল। ও নাক ধরে ছিটকে চিৎ হয়ে পড়ল। শাঙ্কো সঙ্গে সঙ্গে ওর মুখ বেঁধে ফেলল। প্রহরীটির মুখ থেকে গোঁ গোঁ শব্দ বেরোতে লাগল। শাঙ্কো ছিটকে পড়া বর্শাটা নিয়ে ওর গলায় চেপে ধরল। প্রহরীটির গলার শব্দ বন্ধ হল। শাঙ্কো ওর হাত দুটোও বেঁধে ফেলল। ওদিকে ফ্রান্সিস আহত প্রহরীর বর্শাটা নিয়ে অন্য প্রহরীটির দিকে এগিয়ে চলল। প্রহরীটি হাতের বর্শাটা বাড়িয়ে ফ্রান্সিসের গায়ে লাগাবার জন্যে চেষ্টা করল। ফ্রান্সিস বর্শার ধাক্কায় প্রহরীটির হাতের বর্শাটা সরে গেল। শুরু হল বর্শার লড়াই। প্রহরীটি শূন্যে বর্শাটা ঘোরাতে ঘোরাতে দ্রুত নামিয়ে এনে ফ্রান্সিসের বুকে বেঁধাতে চেষ্টা করল। কিন্তু ফ্রান্সিস তার আগেই সাবধান হয়ে গেছে। বর্শাটা ঘুরিয়ে সরে এসেছে। এবার ফ্রান্সিস প্রহরীটির উরু লক্ষ্য করে বর্শা চালাল। বর্শাটা প্রহরীটির ডানপায়ের উরুতে বিঁধে গেল। ও বর্শা ফেলে

উরু চেপে ধরল। ফ্রান্সিস ওর নিজের বর্শাটঠা টেনে নিয়ে এল। প্রহরীটি মাটিতে পড়ে গেল। ওর মুখ থেকে আর্তস্বর বেরোবার আগেই শাঙ্কো ওর মুখে কাপড় চেপে ধরল। তারপর মুখ বেঁধে ফেলল। হাতদুটো পেছনে নিয়ে বেঁধে ফেলল। সব ঐ সাজের কাপড় দিয়েই করল।

ফ্রান্সিস হাত তুলে নিঃশব্দে গ্রামপতির বাড়িটা দেখাল! তারপর ছুটল সেই দিকে। গ্রামপতির ঘরের দরজার সম্মুখে এসে প্রায় সবাই হাঁপাতে লাগল। ফ্রান্সিস পিরেল্লোকে ফিস্‌ফিস্ করে বলল—গ্রামপতিকে ডাকুন। বলবেন জরুরি কথা আছে।

পিরেল্লো এগিয়ে এসে দরজায় শব্দ করল। ভেতর থেকে গম্ভীর কথা শোনা গেল—কে? পিরেল্লো বলল—আমি পিরেল্লো। রাজপুরোহিত।

—তা এত রাতে?

—আপনার সঙ্গে একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা আছে। পিরেল্লো বলল।

—হুঁ। একটু পরেই বোঝা গেল গ্রামপতি দরজার কাছে এসেছে। দরজা একটু খুলল। ফ্রান্সিস আর শাঙ্কো দরজার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। গ্রামপতি ছিটকে মাটির মেঝেয় পড়ে গেল। শাঙ্কো ছুটে গিয়ে গ্রামপ্রধানের মুখ কাপড় দিয়ে বেঁধে ফেলল। হাতও বাঁধল। গ্রামপতি আস্তে-আস্তে গোঙাতে লাগল।

ততক্ষণে ফ্রান্সিস কাঠের আলমারির পাল্লা খুলে ফেলেছে। সাজিয়ে রাখা দেবমূর্তিগুলো শাঙ্কোকে দিল। শাঙ্কো কাপড়ের মধ্যে মুর্তিগুলো লুকিয়ে ফেলল।

ফ্রান্সিস অস্ফুট স্বরে বলল—এবার পালাও।

চারজন বাইরে এল। ফ্রান্সিস গলা চেপে বলল—পিরেল্লো—কোন দিকে যাবো? উত্তর দিকে হাত তুলে দেখিয়ে বলল—এই দিকে।

চারজনই উত্তরমুখো ছুটল। চাঁদের আলোয় ফ্রান্সিস দেখল একটা বনাঞ্চল। তখনও দূরে দেখল গ্রামপতির যোদ্ধারা মশাল হাতে ফ্রান্সিসদের খুঁজে বেড়াচ্ছে। হৈ হৈ করছে।

ফ্রান্সিসরা বনে ঢুকে পড়ল। আর ধরা পড়ার ভয় নেই। বনের গাছপালা খুব ঘন নয়, ছাড়া ছাড়া। ওর মধ্যে দিয়েই ফ্রান্সিসরা যতটা দ্রুত দৌড়োনো সম্ভব ততটা জোরে ছুটল।

বনটা খুব বেশি বড় নয়। একসময় বন শেষ। সামনেই একটা বেশ বড় ছড়ানো পাথরের আর ঘাসের প্রান্তর।

ফ্রান্সিসরা হাঁটতে লাগল।

হঠাৎ হ্যারি অস্পষ্টস্বরে ডাকল—ফ্রান্সিস।

ফ্রান্সিস ফিরে তাকাল। দেখল হ্যারি মাটিতে পড়ে যাচ্ছে।

ফ্রান্সিস ছুটে এসে হ্যারিকে ধরল। কিন্তু ধরে রাখতে পারল না। হ্যারি ঘাসের ওপর শুয়ে পড়ল। ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে হ্যারিকে কাঁধে তুলে নিল। তারপর হাঁটতে লাগল। পিরেল্লো বলল—আমরা এসে গেছি। বাড়িঘর দেখা যাচ্ছে।

ফ্রান্সিস শ্বাস ফেলতে ফেলতে বলল—ওখানেই আশ্রয় নেব। শাঙ্কো এগিয়ে এল। বলল—ফ্রান্সিস এবার আমি নিচ্ছি। ও দুহাত ছড়িয়ে হ্যারিকে ধরল। তারপর আস্তে আস্তে কাঁধে রাখল। তখন সকাল হয়ে গেছে।

প্রথম বাড়িটার সামনে এসে ওরা দাঁড়াল। কিছু কাচ্চা বাচ্চা ওদের ঘিরে দাঁড়াল। এক মহিলা বাড়িটা থেকে বেরিয়ে এল। কী বলল। ফ্রান্সিসরা বুঝল না। পিরেল্লোও কীসব বলল। মহিলাটি পাশের ঘরটা দেখিয়ে কী বলল। তারপর ঐ ঘরটার কাছে এল। কোমর থেকে চাবির বড় একটা থোকা বের করল। ওটাতে অনেক চাবি। মহিলাটি দেখে দেখে একটা চাবি বের করল। চাবিটা দিয়ে দরজা খুলল।

ফ্রান্সিসরা ঘরের ভেতরে ঢুকল। মেঝে মাটির। তার ওপর ঘাসপাতা দিয়ে তৈরি একটা বিছানামতো। শাঙ্কো আর ফ্রান্সিস হ্যারিকে ধরাধরি করে ঘাসের বিছানার ওপর শুইয়ে দিল। হ্যারির গোঙানি বাড়ল। ফ্রান্সিস কী করবে বুঝতে পারছে না। পিরেল্লো বলল—আপনাদের বন্ধুর এরকম হয়?

—হ্যাঁ। হঠাৎই অজ্ঞানমতো হয়ে যায়। শাঙ্কো বলল।

—অনেক দেরিতে জ্ঞান ফিরে পান? পিরেল্লো বলল।

—হ্যাঁ। তখন আগের ঘটনার কিছুই মনে করতে পারে না। ফ্রান্সিস বলল।

—আপনারা যে বন্দরে জাহাজ থামিয়েছেন সেই বন্দর এলাকাতেই থাকেন এক সাধু। তাঁর ওষুধ খেয়ে এক অন্ধ দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেয়েছে। কারো ভাঙা পা জোড়া লেগেছে।

—আপনি নিজে দেখেছেন তেমন কিছু? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—না-না। লোকমুখে শুনেছি। পিরেল্লো বলল।

—এসবের কোনো গুরুত্ব নেই। লোক ঠকানো ব্যবসা। ফ্রান্সিস বলল।

দুপুর কেটে গেলে। খাওয়ার ডাক পড়ল না। অবশ্য ফ্রান্সিসদের খিদেই পাচ্ছিল না।

শেষ দুপুরে হ্যারি চোখ মেলে তাকাল। গোঙানি বন্ধ হয়েছে তার আগেই। হ্যারি আস্তে আস্তে ওর কোমরের ফেট্টি থেকে একটা কাঠের কৌটো বের করল। কৌটোর মুখ খুলতে খুলতে বলল—শাঙ্কো এক গ্লাশ জল আনো। শাঙ্কো ছুটে গিয়ে কাঠের গ্লাশে করে জল নিয়ে এল। হ্যারি কৌটো থেকে একটা গুলি বের করল। আস্তে আস্তে খেয়ে নিল।

তখন বিকেল হয়ে এসেছে। গৃহকর্তা এসে বলল—আপনারা কোন দেশ থেকে এসেছেন? ভদ্রলোক খুবই অমায়িক। ফ্রান্সিস বলল—আমরা ভাইকিং। পশ্চিম ইউরোপ থেকে এসেছি। পিরেল্লোকে দেখিয়ে বলল—ইনি কোন দেশ থেকে এসেছেন?

—খেতে আসুন। বড় দেরি হয়ে গেল। মানে নতুন করে রান্না চাপাতে হল। কিছু মনে করবেন না।

সবাই উঠে দাঁড়াল। হ্যারিও উঠতে যাবে। ফ্রান্সিস বলল—হ্যারি—তুমি এই ঘরেই যাও। বেশি নড়াচড়া করো না।

—বেশ। হ্যারি বসে রইল।

—হ্যারি পেট ভরে খেও। তারপর একটু পায়চারি করো। ফ্রান্সিস বলল।

ফ্রান্সিসরা ওপাশের ঘরে ঢুকল। দেখল মাটির মেঝেয় পরপর একটা করে লম্বাটে পাতা সাজিয়ে রাখা হয়েছে। ফ্রান্সিসরা খেতে বসল। গৃহকর্ত্রী আর তার মেয়ে খাবার পরিবেশন করতে লাগল। গৃহকর্তা এবার বললেন—এত বেলায় বেশি রান্না করা গেল না। আমরা মুরগী পুষি। তাই—

—খেতে কোন অসুবিধে হচ্ছে না তো? শাঙ্কো বলে উঠল—মাংস হয়েছে, আলুভাজা হয়েছে—ব্যস্ আর কী লাগে।

খেয়েদেয়ে ওরা হ্যারির কাছে এল। হ্যারি আরও একটা বড়ি খেল। হ্যারি অনেকটা সুস্থ এখন। হ্যারি ঘরেই খেয়েছে। গৃহকর্ত্রী নিজেই হ্যারির খাবার এনে দিয়েছে।

এবার শোওয়া। চারজনের পক্ষে ঘরটা ছোটই। এরকম ছোট জায়গায় থাকা ফ্রান্সিসদের অভ্যেস আছে। পিরেল্লোর একটু অসুবিধে হল। পিরেল্লো কিছু বলল না। চেপেচুপে শুয়ে পড়ল। ফ্রান্সিস ডাকল—পিরেল্লো?

—বলুন।

—এই রাজ্যের রাজার নাম কী?

—মুজার্তো।

—লোক কেমন?

—চিন্তা করতে পারবেন না—কী অমায়িক এই রাজা মুজার্তো। অনেক রাজাই তো দেখেছি—মুজার্তোর মতো এমন সহৃদয় পরোপকারী প্রজাবৎসল রাজা আমি দেখিনি। প্রজাদের নিজের সন্তানের মতো ভালোবাসেন। প্রজারাও তাঁকে দেবতার মতো মানে। পিরেল্লো বলল।

—তাহলে তো রাজা মুজার্তোকে একবার দেখতে হয়। ফ্রান্সিস বলল।

—চলুন। কাল সকালে রাজসভায়। পিরেল্লো বলল।

—ঠিক আছে। যাবো। ফ্রান্সিস বলল। এবার হ্যারিকে বলল—হ্যারি, তুমি পারবে যেতে?

—আমি আর যাবো না। এখানেই থাকবো। হ্যারি বলল।

—বেশ। তুমি যদি চাও আমরা একজন তোমার সঙ্গে থাকতে পারি। শাঙ্কো বলল।

—না-না। আমি একাই থাকতে পারবো। হ্যারি বলল।

—বেশ। ফ্রান্সিস বলল।

সকলেই ঘুমিয়ে পড়ল। ফ্রান্সিসের চোখে ঘুম নেই। রাজা হানমের গুপ্ত ধনভাণ্ডার আবিষ্কার করতে দেবতার জন্যে সময় চাই। আবার শায়িত

দেবতাদের মন্দিরে যেতে হবে ফিরতে দেরি হলে জাহাজের বন্ধুরা, মারিয়া ভাবতো। এইসব চিন্তা করতে করতে ফ্রান্সিস ঘুমিয়ে পড়ল।

একটু বেলাতেই ফ্রান্সিসদের ঘুম ভাঙল। হাতমুখ ধুয়ে এল সবাই। সকালের খাবার দিয়ে গেল কর্তা নিজেই। তিনকোণা রুটি আর সব্জির ঝোল।

সবাই খেল। এবারে রাজবাড়ি যাওয়া। হ্যারি শুয়ে রইল। ওরা তিনজন চলল রাজবাড়ির উদ্দেশ্যে।

রাস্তা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। দুধারে বাড়ি। কাঠ আর পাথরের। লোকজন খুব বেশি নয়। ওরা হঠাৎ বাজনার শব্দ শুনল। একটা মোড়ে পীপের একদিকে চামড়া ঢাকা। অন্য পাশ খোলা। তাই দিয়ে বাজনা বাজাচ্ছে দু'তিনজন পুরুষ। একদঙ্গল ছেলেমেয়ে বাজনার তালে তালে নাচছে। ফ্রান্সিস বলল—এরা নাচছে কেন পিরেল্লো?

—আনন্দে। এই দেশে গান-বাজনা লেগেই আছে। কখনও কখনও সারারাত নাচগান চলে। গৃহকর্তা বললেন।

—তাহলে এরা সুখী। ফ্রান্সিস বলল।

—হ্যাঁ রাজা মুজার্তার প্রজারা সুখী। কোন অসুবিধে কোন সমস্যা নেই এদের। পিরেল্লো বললেন।

ডানহাতি দেখা গেল বহুদূর বিস্তৃত তুলোর ক্ষেত।

ফ্রান্সিস বলল—এখানে খুব ভালো তুলা চাষ হয়।

—হ্যাঁ। তুলোই প্রধান আয়ের পথ। পিরেল্লো বলল।

এবার পিরেল্লো আঙুল তুলে রাজবাড়ি দেখাল। কাঠপাথরে তৈরি রাজবাড়ি। তবে সাধারণ বাড়ির চেয়ে বেশ বড়। প্রবেশদ্বারে লোকজনের জটলা। সেখানে ফ্রান্সিসরা এসে দাঁড়াল। ঝকঝকে বর্শা হাতে প্রহরী। ফ্রান্সিসদের দেখে একটু অবাকই হল। বোঝাই যাচ্ছে বিদেশী। প্রহরী সবাইকে ঢুকতে দিচ্ছে না। পিরেল্লো এগিয়ে গিয়ে প্রহরীকে কী বলল। প্রহরী ঘাড় নাড়ল। পিরেল্লো ফ্রান্সিসদের ইশারায় ডাকল।

ফ্রান্সিসরা এবার সহজেই ভেতরে ঢুকল। দেখল বেশ ভিড়। দফায় দফায় দর্শনার্থী প্রজাদের ঢোকানো হচ্ছে। একদফা ভিড় চলে যেতেই ফ্রান্সিসরা ভালোভাবে রাজা মুজার্তাকে দেখল। রোগা লম্বা মুখে দাড়ি গোঁফ। কাঠের সিংহাসনে বসে আছেন। সিংহাসনে ফুলতোলা মোটা কাপড়ে ঢাকা। রাজা মাঝে মাঝে হাত নাড়ছেন। দর্শনার্থীরা আনন্দে চিৎকার করে রাজার জয়ধ্বনি দিচ্ছে। ফ্রান্সিসরা দেখল কোন বিচারপ্রার্থী কেউ নেই। হয়তো এ দেশে কোন অপরাধ হয় না। হয়তো ঝগড়া-বিবাদ হয় না।

এক দফা দর্শনার্থীরা বেরিয়ে যেতেই রাজা মুজার্তা ফ্রান্সিসদের দেখল। রাজা সঙ্গে সঙ্গে আসন থেকে উঠে দাঁড়ালেন। দ্রুতপায়ে হাসিমুখে ফ্রান্সিসদের কাছে এলেন। ফ্রান্সিসকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। তারপর শাঙ্কোকে তারপর পিরেল্লোকে বললেন—আসুন রাজপুরোহিত।

রাজা বললেন—আপনাদের তিনজন আসার কথা।

—হ্যাঁ। আমরা তিনজনই। একজন অসুস্থ হয়ে পড়ায় আসতে পারেননি। শাঙ্কো বলল।

আসনের কাছে এসে বললেন—আপনারা বসুন। তিনটি আসনই রাখা ছিল। ফ্রান্সিসরা বসল। রাজা বলতে লাগলেন—পিরেল্লো স্পেনীয় ভাষায় তা বলতে লাগলেন। রাজা বললেন—বেশ কয়েকবছর আগের কথা। আমি স্বপ্ন দেখেছিলাম। একটা পাহাড়। গাছ-গাছালি ঘাসে সব সবুজ। পাহাড়ের সবই সবুজ এটা হয় না। কিন্তু স্বপ্নে দেখেছিলাম আমি যেন পাহাড় থেকে নামছিলাম। হঠাৎ মেঘশূন্য আকাশে বিদ্যুৎ চমকাল। একবার দুবার তিনবার। সঙ্গে সঙ্গে দেখলাম আমার সামনে তিনজন শ্বেতাঙ্গ। একজন শ্বেতাঙ্গ বললেন—প্রজাদের নিজের ছেলের মতো ভালোবাসবেন। দ্বিতীয়জন বললেন—নিজের প্রাণরক্ষার জন্যে যুদ্ধ করবেন। অন্যথায় নয়। তৃতীয়জন বললেন—আপনার রাজত্বে দারিদ্র্য যেন না থাকে। তিন পুরুষ পাহাড়ের চূড়ার দিকে হেঁটে চললেন। কিছুক্ষণ তাঁদের দেখলাম। তারপর তাঁরা দৃষ্টির বাইরে চলে গেলেন।

সবাই চুপ করে রইলেন। ফ্রান্সিস বলল—সেই তিনপুরুষ যে আমরাই সেটা বুঝলেন কী করে?

—স্বপ্নে যতটা দেখেছিলাম তাতে আপনাদের সঙ্গে মিল আছে। রাজা বললেন।

আবার একদফা দর্শনার্থীদের ছাড়া হল। রাজসভার কাছে আবার ভিড় হল। রাজার জয়ধ্বনি চলল। রাজাও হাত নেড়ে দর্শনার্থীদের উৎসাহিত করতে লাগলেন।

আর একদফা দর্শন দিয়ে রাজা মুজার্তো প্রহরীদের আর কাউকে ঢুকতে মানা করে দিলেন। সভাঘর আস্তে আস্তে নিঃশব্দ হল।

এবার রাজা মুজার্তো ফ্রান্সিসদের দিকে তাকিয়ে বললেন—বেশ শান্তিতেই ছিলাম। প্রজাদের অভাব-অভিযোগ জেনে সে সব দূর করতে চেষ্টা করছিলাম। কিন্তু পাহাড়ের ওপারে একটা রাজ্য আছে। রাজার নাম জুদেবা। অত্যন্ত হিংস্র প্রকৃতির মানুষ। ও দেশে প্রজাদের অনেক কষ্টে দিন কাটে। এই রাজা জুদেবা নরহত্যা ছাড়া কিছু বোঝে না। সারা রাজ্যে চর ঘুরে বেড়ায়। কেউ রাজা জুদেবের বিরুদ্ধে একটি কথা বললে তাকে ধরে রাজার কাছে নিয়ে আসে। তার ওপর শুরু হয় নির্মম অত্যাচার। তাই সবাই মুখ বুঁজে থাকে। একটু থেমে বলতে লাগলেন—রাজা জুদেবা বার তিনেক আমার রাজ্য আক্রমণ করেছে। আমার প্রজারা প্রাণপণ লড়াই করে তাদের তাড়িয়ে দিয়েছে। আমার দেশপ্রেমিক কিছু যোদ্ধাও মারা গেছে। আমার লোকজনেরা সংবাদ নিয়ে এসেছে আজ অথবা কালকে রাজা জুদেবা আমার রাজ্য আক্রমণ করবে। তাই বড় চিন্তায় আছি।

—আপনার যোদ্ধাদের একত্র করেছেন তো? পিরেল্লো বলল।

—হ্যাঁ। আমার যোদ্ধাদের উপর আমার অগাধ বিশ্বাস। আমাকে বাঁচাবার জন্য ওরা নিজেদের জীবন বিপন্ন করে লড়াই চালাবে। কিন্তু আমার দুঃখ যে বেশ কিছু প্রজা মারা যাবে, আহত হবে। তাই আমি যুদ্ধ চাই না। রাজা জুদেবাকে বলব—আমি হার স্বীকার করলাম।

—কিন্তু আপনার ওপর যুদ্ধ চাপিয়ে দিলে আপনাকে তো যুদ্ধ করতেই হবে। ফ্রান্সিস বলল।

—ঠিকই বলেছেন। রাজা মুজার্তা বললেন—আমরা এখন লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত। তবে আমরা সমস্যায় আছি। আমার রাজত্বের উত্তরভাগে দুর্ধর্ষ লড়িয়ে সৈন্য ছিল। কিন্তু ভূমিকম্পে সেই লড়িয়ে সৈন্যরা অনেক মারা পড়েছে কিছুদিন আগে। রাজা জুদেবা সেই খবর জানে। আমরা যে হীনবল হয়ে পড়েছি সেটা বুঝে লড়াই করতে আসছে। সাধারণ সৈন্যদের নিয়ে আমরা যতটা পারি লড়বো। এখন পর্যন্ত ভেবে রেখেছি আমরা হার স্বীকার করবো না। রাজা মুজার্তা বললেন।

—হ্যাঁ। লড়াইয়ে মনের জোরটাই বড় কথা। কথাটা বলে ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়াল। শাঙ্কোও উঠল। ফ্রান্সিস বলল—আমরা বিদেশী। আপনাদের লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করতে পারি না। তবু আপনার মতো রাজার জন্য প্রয়োজনে আমরা লড়বো। ফ্রান্সিস বলল।

—তাহলে তো ভালোই। রাজা মুজার্তা বললেন।

ফ্রান্সিস আর শাঙ্কো মাথা একটু নুইয়ে রাজাকে শ্রদ্ধা জানিয়ে সভাঘরের দরজার দিকে চলল। ফ্রান্সিস বাইরে এসে দেখল ডানদিকে বিরাট প্রান্তর। পাহাড়ের কাছে তাই প্রস্তরাকীর্ণ। চাষ হয় না। ফ্রান্সিস বুঝল লড়াইটা এখানেই হবে। ফ্রান্সিস বলল—শাঙ্কো রাজা জুদেবার সঙ্গে লড়াইটা এখানেই হবে। রাজা মুজার্তাকে তার দেশবাসী পিতার মতো শ্রদ্ধা করে, বন্ধুর মতো ভালোবাসে। কাজেই রাজা মুজার্তাকে হারানো মুশকিল।

—তাহলে লড়াই তো হবেই। শাঙ্কো বলল।

—হ্যাঁ—কোন সন্দেহ নেই। ফ্রান্সিস বলল।

হাঁটতে হাঁটতে ফ্রান্সিসরা যে বাড়িটাতে আশ্রয় নিয়েছে সেখানে এল। হ্যারি বলল—তোমাদের ফিরতে বেশ দেরি হল। ফ্রান্সিস বিছানায় বসল। তারপর হ্যারিকে সব বলল। হ্যারি বলল—ওরকম একজন রাজা তাকে আমাদের সাহায্য করা উচিত।

—কিন্তু কীভাবে সাহায্য করবো? ফ্রান্সিস বলল।

—তাঁর স্বপক্ষে লড়াই করে। শাঙ্কো বলল।

—তাহলে তো বন্ধুদের এখানে নিয়ে আসতে হয়। ফ্রান্সিস বলল।

—আমি বলি কি আগেই বন্ধুদের নিয়ে আসার প্রয়োজন নেই। লড়াই হোক। যদি রাজা মুজার্তা হেরে যায় তখন আমরা সাহায্য করবো। শাঙ্কো বলল।

—শাঙ্কো ঠিকই বলেছে। হ্যারি বলল।

—ঠিক আছে। তবে আমাদের এখানে কয়েকটা দিন থাকতেই হবে। হ্যারি এখনও সম্পূর্ণ সুস্থ নয়। ফ্রান্সিস বলল।

—না-না। আমি অনেকটা সুস্থ। হ্যারি বলল।

—উঁহু—তোমার এখনও কয়েকটা দিন সম্পূর্ণ বিশ্রাম দরকার। ফ্রান্সিস বলল।

সেদিন সকালে রাজা জুদেবা আক্রমণ করল। রাজবাড়ির সামনে বিরাট প্রান্তরে দু'দলে লড়াই শুরু হল। চিৎকার হৈ-হল্লা। আহতদের আর্তনাদ গোঙানি ফ্রান্সিসরা সবই শুনতে পারছিল। দুপুরবেলা বাড়ির মালিক এসে জানিয়ে গেল রাজা মুজার্তা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নিচ্ছে। রাজা মুজার্তার সৈন্যরা ভালোই লড়ছিল। কিন্তু বেশ কিছুক্ষণ পরে হার স্বীকার করতে বাধ্য হয়। ফ্রান্সিস বলল—এখন কী করবে হ্যারি?

—এই বাড়িতেই শাঙ্কোদের জন্য অপেক্ষা করবো। হ্যারি বলল।

ফ্রান্সিসরা উঠে দাঁড়াল। হ্যারি বলল—কোথায় যাচ্ছো?

—বাইরেটা দেখে আসি। নৃশংস রাজা জুদেবার সৈন্যরা নিশ্চয়ই পরাজিত রাজার প্রজাদের উপর অত্যাচার চালাচ্ছে। রাজা জুদেবার সৈন্যদের কয়েকটাকে খতম করে আসি। অবশ্য শেষ লড়াই এখনও বাকি। ফ্রান্সিস বলল।

—যা করবে সাবধানে করো। ভুলে যেও না—আমরা বিদেশী। দু'পক্ষের কোন সৈন্যই আমাদের বুঝবে না। হত্যা করতে চাইবে। হ্যারি বলল।

—ঠিক আছে। ফ্রান্সিস হাত নেড়ে বলল। ফ্রান্সিস বাড়ির মধ্যে গেল। গৃহকর্তার স্ত্রীকে গিয়ে বলল—আমাকে কিছু কাঠকয়লা দিন।

উনি কিছুই বুঝলেন না। ফ্রান্সিস এবার উনুন দেখে উনুনের নীচে জমে থাকা কাঠকয়লা দেখলো। এবার উনি বুঝলেন। উনুনের নীচ থেকে কিছু কাঠকয়লা এনে ফ্রান্সিসকে দিলেন। উনি বুঝতে পারলেন না এখন এই বিকেলে কাঠকয়লা দিয়ে ফ্রান্সিসরা কী করবে।

ফ্রান্সিস হ্যারির কাছে এল। কিছুক্ষণের মধ্যে মুঠো-মুঠো কাঠকয়লা এনে ফ্রান্সিসকে দিলেন। উনি বুঝতে পারলেন না এখন এই বিকেলে কাঠকয়লা দিয়ে ফ্রান্সিসরা কী করবে।

ফ্রান্সিস হ্যারির কাছে এল। কিছুক্ষণের মধ্যে মুখে কাঠকয়লা ঘষল। মুখটা কালো গুঁড়ো দেখতে লাগল। এইভাবে গায়ের রঙ লুকিয়ে বাইরের রাস্তায় এলো। বাড়িগুলোর আড়ালে আড়ালে উত্তরের যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে চলল। জানতে হবে রাজা মুজার্তা কোথায় আশ্রয় নিয়েছেন। অবশ্য এখন সেটা জানা খুব মুশকিল। বলা যায় অসম্ভব। কোথায় এখন আত্মগোপন করলেন সেটা আগে জানতে হবে।

ফ্রান্সিস চলেছে। এখান থেকে ওখান থেকে মানুষের গোঙানি চিৎকার কান্না সবই শুনতে পারছিল। হঠাৎ দেখল দু'তিনজন রাজা মুজার্তার সৈন্য পালিয়ে

গেল। ফ্রান্সিস বলল বোঝাই যাচ্ছে রাজাকে না দেখে ওরা ভীত হয়ে পড়েছে। এই অবস্থায় একমাত্র রাজাই ওদের যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করতে পারেন।

একটা বিরাট গাছের কাছে এল। নীচেটা পাথর বাঁধানো। ফ্রান্সিস বসল বাঁধানো পাথরে। ওর মন বলল ও নিরাপদে নেই। এই কথাটা ভাবতে ভাবতেই দুজন রাজা জুদেবার সৈন্য গাছের আড়াল থেকে ফ্রান্সিসের সামনে এল। কাঠকয়লা মাখা মুখ দেখে ওরা বুঝে উঠতে পারল না লোকটা কোন দেশের। একজনের হাতে বর্শা, অন্যজনের হাতে ছোরা। বর্শাধারী সৈন্যরা ওদের ভাষায় বলল—তুমি কে? কোত্থেকে এসেছো?

ফ্রান্সিস দুই কান মুখ দেখাল। বোঝালো বোবা। কানেও শুনতে পায় না। সৈন্যদের কেমন মনে হল ফ্রান্সিস কালোদেশের লোক। ফ্রান্সিস নানাভাবে বোঝাবার চেষ্টা করল—ও অন্য দেশ থেকে এসেছে। বর্শাধারী বলল—এখন এই দেশে যুদ্ধকালীন অবস্থা চলছে। এর মধ্যে তুমি এসেছো কেন? ফ্রান্সিস কিছুই বুঝল না। জোরে মাথা নাড়তে লাগল। বর্শাধারী যোদ্ধাটি এবার ফ্রান্সিসকে মেরে ফেলতে চাইল। ও ওর দুচোখ দেখে ফ্রান্সিস সেটা বুঝতে পারল। ফ্রান্সিস সজাগ হল। সৈন্যটি বর্শার ফলাটা ফ্রান্সিসের বুক লক্ষ্য করে ছুঁড়ল। ফ্রান্সিস দ্রুত সরে গিয়ে বর্শার হাতলের দিকটা ধরে ফেলল। ফ্রান্সিস স্পেনীয় ভাষায় বলল—তুমি আমাকে হত্যা করতে চেয়েছিলে। কাজেই তোমাকে ছাড়া হবে না। এইবার মর। তখন ফ্রান্সিসের চোখ দুটো জ্বলে উঠল। বর্শাটা ধরে সৈন্যটির বুক লক্ষ্য করে বর্শাটা ছুঁড়ল। যোদ্ধাটি লাফিয়ে উঠল। বর্শাটা ওর পেটে ঢুকে গেল। সৈন্যটি কাতরাতে কাতরাতে বর্শাটা টেনে বের করতে গেল। কিন্তু বর্শা বের করতে পারল না। বর্শাটা ধরে ও মাটিতে পড়ে গেল।

এবার বড় ছোরা হাতে অন্য সৈন্যটি ফ্রান্সিসের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। ফ্রান্সিস দ্রুত সরে গেল। সৈন্যটি ফ্রান্সিসের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। ফ্রান্সিস দ্রুত সরে গেল। সৈন্যটি ফ্রান্সিসকে ধরতে পারল না। মাটিতে পড়ে গেল। ফ্রান্সিস ওর ছোরাসুদ্ধ হাতটা পা দিয়ে চেপে ধরল। সৈন্যটি ছোরাটা বের করার জন্যে চেষ্টা করতে লাগল। সৈন্যটি এপাশ ওপাশ করতে লাগল। ফ্রান্সিস অতি দ্রুত ছোরাটা বের করল। তারপর বিন্দুমাত্র অপেক্ষা করল না সোজা সৈন্যটির গলায় বসিয়ে দিল। সৈন্যটি চিৎকার করে উঠল। তারপর ও আর কোন শব্দ করতে পারল না। তারপর হাত পা ছড়িয়ে মাটিতে শুয়ে পড়ল।

ফ্রান্সিস ছোরাটা কোমরে গুঁজল। বর্শাটা হাতে নিল। চলল পাহাড়ের নীচের প্রান্তরটার দিকে। হঠাৎ দেখল রাজা জুদেবার একদল সৈন্য আসছে। ফ্রান্সিস সঙ্গে সঙ্গে একটা বড় গাছের আড়ালে চলে এল। সৈন্যরা চলে গেল। ফ্রান্সিস এবার হ্যারির কাছে চলে এল।

হ্যারি চুপ করে শুয়েছিল। ফ্রান্সিস একটু উদ্বিগ্ন হল। বলল—এখন তোমার শরীর কেমন?

—এখনো একেবারে সুস্থ নই। শরীরের দুর্বলতাটা আছেই। হ্যারি বলল।

—তুমি বিশ্রাম করো। ফ্রান্সিস বলল। তারপর সেই দুই সৈন্যের কথা বলল। পিরেল্লো চুপ করে বসেছিল। এবার বললো—যাক দুটোকে তো মেরেছেন। এভাবেই ওদের মারতে হবে।

সেদিন বিকেলেই বাড়ির কর্তা একটা শস্যটানার গাড়ি নিয়ে এল। শাঙ্কো আর হ্যারি তৈরিই ছিল। দুজনে গিয়ে গাড়িটার কাছে দাঁড়াল। ফ্রান্সিস তখন পিরেল্লোকে নিয়ে এল। বলল—এই দু'জন যাবে আলকাবার বন্দরে। পিরেল্লো বুঝিয়ে বলল সেটা। গাড়োয়ান মাথা ঝাঁকিয়ে বুঝিয়ে দিল সে বুঝেছে। সেই সঙ্গে বলল—বড় দূর।

—তোমাকে একটা সোনার চাকতি দেব। শাঙ্কো বলল।

—বেশ। গাড়োয়ান হাসল। ফ্রান্সিস বলল—শাঙ্কো এই গাড়িটা ছেড়ে দিও না। আলকাবা থেকে গাড়ি জোগাড় করে এই গাড়িটিকেও নিয়ে চলে এসো যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। আমি খুব চিন্তায় থাকবো।

পিরেল্লো বলল, গাড়োয়ানকে বলুন কিছু খড় জোড়াড় করে আনতে। পিরেল্লো গাড়োয়ানকে বলল সেটা। গাড়োয়ান গাড়ি থেকে নেমে এল। একটু পরেই একগাদা খড় নিয়ে এল। সেই খড় গাড়ির ভেতরে বিছিয়ে দিল। শাঙ্কো কিছুটা খড় তুলে একপাশে বেশি করে রাখল। বলল—হ্যারি তুমি এখানে বসো। হ্যারি তাই বসল। শাঙ্কো গাড়ি ছেড়ে দিতে বলল। গাড়োয়ান কিছুই বুঝল না। শাঙ্কো হাত নেড়ে বোঝাল। গাড়োয়ান গাড়ি ছেড়ে দিল।

ঘরে ফিরে ফ্রান্সিস বিছানায় বসল। গৃহকর্তা ভেতরে চলে গেল। অনেক চিন্তা এখন ফ্রান্সিসের মাথায়। সবচেয়ে বড় চিন্তা হ্যারির জন্যে। শস্যটানা গাড়িতে প্রচণ্ড ঝাঁকুনি খেতে খেতে যাওয়া—হ্যারি না ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়ে। তারপর লড়াইয়ের চিন্তা। রাজা জুবেদার সৈন্যরা ভালো যোদ্ধা কি না। রাজা জুবেদা মানুষটাই বা কেমন। শেষ কথা হল একটাই—রাজা জুবেদার সৈন্যদের হার স্বীকার করতে হবে। এখন শুধু প্রতীক্ষা—ভাইকিং বন্ধুদের জন্যে।

বাড়ির কর্তা ফ্রান্সিসদের ঘরে ঢুকল। বলল—আমাদের রাজা হেরে গেলেন—এটা যে কী বেদনার আমি বলে বোঝাতে পারবো না।

—ফ্রান্সিস বলল—আচ্ছা, রাজা মুজার্তা কোথায় আত্মগোপন করেছেন?

—কী হবে তা শুনে। আপনারা তো মাত্র তিনজন। গৃহকর্তা বলল।

—অপেক্ষা করুন তিনজন তিরিশজন হবে। আপনি আমাকে রাজা মুজার্তার সঙ্গে দেখা করিয়ে দিতে পারেন?

—কী হবে রাজার সঙ্গে কথা বলে। গৃহকর্তা বলল।

—সব ব্যাপারেই আপনি এত হতাশ হয়ে পড়ছেন কেন? ফ্রান্সিস বলল। রাজা জুবেদা আজকে জিতেছেন। সময় এলে আমরা পরের লড়াইয়ে জিতবো। ফ্রান্সিস বলল।

—জানি না আপনি কী করে যুদ্ধে জেতার আশা করছেন। গৃহকর্তা বলল।
সেসব পরে দেখা যাবে। আপনি আমাকে নিয়ে চলুন।
রাজা কোথায় আত্মগোপন করেছেন? ফ্রান্সিস আবার বলল।

—এক অমাত্যের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছেন। গৃহকর্তা বললেন।

—আপনি তো অমাত্যের বাড়ি চেনেন। ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—চিনি বৈকি। রাজার চিঠি ফরমান এসব অমাত্যদের কাছে পৌঁছে দেওয়াই আমার কাজ। গৃহকর্তা বললেন।

—তাহলে আমাকে নিয়ে চলুন। ফ্রান্সিস বলল।

—ঠিক আছে। একটু রাত হোক। গৃহকর্তা বলল।

—বেশ। আমাকে ডাকবেন। ফ্রান্সিস বলল।

রাত গভীর হল। ফ্রান্সিসের চোখে ঘুম নেই। ও তখন ভাবছে কখন ভাইকিং বন্ধুরা আসবে। জোরদার লড়াই হবে। রাজা জুবেদার সৈন্যরা শুধু বর্শা হাতে লড়াই করবে। একবার বর্শাটা ছুঁড়লেই সৈন্যদের হাতে লড়াই করার অস্ত্র থাকবে না। তখন অতি সহজে সৈন্যদের ধরে ফেলা যায়। তরোয়ালের কাছে ওরা তখন হার স্বীকার করতে বাধ্য।

বাড়ির কর্তা এল। ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়াল। শাঙ্কো ওর ছোরাটা রেখে গেছে। ফ্রান্সিস ছোরাটা কোমরে গুঁজে নিল। পিরেল্লো বলল—আমিও যাবো। ফ্রান্সিস বলল—দোভাষী হিসেবে আপনাকে যেতেই হবে।

আকাশে ভাঙা চাঁদ। চারদিক মোটামুটি দেখা যাচ্ছে। তিনজনে হেঁটে চলল। একটা ইঁদারার কাছে এল ওরা। বাড়ির কর্তা ডানদিকে ঘুরে একটা বাড়ির সামনে এল। পাথর আর কাঠের বাড়ি। বাড়িটা বেশ বড়। চারদিকে ফুলের গাছ। বিচিত্র সব ফুল ফুটে আছে।

ওরা বড় দরজাটার কাছে এল। সাধারণ বাড়িটাড়ির থেকে অনেক ভালো। বেশ অর্থব্যয়েই বাড়িটা করা হয়েছে। গৃহকর্তা দরজায় কান রেখে দরজায় আঙুল দিয়ে খট্‌খট্ শব্দ করল। সঙ্গে সঙ্গে দরজার একটা পাল্লা খুলে গেল। একজন প্রহরী মুখ বাড়াল। দুচোখ কুঁচকে সেই গৃহকর্তাকে দেখল। আস্তে আস্তে দরজাটা খুলে গেল। ফ্রান্সিসরা ভেতরে ঢুকল। বেশ বড় ঘর। বাঁকা পাথরের চেয়ার। শ্বেতপাথরের টেবিল। একেবারে অন্ধকার ঘর। ঐ ঘরের পরে এল গৃহকর্তা। ফ্রান্সিসকে বলল—ভেতরের ঘরে আসুন।

ভেতরের ঘরে মোটা মোমবাতি জ্বলছে। সেই আয়নায় ফ্রান্সিস দেখল বাঁ দিকে একটা খাট। রাজা মুজার্তা তার ওপর শুয়ে আছেন। ফ্রান্সিসরা ঢুকতে উনি পাশ ফিরে শুলেন। পিরেল্লো দুজনের কথা দোভাষীর মতো বুঝিয়ে দিতে লাগল।

—মাননীয় রাজা—আপনি কেমন আছেন। ফ্রান্সিস জিগ্যেস করল।

—একজন রাজ্যহারা রাজা যেমন থাকে। রাজা বিষাদের সুরে বললেন।

—আপনি আবার রাজ্য ফিরে পাবেন। ফ্রান্সিস বলল।

রাজা মুজার্তা একটু অবাক চোখে ফ্রান্সিসের মুখের দিকে তাকাল।

—হ্যাঁ—আপনি জয়ী হবেন। আমি ফ্রান্সিস বলছি। ফ্রান্সিস বলল।

রাজা কিছুক্ষণ ওপরের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

ফ্রান্সিস দেখল স্বল্প আলোয়—আর একটা খাটে রাণী শুয়ে আছেন। সঙ্গে শিশুপুত্র। ফ্রান্সিস বলল—মাননীয় রাজা আপনি ভেঙে পড়বেন না। মনে সাহস রাখুন। রাণীর কাছে এল। পিরেল্লোও এল। ফ্রান্সিস বলল—মাননীয়া রাণী—আপনি শক্ত থাকুন। দুশ্চিন্তা করবেন না। মাননীয় রাজা আবার তাঁর রাজ্য ফিরে পাবেন। রাণী কোন কথা বললেন না। চুপ করে শুয়ে রইলেন।

গৃহকর্তার সঙ্গে ফ্রান্সিসরা বাড়ির বাইরে বেরিয়ে এল। ফ্রান্সিসকে গৃহকর্তা বলল—একটা কথা বলি,

—বলুন, কর্তা বলল।

—আমার একত্রিশ জন বন্ধু কাল পরশুর মধ্যে এখানে আসবে। তাদের থাকা খাওয়ার ব্যাপারটা আপনি দেখবেন আমার অনুরোধ। ফ্রান্সিস বলল।

—তারা এখানে আসবে কেন? গৃহকর্তা জানতে চাইলেন।

—রাজা মুজার্তার হয়ে লড়াই করবে। ফ্রান্সিস বলল।

—তারা কি জুবেদার সৈন্যদের হারাতে পারবে? গৃহকর্তা সন্দেহ প্রকাশ করলেন।

—আমরা ভাইকিং। আমার বন্ধুরা যে কী দুর্ধর্ষ যোদ্ধা সেটা লড়াই দেখলেই বুঝবেন। ফ্রান্সিস বলল।

—তাহলে রাজা মুজার্তার মুক্তির আশা আছে। পিরেল্লো বলল।

—নিশ্চয়ই আছে। ফ্রান্সিস কথাটা জোর দিয়ে বলল।

—আপনার কথা শুনে আমি আশ্বস্ত হলাম। এই রাজাকে আমরা শ্রদ্ধা তো করিই বড় ভালোবাসি। গৃহকর্তা বলল।

পরের সারাটা দিন ফ্রান্সিস বিছানায় শুয়ে রইল। বাড়ির কর্তা দু-তিনবার এসে জানতে চাইল—আপনার শরীর ভালো তো?

—আমি ভালো আছি। একখানা তরোয়াল হাতে পেলে আমি এক্ষুনি লড়াইয়ে নামতে পারি। ফ্রান্সিস দাঁত চেপে কথাটা বলল।

—তরোয়াল কী? গৃহকর্তা জানতে চাইল।

—একটা যুদ্ধাস্ত্র। এই অস্ত্রটি আমাদের হাতে থাকলে আমাদের পরাস্ত করা অসম্ভব। ফ্রান্সিস বলল।

—আপনারা এই তরোয়াল দিয়ে লড়াই করেন? গৃহকর্তা জানতে চাইল।

—হ্যাঁ। ঐ অস্ত্রটা দিয়েই আমরা শত্রুদের পরাস্ত করি। ফ্রান্সিস বলল।

পরের সারাটা দিন ফ্রান্সিস ঘর থেকে বেরুলো না। রাজা জুবেদার সেনাপতি রাজা মুজার্তার প্রজাদের নাচ-গান-বাজনা করতে আদেশ দিয়েছিল। কিন্তু প্রজারা রাজি হয়নি। কথাটা ফ্রান্সিস গৃহকর্তার মুখে শুনল। ফ্রান্সিস বলল—এটা ঠিক

কাজ হল না। আপনি রাজার অনুমতি নিয়ে প্রজাদের গানবাজনা করতে বলুন। এসব করলে রাজা জুবেদার সৈন্যরা অলস হয়ে পড়বে। ওরা নিশ্চিন্তে থাকবে। ওরা বুঝে যাবে যে আর লড়াই করতে হবে না আমি এটাই চাইছি। ওদের মধ্যে আর শৃঙ্খলা থাকবে না। আমাদের লড়াই করতে সুবিধে হবে।

—দেখি। বলে বাড়ির কর্তা চলে গেল। ফ্রান্সিস এক গ্লাশ জল খেয়ে আবার শুয়ে পড়ল।

সন্ধ্যের সময় ফ্রান্সিস শুনল বাইরে বাজনার সঙ্গে নাচগান শুরু হয়েছে। ফ্রান্সিস আপন মনে হাসল। বুঝল বাড়ির কর্তা কাজটা করতে পেরেছে। এবার যুদ্ধের জন্যে প্রতীক্ষা।

ফ্রান্সিস মধ্যরাত পর্যন্ত বাড়ির বাইরে এসে অপেক্ষা করল। ও পায়চারি করতে লাগল। বনের ওপরের আকাশটা পূবদিকে লাল হল। কিছুক্ষণ পরে সূর্য উঠল। ফ্রান্সিস সারারাত ঘুমোতে পারল না।

সকালেও বাড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে রইল। চোখ বনের পাশের রাস্তার ওপর। কিন্তু বন্ধুদের দেখা নেই।

ফ্রান্সিস পেটপুরে দুপুরের খাবার খেল। কিছুক্ষণ শুয়ে রইল। তারপর উঠে বসল। বাড়ির বাইরে এল। তাকিয়ে রইল দূরের রাস্তার দিকে।

হঠাৎ দেখল—ধুলো উড়িয়ে তিনটে শস্যটানা গাড়ি আসছে। ফ্রান্সিস সেইদিকে ছুটল। গাড়িগুলোর কাছে এল। বন্ধুরা ধ্বনি তুলল—ও-হো-হো। ফ্রান্সিস দুহাত ওপরে তুলে বন্ধুদের ধ্বনি থামাতে বলল। বন্ধুরা এবার চুপ করল। বন্ধুরা গাড়ি থেকে নামল। ফ্রান্সিসের নির্দেশে চলল বাড়িটার দিকে। বাড়ির কাছে এসে বিস্কোকে বলল—তোমরা খাবে তো?

—না-না, আমরা এক সরাইখানায় খেয়ে এসেছি। বিস্কো বলল।

—বাঁচালে। তোমাদের এতজনের জন্যে রান্না করতে বলবো ভেবেছিলাম। কিন্তু বাড়ির কর্তাকে রাঁধতে বলিনি। এত রান্না হবে। তোমরা না এলে সব নষ্ট হবে। ঘরের কাছে এসে ফ্রান্সিস বলল—আপাতত এই ঘরেই ঠেসেঠুসে বসো। বেশি শব্দ করবে না। তোমাদের কথা কেউ যেন জানতে না পারে। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই বাড়ির কর্তা আসবে। তোমাদের আসার জন্য কর্তাকে বলেছি। উনি ভাঁড়ার ঘর খালি করে দেবেন। তাতে অনেকেই থাকতে পারবে। ঘরে ঢুকে কয়েকজন শুয়ে পড়ল। বাকিরা কেউ কাঠের দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসল। ফ্রান্সিস ঘরটায় ঢুকল। বলল—শাঙ্কোর মুখে সব শুনেছো তোমরা। নৃশংস রাজা জুবেদা এখানকার রাজা মুজার্তাকে হারিয়ে রাজবাড়ি দখল করে বসে আছে।

রাজা মুজার্তার মতো এমন সহৃদয় প্রজাবৎসল রাজা আমি দেখিনি। এখন রাজা জুবেদার সঙ্গে আমাদের লড়াই করতে হবে। আমরা সৈন্যসহ রাজা জুবেদাকে দেশ থেকে তাড়াবো। এবার বলো কখন আক্রমণ শুরু করতে চাও? ভাইকিং বন্ধুরা নিজেদের মধ্যে কথা বলতে লাগল। কিছু পরে বিস্কো বলল,

—ফ্রান্সিস আমরা রাতের বেলা রাজবাড়ি ঘিরে ফেলবো। তখন রাজার সৈন্যরা লড়াই করতে আসবে। তখন লড়াইও হবে। রাজা জুবেদার সৈন্যরা তখন নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে থাকবে।

—আমার এতে আপত্তি নেই। ফ্রান্সিস বলল।

এরমধ্যে গৃহকর্তা এলো। ভাঁড়ার ঘর থেকে মালপত্র সরিয়ে ফ্রান্সিসদের থাকার ব্যবস্থা করে দিল। দুটো ঘর পাওয়ায় শোয়া বসার জায়গা পাওয়া গেল।

ফ্রান্সিস গৃহকর্তাকে ডাকল। বন্ধুদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল। তারপর কর্তাকে বলল—রাজা মুজার্তার খবর কী?

—চুপ করে বসে থাকেন। কারো সঙ্গে কথা নেই। মাঝে মাঝে ফুঁপিয়েও ওঠেন। তখন রাণী সান্ত্বনা দেন। এভাবেই রাজার দিন কাটছে। গৃহকর্তা বলল।

—আমাকে রাজা মুজার্তার কাছে নিয়ে চলুন। রাজার সঙ্গে কিছু কথা আছে। ফ্রান্সিস বলল।

—আপনাকে তো বাড়িটা চিনিয়ে দিয়েছি। গৃহকর্তা বলল।

—বাড়ি চিনি। কিন্তু প্রহরীরা আমাকে ভেতরে ঢুকতে দেবে না। আমাকে তো ওরা চেনে না। তার ওপর আমি বিদেশী। ফ্রান্সিস বলল।

—ঠিক আছে। চলুন যাওয়া যাবে। গৃহকর্তা বলল।

—পরে নয়, আজকেই সন্ধ্যের সময় যেতে হবে। পরে অনেক কাজ আছে আমাদের। ফ্রান্সিস বলল।

—আপনারা কি রাজা জুবেদার সৈন্যদের আজকেই আক্রমণ করবেন? গৃহকর্তা জানতে চাইল।

—হ্যাঁ। কাজ সেরে আমাদের জাহাজে ফিরে যেতে হবে।

গৃহকর্তা মাথাটা এপাশ ওপাশ করল। বলল—আপনারা কি পারবেন?

—অবশ্যই পারবো। আপনি নিশ্চিন্তে থাকুন। তাহলে সন্ধ্যের সময় যাবো। আমাকে ডেকে নিয়ে যাবেন। ফ্রান্সিস বলল।

—বেশ। গৃহকর্তা চলে গেল। বিস্কো বলল—ফ্রান্সিস আমিও তোমাদের সঙ্গে যাবো।

—সে যেও। এবার পিরেল্লো এগিয়ে এল। বলল—আমিও যাবো।

—ঠিক আছে। ফ্রান্সিস বলল।

সন্ধ্যের সময় গৃহকর্তা এলো। ফ্রান্সিসকে বলল—

—আপনি তৈরি তো?

—অবশ্যই। ফ্রান্সিস বলল।

—আপনাদের জন্যে তিনটি রাঁধুনি এনেছি। গৃহকর্তা বলল।

—সে তো বটেই। এতজনের রান্না একা আপনার স্ত্রীর পক্ষে অসম্ভব।

—বেশ। গৃহকর্তা বলল।

—রাঁধুনিকে আমরা কিছু পারিশ্রমিক দেবো। ফ্রান্সিস বলল।

—এবার চলুন। ফ্রান্সিস বলল।

চারজন রাস্তায় নেমে চলল উত্তরমুখো। ওদিকেই অমাত্যের বাড়ির দিক। এলোমেলো হাওয়া দিচ্ছে ধুলো উড়ছে। আকাশে চাঁদ আছে। অস্পষ্ট চাঁদের আলো ছড়িয়ে আছে। ফ্রান্সিস ভাবলো—মোটামুটি চাঁদের আলো পাওয়া যাবে। এতে লড়াই চালাতে সুবিধেই হবে।

চারজনে অমাত্যের বাড়িতে পৌঁছল। পিরেল্লো দরজার টোকা দিল। দরজা খুলে দিল।

ফ্রান্সিসরা ভেতরে ঢুকল। গৃহকর্তার পেছনে পেছনে ফ্রান্সিসরা রাজার শোয়ার ঘরে এল। মোমবাতির আলোয় দেখল রাজা মুজার্তা চুপ করে বিছানায় বসে আছেন। ফ্রান্সিসদের মুখ তুলে দেখলেন। কোন কথা বললেন না। ফ্রান্সিস একটু মাথা নুইয়ে দিল। তারপর বলল—আপনাকে একটা শুভসংবাদ দিচ্ছি। আমার বীর যোদ্ধা বন্ধুরা এসেছে। রাজা জুবেদাকে আমরা হারাতে পারবো। আমাদের দু'একজন বন্ধু যুদ্ধে মারা যেতে পারে আহত হতে পারে। তবুও আপনাকে আপনার রাজ্য ফিরিয়ে দিতে আমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

রাজা মুজার্তা কিছু বললেন না।

—মাননীয় রাজা আপনি দুশ্চিন্তা করবেন না। ফ্রান্সিস বলল—এবার আপনার কাছে জানতে চাইছি যুদ্ধে রাজা জুদেবার পরাজয় ঘটলে আপনি কী চান?

—কী আর চাইবো। তিনি বেঁচে থাকা সৈন্যদের নিয়ে নিজের রাজ্যে ফিরে যাবেন। রাজা বললেন।

—যদি বলি আমরা রাজা জুবেদাকে হত্যা করতে পারি। ফ্রান্সিস বলল।

রাজা মুজার্তা চমকে উঠলেন। দুহাত নেড়ে বললেন—না-না। তার মৃত্যু আমি চাই না।

—রাজা জুবেদা কিন্তু নির্মম নিষ্ঠুর হিংস্র। ফ্রান্সিস বলল।

—তবু আমি কখনও তার মৃত্যু চাই না। রাজা মুজার্তা বললেন।

—ও কিন্তু আপনাকে খুঁজে পেলে বন্দী করতে পারে, আপনাকে হত্যা করতে পারে। ফ্রান্সিস বলল—

—তা হোক। তবুও আমি ওর মৃত্যু চাই না। রাজা বললেন।

—বেশ। তা হলে আমি স্থির করলাম—রাজা জুবেদাকে এবং সৈন্যদের হাত বেঁধে তার রাজ্যের সীমান্তে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দেব। তারপর তারা যেখানে খুশি যায় যাক। ফ্রান্সিস বলল।

—তাই করুন। আমিও এটাই চাই। রাজা বললেন।

ফ্রান্সিস বলল—বেশ। তাই করবো।

হঠাৎ বাইরের দরজার কাছ থেকে দরজা ধাক্কা দেবার শব্দ হল। কারা গলা চড়িয়ে বলছে—দরজা খোলো। বাড়ির মালিক অমাত্য ভেতরের ঘর থেকে ছুটে এলেন।

রাজা বললেন অমাত্যকে—বোধহয় রাজা জুবেদার সৈন্যরা আমার খোঁজ পেয়েছে। তাই আমাকে বন্দী করতে এসেছে।

—দেখছি—দেখছি। অমাত্য চলে যাবার জন্যে ঘুরে দাঁড়াতেই দেখল বর্শা উঁচিয়ে দুজন সৈন্য এই ঘরের দিকে আসছে। ফ্রান্সিস মৃদুস্বরে বলল—বিস্কো।

বিস্কো সঙ্গে সঙ্গে বুকের কাছে হাত ঢুকিয়ে ওর ছোরাটা বের করল। অমাত্য ছুটে ঐ দুজন সৈন্যের দিকে এগোলেন। একজন সৈন্য বর্শা নামিয়ে অমাত্যের বুক লক্ষ্য করে ছুঁড়ল। বর্শা অমাত্যর বুকে বিঁধে গেল। অমাত্য বর্শাটা ধরে মাটিতে পড়ে গেলেন। বর্শাটা ঐ সৈন্যের হাতছাড়া হল। ফ্রান্সিস ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। ওর চোয়াল লক্ষ্য করে ঘুঁষি চালাল। সৈন্যটি ছিটকে মেঝেয় পড়ে গেল। অন্য সৈন্যটি বর্শা হাতে এগিয়ে এল। বিস্কো দ্রুত ছুটে গিয়ে ঐ সৈন্যটির বুকে ছোরা বিঁধিয়ে দিল। সৈন্যটির মুখ থেকে অক্ শব্দ বেরিয়ে এল। ও মেঝেয় পড়ে গেল।

ওদিকে ফ্রান্সিস ঐ সৈন্যটির কানের ওপর চোয়ালে কপালে ঘুঁষি চালাতে লাগল। সৈন্যটি কাটা কলাগাছের মতো ধপ্ করে মেঝেয় পড়ে গেল। সৈন্যটি জ্ঞান হারালো।

ফ্রান্সিস অমাত্যের বুক থেকে বর্শাটা খুলে নিল। বলল—বিস্কো। এই দুটোকে বাড়ির বাইরে ফেলে দিতে হবে। হাত লাগাও। দুজনে একটা একটা করে দুটো সৈন্যকে বাড়ির বাইরে নিয়ে এল। অস্পষ্ট আলোয় দেখল রাস্তার পাশেই একটা জলা। দুজনে একটা সৈন্যকে হাতে আর পায়ে ধরে ঝুলিয়ে দুপাশে দোলাতে দোলাতে ছুঁড়ে জলায় ফেলে দিল। সমুদ্রে এই রীতিতেই মৃতদেহ ফেলা হয়। অন্যটিকেও সেই ভাবে ফেলল। অমাত্যের বাড়িতে এল। বাড়ির অন্দরমহলে তখন কান্নার রোল উঠেছে।

ফ্রান্সিস রাজা মুজার্তার কাছে এসে বলল—আমরা যাচ্ছি কাল সকালে রাজা জুবেদা তার সৈন্যদল নিয়ে আপনার রাজত্ব ছেড়ে চলে যাবে।

—আমার বিশ্বাস হচ্ছে না। রাজা বললেন।

—ঠিক আছে। সে সময় আপনাকে নিয়ে যাওয়া হবে। ফ্রান্সিস বলল।

—না-না।

পিরেল্লো এতক্ষণ একপাশে দাঁড়িয়ে ছিল। ফ্রান্সিস তাকে ডাকল।

ফ্রান্সিসরা অমাত্যর বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল। বন্ধুদের কাছে এসে অমাত্যের বাড়ির ঘটনাটা বলল। সবাই উৎসাহিত হল।

—রাতের খাবার একটু তাড়াতাড়িই খেয়ে নিতে হবে। বেশ কিছুক্ষণ শুয়ে বসে বিশ্রাম নিয়ে আমরা রাজবাড়ি আক্রমণ করবো। একটু অন্যরকম লড়াই হবে। ওরা লড়বে বর্শা দিয়ে আমরা লড়বো তরোয়াল দিয়ে। এরা জীবনে কখনো তরোয়াল দেখেনি। কাজেই ওই তরোয়াল দিয়ে কীভাবে লড়ে এসম্বন্ধে এদের কোনো ধারণাই নেই। ফ্রান্সিস বলল। হঠাৎ একটা চিন্তা ওর মাথায় এল। রাজা মুজার্তার তো সৈন্যদল নিশ্চয়ই আছে।

ফ্রান্সিস পিরেল্লোর দিকে তাকাল। বলল—পিরেল্লো—রাজা মুজার্তার তো সৈন্যবাহিনী ছিল। সেই সৈন্যরা এখন কোথায়? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—মা মেরিই জানে। কোথায় কোথায় লুকিয়ে আছে। বাইরে বেরোতে সাহস পাচ্ছে না। পিরেল্লো বলল।

—আপনি এক্ষুণি রাজা মুজার্তার কাছে যান। তিনিই হয়তো তাঁর সৈন্যদের খোঁজ দিতে পারবেন। ফ্রান্সিস বলল।

—মনে হয় না। রাজার এখন যা অবস্থা। আসলে রাজা মুজার্তার সৈন্যরা সংখ্যায় খুবই কম। রাজা তো যুদ্ধবিগ্রহের কথা ভাবতেনই না। পিরেল্লো বললেন।

—এটা ভুল। রাজত্ব রাখতে গেলে যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী সৈন্যবাহিনী রাখতে হয়। উনি নিজে যুদ্ধ চান না। ভালো কথা। কিন্তু অন্যদেশের শাসক যে কোন মুহূর্তে তাঁর রাজত্বের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। এজন্যে আগে থেকে তৈরি থাকা উচিত।

—আসলে রাজা মুজার্তা এত সব ভাবতেন না। পিরেল্লো বললেন।

—যাক গে। আপনি সৈন্যদের খোঁজ কী করে পাবেন তা জেনে আসুন। আমাদের খেতে বসার আগে আপনি চলে আসবেন। ফ্রান্সিস বললেন।

পিরেল্লো চলে গেলেন। ভাইকিংরা নিজেদের মধ্যে শুয়ে বসে গল্পটল্প করতে লাগল।

পিরেল্লো অমাত্যের বাড়িতে পৌঁছল। চাঁদের অস্পষ্ট আলোয় দেখল বাড়ির সামনে তিনচারজন যোদ্ধা। বোঝাই যাচ্ছে ওরা রাজা জুবেদার সৈন্য।

পিরেল্লো তাদের সামনে এলো। প্রধান দরজার দিকে চলল। যোদ্ধারা হাত তুলে পিরেল্লোকে আটকাল। পিরেল্লো বললেন—আমি রাজপুরোহিত। রাজা মুজার্তার সঙ্গে দেখা করব। দরকারি কথা আছে। দলনেতা নাকেমুখে শব্দ করল—হুঁ। তারপর বলল,

—রাজা মুজার্তা আর কতক্ষণ বেঁচে থাকবে। কাল সকালেই ফাঁসি দেওয়া হবে বাজারের সামনে ফাঁসিকাঠে।

—ঠিক আছে। তার আগেই আমাকে কথাটা বলতে হবে। পিরেল্লো বললেন।

—এখন কী কথা? একজন সৈন্য বলল।

—আছে—আছে—আপনারা বুঝবেন না। পিরেল্লো বলল।

—বেশ যান। শুনে রাখুন আমাদের কোন ক্ষতি করার যদি চেষ্টা করেন—তাহলে আপনাকে মরতে হবে। সৈন্যটি বলল।

—ঠিক আছে। পিরেল্লো মাথা ঝাঁকিয়ে এগিয়ে চলল।

পিরেল্লো বাড়ির ভেতরে ঢুকলেন। রাজার কাছে এলেন। রাজা শুয়েছিলেন। পিরেল্লোকে দেখে উঠে বসলেন। ম্লানমুখে হেসে বললেন—পিরেল্লো শেষ রক্ষা হলো না।

—আপনি একেবারে দুশ্চিন্তা করবেন না। পিরেল্লো বললেন। তারপর গলা

নামিয়ে বললেন—ভাইকিংরা দুঃসাহসী, লড়াইয়ে অপরাজিত। দেখবেন আপনি কালকেই মুক্তি লাভ করবেন।

—দেখি। রাজা মৃদুস্বরে বললেন।

—মাননীয় রাজা, আপনার কাছে যেজন্য এসেছি সেটা বলি। তারপর পিরেল্লো ফিসফিস করে বলল—আপনার সৈন্যরা সব কোথায়?

—সবার কথা তো বলতে পারবো না—রাজা গলা নামিয়ে বললেন—ওরা বেশির ভাগই বনের মধ্যে আশ্রয় নিয়েছে।

—বনে কীভাবে আছে? পিরেল্লো বললেন।

—বনের মধ্যে আমার একটা সুতাকল আছে। বাড়িটা আমাদেরই তৈরি। বেশ বড় বাড়ি। সুতাকলের কর্মীরা থাকে। সেখানে আমার সৈন্যরা আশ্রয় নিয়েছে। রাজা বললেন।

—তাহলে ঐ সূতাকলের বাড়িতেই ওদের পাবো। পিরেল্লো বললেন।

—হ্যাঁ, কিন্তু ওদের কেন? রাজা জানতে চাইলেন।

—ওরা তো সৈন্য। লড়াই আরম্ভ হলে ওদের তো লড়তে হবে।

—ওরা কি পারবে লড়াইয়ে জিততে? রাজা বললেন।

—চেষ্টা তো করতে হবে। ভাইকিংরা আপনার কথা শুনেছে। ওরা আপনাকে খুব শ্রদ্ধা করে। ওরা মনেপ্রাণে আপনার মুক্তি চায়। পিরেল্লো বলল।

রাজা মুখে শব্দ করলেন—হুঁ। আর কোন কথা বললেন না।

পিরেল্লো বাড়ির বাইরে এলেন। চললেন বনের দিকে।

ফাঁকা প্রান্তরটায় তবু চাঁদের অস্পষ্ট আলো ছিল। এখানে একেবারে ঘুরঘুট্টি অন্ধকার। প্রায়ই গাছের মোটা শেকড়ে হোঁচট খেতে হচ্ছে। পিরেল্লো চলল। কিন্তু কোথায় সেই বাড়িটা? আবার কয়েক পাক দিয়ে পিরেল্লো খুঁজতে লাগল।

হঠাৎ দেখল একটু ফাঁকায় বেশ বড় জন্তুর মত একটা লম্বাটে ঘর। পিরেল্লো দ্রুত পায়ে এসে বাড়িটার দোরগোড়ায় দাঁড়ালেন। কাঠের দরজায় আঙুল ঠুকলো। ভেতরে কোন সাড়া নেই। আবার শব্দ করল। দরজা খুলে গেল। বর্শা তুলে এক সৈন্য দাঁড়িয়ে। পিরেল্লো দুহাত ওপরে তুলে বললেন—আমি বন্ধু, শত্রু নই। যোদ্ধাটি বর্শা নামাল। বলল—আপনাকে আমরা চিনি। আপনি রাজা আনকহনার দেশের রাজপুরোহিত।

—হ্যাঁ। এখন আর অন্য কথা নেই। শুধু লড়াইয়ের কথা। আরো কয়েকজন যোদ্ধা ততক্ষণে দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে।

পিরেল্লো বললেন—আপনারা লড়াইয়ে হেরে গেছেন। এখানে লুকিয়ে আছেন। কিন্তু এখন আপনাদের লুকিয়ে থাকা চলবে না। আবার লড়াই করতে হবে। এই লড়াইয়ে যোগ দেবে কিছু ভাইকিং যোদ্ধা। জয় আমাদের হবেই। আপনারা তৈরি হয়ে নিন। তারপর আমাদের সঙ্গে চলুন। একজন যোদ্ধা মৃদুস্বরে বলল—নিশ্চয়ই যাবো।

—আপনি বসুন। একজন যোদ্ধা বলল।

পিরেল্লো একটা বস্তার ওপর বসলেন। বস্তাভর্তি তেলের বীজ। যোদ্ধারা তৈরি হল। তারপর ঘরের দরজার দিকে চলল। একজনকে চারদিক দেখার জন্য পাহারায় রাখল।

সবাই দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল। যে এখানে পাহারায় রইল সে দরজা বন্ধ করল। পিরেল্লোরা আধো আলো আধো অন্ধকারে ভেজা ভেজা বনের মধ্যে দিয়ে চলল সবাই। আবছা আলোর মধ্যে দিয়ে সবাই চলল ফ্রান্সিসদের ডেরার দিকে।

ফ্রান্সিসদের ডেরায় যখন সবাই এল তখন ফ্রান্সিসদের খাওয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে। ফ্রান্সিস রাজা মুজার্তার সৈন্যদের কাছে এল। বলল—

—আপনাদের খাওয়া হয়েছে?

একজন সৈন্য বলল—না। আমাদের তো খেতে দেরি হয়।

—ঠিক আছে। আমরা সব খাবার ভাগ করে খাবো। ফ্রান্সিস বলল।

ফ্রান্সিস বিস্কো খেতে বসল না। খাবার পরিবেশন করতে লাগল। রুটি বুনো আলুর ঝোল শাকপাতা দেবার সময় ফ্রান্সিস বলল—কেউ দুবার চাইবেন না। রাজা মুজার্তার সৈন্যরা আমাদের সঙ্গে যাবে লড়াই করতে। তাদের জেন্যে তো রান্না হয়নি। কাজেই খাবার কম পড়ে গেছে। পেটপুরে খাওয়া হবে না। বেশি চাইবেন না। একটা কথা বলি—বেশি খেয়ে লড়াই করতে গেলে দ্রুত চলাফেরা করা যায় না। অল্প খাওয়ার জন্যে তোমাদের চলাফেরা দ্রুত হবে। তরোয়াল চালানো সহজ হবে। একদিক থেকে এই ভালো হল।

ভাইকিংরা খাওয়া শেষ করল। উঠে দাঁড়াল। এবার রাজা মুজার্তার সৈন্যরা খেতে বসল। তাদের সঙ্গে ফ্রান্সিস পিরেল্লোকে বসিয়ে দিল।

খাওয়া চলল। বিস্কো ফ্রান্সিসের কাছে এল। গলা নামিয়ে বললেন—ফ্রান্সিস আমাদের দুজনের মত খাবার অল্প পড়ে আছে। কী করবে?

—এরা চাইলে দিয়ে দাও। ফ্রান্সিস বলল।

—তার মানে—বিস্কো বলতে গেল।

—হ্যাঁ। উপবাস। ফ্রাসিস বলল।

সবার খাওয়া হল। ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে বলল—

—বলে লাভ নেই। তবু বলছি কেউ ঘুমিয়ে পড়বে না। রাজা মুজার্তার সৈন্যদেরও বলছি কথাটা। সময় হলেই আমি ডাকবো।

ভাইকিংরা, সৈন্যরা শুয়ে বসে সময় কাটাতে লাগল।

ফ্রান্সিস আর বিস্কো পাশাপাশি বসেছিল। বিস্কো বলল—ফ্রান্সিস। আমাদের বন্ধুরা রাজা জুদেবার সৈন্যদের কীভাবে চিনবে?

—পোশাক দেখে আর গায়ের বাদামী রং দেখে। ফ্রান্সিস বলল।

—সেটা বন্ধুদের বলে দাও। বিস্কো বলল।

—তুমিই বলো। আমি একটু বিশ্রাম করবো। ফ্রান্সিস বললো।

বিস্কো উঠে দাঁড়াল। গলা চড়িয়ে বলল—ভাইসব আমরা রাজা জুবেদার সৈন্যদের সঙ্গে লড়াই করতে যাচ্ছি। সেই সৈন্যদের পরনে থাকবে জামার রঙ হলুদ আর চোঙের মতো প্যান্টের রঙ কালো। এটা আমি জেনেছি রাজপুরোহিত পিরেল্লোর কাছ থেকে। তাদের গায়ের রং তামাটে। এসব দেখেই ওদের চিনবে। এসময় পিরেল্লো উঠে দাঁড়াল। বলল—শাঙ্কো যা বলল সেটা রাজা জুবেদার সৈন্যদের পোশাক সম্বন্ধে। তোমরা অবশ্য সহজেই চিনবে।

ভাইকিংরা রাজা মুজার্তার সৈন্যরা কেউ কেউ শুয়ে পড়ল। কেউ বসে রইল। তারা নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলছে।

ফ্রান্সিস শুয়ে শুয়ে আক্রমণের নকশা ঠিক করছিল ও ভাবছিল—সদর দেউরি দিয়ে একদল ভাইকিং আর সৈন্যরা ঢুকবে। রাজবাড়ির পেছনে বিস্কো খিড়কির দরজা দিয়ে ভাইকিং, সৈন্যদের দিয়ে আক্রমণ করবে। যতক্ষণ রাজা জুবেদার সৈন্যরা হার স্বীকার না করবে ততক্ষণ লড়াই চলবে। ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়াল। গলা চড়িয়ে বলতে লাগল—ভাইসব—আমার পরিকল্পনা শোন। একদল সদর দেউড়ির সৈন্যদের আক্রমণ করবে। অন্য দল রাজবাড়ির পেছনের খিড়কি দরজার প্রহরীদের আক্রমণ করবে। একসঙ্গে। দু'জায়গাতেই লড়াই হবে। রাজা জুবেদার সৈন্যরা পরাজয় স্বীকার করবে। ওরা হেরে যাবে এটা ঠিক। একটু থেমে ফ্রান্সিস বলল—কিন্তু আসল লড়াই হবে এরপরে। ওরা রাজা মুজার্তার সৈন্যাবাস দখল করেছে। সেখানে রাজবাড়ি আক্রান্ত এই খবর ওদের দেওয়া হবে। তখন ওরা ছুটে আসবে। ঐ প্রান্তরে গিয়ে দাঁড়াব আমরা। ওখানেই ওদের সঙ্গে আমাদের লড়াই হবে। শেষ লড়াই। তোমরা সেই আক্রমণের মোকাবিলার জন্য তৈরি থাকো। একটু থেমে বলল—রাজবাড়ির পাহারাদাররা হয় মরেছে, আহত হয়েছে নয়তো পালিয়েছে। এখন রাজা বন্দী, রাজবাড়িও আমার কব্জায়। শেষ লড়াই। তোমরা তৈরি হও।

সূর্য উঠল। পূবের আকাশ লাল হয়ে গেছে। এখন সবই স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। চারদিক আলোয় আলোময়।

জুদেবার সৈন্যরা ছুটে আসছে। ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে বলল—আক্রমণ করো। ওদের একমাত্র অস্ত্র বর্শা। যে করেই হোক সেই অস্ত্র ওদের হাত থেকে ছাড়াতে হবে। তাহলেই ওরা নিরস্ত্র হয়ে পড়বে। খালি হাতে ওরা কী লড়াই করবে। অস্ত্র কাড়ো।

ফ্রান্সিসরা প্রান্তরে উঠে এল। সার বেঁধে দাঁড়াল।

জুদেবার সৈন্যরা ফ্রান্সিসদের ওপর বর্শা ছুঁড়ে মারল। ফ্রান্সিসরা বিদ্যুৎগতিতে সরে সরে গেল। বর্শাগুলো মাটিতে পড়ে রইল। অবশ্য দুজন-একজন ভাইকিং অন্যটি রাজা মুজার্তার সৈন্য আহত হল। ফ্রান্সিসরা কয়েকজন আহত যুবককে কাঁধে ঝুলিয়ে নিয়ে রাজবাড়িতে এক একটা ঘরে মেঝেয় শুইয়ে দিল।

ওদিকে প্রান্তরে লড়াই চলছে। জুবেদার সৈন্যরা বর্শা ছুঁড়তে লাগল। বর্শা হাতছাড়া হতেই তারা অস্ত্রহীন দাঁড়িয়ে পড়ল। ভাইকিংরা তাদের তরোয়াল চালিয়ে আহত করতে লাগল। জুদেবার সৈন্যরা কখনও তরোয়ালের সঙ্গে লড়াই করে নি। ওরা হকচকিয়ে গেল। কীভাবে লড়বে তা বুঝে উঠতে পারল না।

লড়াই চলল। রাজা জুদেবার সৈন্যরা বিদ্যুৎগতিতে তরোয়ালের মার রুখতে পারল না। দলে দলে হার স্বীকার করতে লাগল।

বিকেলের দিকে জুদেবার সব সৈন্য হার স্বীকার করল। ওদের দড়িতে হাত বেঁধে রাজবাড়িতে নিয়ে আসা হল।

রাজা জুদেবা শয়নকক্ষে পালঙ্কের ওপর বসে রইলেন। পরাজিত অসহায় রাজা জুদেবা পিরেল্লোকে নিয়ে ফ্রান্সিস শয়নকক্ষে এল। পিরেল্লো বলল—লড়াইয়ের খবর জানেন তো?

—আন্দাজ করতে পারছি। আমার সৈন্যরা পরাজিত। জুদেবা বললেন।

—হ্যাঁ। বেশ কিছু সৈন্যকে বন্দী করা হয়েছে। ফ্রান্সিস বলল—এই রাজবাড়ির দেউড়িতে প্রহরীরা পেছনের খিড়কি দুয়ারের প্রহরীরা সবাই হেরে গেছে। ফ্রান্সিস বলল।

—তাহলে আমাকে তো—রাজা জুদেবা বলতে গেল।

—এই রাজ্য থেকে বিদায় সঙ্গে আপনার সৈন্যদেরও বিদায় নিতে হবে। আর একটা কথা—আপনাকে মুক্তির একটা শর্ত আছে। আপনি ভবিষ্যতে কোনদিন এই রাজ্য আক্রমণ করবেন না।

—বেশ। বেশ ভারি গলায় রাজা জুদেবা বলল।

—আপনাদের একটু পরেই রওনা হতে হবে। ফ্রান্সিস বলল।

—না—না। অন্ধকারে খুব অসুবিধে হবে। রাজা বলল।

—না। আপনাকে একটু পরেই যেতে হবে। ফ্রান্সিস বলল।

—আমরা রাতের খাবার খেয়ে—রাজা বলতে গেল।

—না। আপনাকে খেতে দেওয়া হবে না। ফ্রান্সিস বলল।

—উপবাস?

—হ্যাঁ। পিরেল্লোর কাছে শুনেছি—আপনী নাকি নিরীহ প্রজাদের উপোসী রেখে তাদের তিলে তিলে মৃত্যু দেখতে ভালোবাসেন। একটু থেমে ফ্রান্সিস বলল—বলুন—ঠিক কি না।

—না—মানে—অপরাধ করলে—রাজারা বলতে গেল—

—না। নির্দোষকেও হত্যা করে থাকেন। ফ্রান্সিস বলল। রাজা জুদেবা কোন কথা বলল না। তারপর বলল—

—দুটো মশাল যদি—

—না। অন্ধকারে হেঁটে যেতে হবে। ফ্রান্সিস বলল—হ্যাঁ শুনেছি আপনী নিরীহ প্রজাদের অন্ধকার রাতে বনের মধ্যে জোর করে ঢুকিয়ে দেন। অন্ধকারে

বনের মধ্যে গাছের গুঁড়িতে ধাক্কা খেয়ে অনেকেই মারা যেত। তাছাড়া বন্য পশুদের আক্রমণ বা সাপের ছোবলে তারা মারা যেত। বলুন—ঠিক কি না।

রাজা জুদেবা চুপ করে রইল। হয়তো বিনা অপরাধে প্রজাদের উপর যে অত্যাচার করেছে তার কথাই ভাবল।

রাতের খাওয়া শেষ হল। বিস্কো ফ্রান্সিসের কাছে এল। বলল—ফ্রান্সিস এবার রাজা জুদেবা আর তার সৈন্যদের নিয়ে কী করবে?

—রাজা জুদেবা রাতে অন্ধকারে বনের মধ্যে দিয়ে ফিরে যেতে হবে। সৈন্যরাও রাজার সঙ্গেই যাবে। ফ্রান্সিস বলল।

—কিন্তু সৈন্যদের কী দোষ? ওরা তো রাজার হুকুম তামিল করেছে। বিস্কো বলল।

—বেশ ওদের হাতের দড়ি কেটে দাও। ফ্রান্সিস বলল।

—সেটাই এখন করি তাহলে। বিস্কো বলল।

—হ্যাঁ। যাও। ফ্রান্সিস বলল।

বিস্কো রাজা জুদেবার সৈন্যদের হাতে বাঁধা দড়ি কেটে দিল। তারপর প্রান্তরে নিয়ে এল। হাতের বাঁধন কাটা হয়েছে। ওরা এতেই খুশি। ওরা অন্ধকারে হেঁটে চলল। রাজা জুদেবাকে প্রান্তরে নিয়ে আসা হল। ফ্রান্সিস অন্ধকারে রাজার কাছে এসে বলল—নিন—পথে খাবেন। এই বলে দুটো আপেল রাজাকে দিল। রাজা নিল। তারপর তার দেশের দিকে পা বাড়াল।

রাজা জুদেবাকে সামনে রেখে তার সৈন্যরা চলল। ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে বলল—ঐ বনের মধ্যে দিয়ে রাজাকে নিয়ে যেতে হবে।

—কিন্তু রাজা কি পারবেন? এই অন্ধকারে যেতে হবে। রাজা জুদেবার একজন সৈন্য বলল।

—তোমাদের রাজা নিরপরাধ প্রজাদের এইভাবে শাস্তি দিত। নিরপরাধ মানুষগুলোকে কী কষ্টে এই বনভূমি পার হতে হতো আজ তোমাদের রাজা সেই কষ্টটা ভোগ করুক। বুঝুক কষ্ট কাকে বলে। তোমাদের রাজাকে আমি রাতের খাওয়াও খেতে দিই নি। ফ্রান্সিস বলল। ফ্রান্সিস প্রান্তরে কিছুদুর পর্যন্ত রাজা জুদেবা আর তার পরাজিত সৈন্যদের সঙ্গে চলল বনের দিকে। বনের কাছাকাছি এসে ফ্রান্সিস দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর ফিরে চলল রাজবাড়ির দিকে। ওখানেই বন্ধুরা আছে।

ফ্রান্সিস রাজবাড়িতে ফিরে এল। দেখল বন্ধুরা সব ছড়িয়ে টড়িয়ে শুয়ে আছে। মোমবাতির আলোয় যা দেখল তাতে বুঝল কিছু ভাইকিং গৃহকর্তা ভদ্রলোকের বাড়িতে চলে গেছে।

ফ্রান্সিস রাজা মুর্তাজার শয়নকক্ষে এল। রাজার জাজিম বিছানো বিছানায় বন্ধুরা শুয়ে আছে। বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছে। বিস্কো বলে উঠল—এসো তোমার জন্যে জায়গা রেখেছি। ফ্রান্সিস বিস্কোর পাশে শুয়ে পড়ল। ভীষণ ক্লান্ত মনে

হচ্ছে নিজেকে। বিস্কোর সঙ্গেও কথা বলতে ইচ্ছে করল না। অল্পক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ল।

ফ্রান্সিস সাধারণত ভোরেই ওঠে। সেদিন পারল না। উঠতে একটু বেলাই হল। উঠে দেখল রাজপুরোহিত পিরেল্লো ওর পাশেই বসে আছেন। ফ্রান্সিস উঠে বসল। তারপর ভেতরের ঘরে এসে হাতমুখ ধুল। দুহাত তুলে হাই তুলল। পিরেল্লোর কাছে এল। বলল—

—কিছু বলবেন? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—হ্যাঁ। তারপর গলা নামিয়ে বলল—দেবতার মূর্তিগুলো বোঁচকায়—ফেরৎ দিন।

—উঁহু। রাজা কানবহনাকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। ফ্রান্সিস বলল।

—আমার সমস্ত পরিকল্পনাই মাঠে মারা গেল। পিরেল্লো বলল।

—হ্যাঁ—চোরাই মাল হাতছাড়া হয়ে গেল। ফ্রান্সিস বলল।

বিস্কো খাবার নিয়ে এল। তিনজনের জন্যেই আনল। বুনো আলু আর সব্জিপাতার ঝোল। সঙ্গে দুটো করে রুটি। তিনজনে খেতে লাগল।

—এখন কী করবে? বিস্কো বলল।

—সেকথাই ভাবছি কাল রাত থেকে। রাজা হানমের গুপ্তধনের কথা জেনেছি। কাজেই ঐ গুপ্তধন উদ্ধার করতে হবে। ফ্রান্সিস বলল।

—কী করে করবে? পিরেল্লো জানতে চাইল।

—আগে তো রাজা হানমের মন্দিরে যাই। সব দেখিটেখি। ফ্রান্সিস বলল।

—তাহলে সোনার মূর্তিগুলো ফেরৎ পাবো না? পিরেল্লো বলল।

—না। ফ্রান্সিস বলল।

—আমি—গুপ্তধন খোঁজার ব্যাপারে আপনাদের সাহায্য করতে পারতাম। পিরেল্লো বলল।

ফ্রান্সিস হাসল। বলল—আপনি যদি ঐ ধনভাণ্ডারের খোঁজ জানেন তবে উদ্ধার করলেন না কেন?

—চেষ্টা করেছি। নানাভাবে। গুপ্তধন পাইনি। আরো চেষ্টা করলে পেয়ে যাবে হয়তো। পিরেল্লো বলল।

—তাহলে সেই চেষ্টাই করুন। আমরা চলে যাই। বিস্কো বলল।

—না না। এটা রাজা কানবহনা শুনলে আমি বিপদে পড়ে যাবো। পিরেল্লো বলল।

—তাহলে আর কথা না। গৃহকর্তার বাড়িতে যান। গৃহকর্তাকে দিয়ে তিনটে শস্যটানা গাড়ির ব্যবস্থা করুন। ফ্রান্সিস বলল।

ঠিক আছে যাচ্ছি। পিরেল্লো বলে গেলেন।

রাজা মুজার্তা রাণী ও পুত্রকে নিয়ে বিকেলে এলেন। শয়নকক্ষে ফ্রান্সিসদের দেখলেন। রানী ছেলেকে নিয়ে অন্তঃপুরে চলে গেলেন। পরিচারক পরিচারিকারা ফিরে এল। রাজবাড়িতেও সমস্ত দেশে আনন্দ উৎসব শুরু হল।

রাজা এগিয়ে এসে ফ্রান্সিসের ডানহাতটা ধরলেন। বললেন—আপনার কাছে আমি কৃতজ্ঞ রইলাম। আপনাদের জন্যেই আমি সব ফিরে পেলাম। ফ্রান্সিস বলল—আপনি আপনার সব ফিরে পেয়েছেন এতেই আমি আনন্দিত।

—আপনারা কি আজকেই চলে যাবেন? রাজা জিজ্ঞেস করলেন।

—হ্যাঁ। বন্ধুরা জাহাজে চলে যাবে। আমরা কয়েকজন রাজা কানবহনার রাজধানীতে থাকবো কিছুদিন।

—আপনারা কয়েকজন থাকবেন কেন? রাজা জানতে চাইলেন।

ফ্রান্সিস একটু থেমে বলল—অতীতের রাজা হানমের গুপ্তধনের কথা তো শুনেছেন।

—হ্যাঁ। শুনেছি। রাজা বললেন।

—সেই গুপ্তভাণ্ডার আমরা উদ্ধার করবো। ফ্রান্সিস বলল।

—পারবেন? রাজা একটু হতাশার সঙ্গেই বললেন।

—নিশ্চয়ই পারবো। ফ্রান্সিস জোর দিয়ে বলল।

ফ্রান্সিসরা খেতে বসেছে তখনই পিরেল্লো দুটো ঘোড়ায় টানা গাড়ি নিয়ে এল। গাড়ি রেখে পিরেল্লো রাজবাড়িতে ঢুকল। খাওয়ার ঘরে ঢুকে দেখল ফ্রান্সিসরা খেতে বসেছে। ফ্রান্সিস গলা তুলে বলল—পিরেল্লো আপনি আসুন এখানে আপনার জন্যে জায়গা রেখেছি। পিরেল্লো এসে বিস্কোর পাশে বসল।

—ক'টা গাড়ি পেলেন? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—দুটো। তবে ঐ গৃহকর্তা বলেছেন আর একটা গাড়ি তিনি এনে রাখবেন। পিরেল্লো বললেন।

—তাহলে কোন সমস্যাই নেই। ফ্রান্সিস বলল।

ফ্রান্সিসদের খাওয়া শেষ হল।

ফ্রান্সিস আর বিস্কো রাজবাড়ির বাইরে এল। দেখল ভাইকিং বন্ধুরা রাজবাড়ির বাইরের প্রান্তরটায় সবাই বসে আছে।

ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে বলতে লাগল—ভাইসব যে কাজের জন্যে আমাদের এখানে আসতে হয়েছিল সেই কাজ বলা যায় সুসম্পন্ন হয়েছে। এখন জাহাজে ফেরা। তোমরা গিয়ে জাহাজে উঠবে কিন্তু আমি আর বিস্কো যাবো না। এরপরেই রাজা কানবহনার রাজ্য। সেখানে রাজা হানমের গুপ্তধন খুঁজে বের করতে হবে। এই কাজ সেরে আমরা জাহাজে ফিরবো। ভাইকিং বন্ধুরা চুপ করে ফ্রান্সিসদের কথা শুনল। একটু থেমে ফ্রান্সিস বলল—গাড়ি এসে গেছে। আমরা এক্ষুনি যাত্রা শুরু করবো। তবে আমাদের তিনটি গাড়ি পেলে ভালো হত। যে বাড়িতে আমরা ছিলাম তার কর্তা আর একটা গাড়ির ব্যবস্থা করবেন জানিয়েছেন। যাওয়ার পথে গাড়ি পেলেই আমাদের ঠাসাঠাসি করে আর যেতে হবে না। একটু থেমে ফ্রান্সিস বলল—তাহলে এবার যাত্রা শুরু।

সব ভাইকিংরা গাড়ি দুটোয় উঠল। সবার জায়গা হল না। ওরই মধ্যে

চাপাচাপি করে ভাইকিং বন্ধুরা জায়গা করে নিল। পিরেল্লোও ফ্রান্সিসের পাশে জায়গা করে নিল।

গাড়োয়ানের দিকে তাকিয়ে ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে বলল—এবার চলো।

গাড়ি চলল। ভাইকিংরা ধ্বনি তুলল—ও—হো—হো। কাঠের চাকায় ক্যাঁচ কোঁচ শব্দ তুলে গাড়ি দুটো চলল।

গাড়ি বেশ আস্তে আস্তে চলল। দু-একজন ভাইকিং বন্ধু গলা তুলে বলল—ও ভাই গাড়োয়ান—একটু তাড়াতাড়ি চালাও। একটু তাড়াতাড়ি চলেই আবার টিকির টিকির চলল।

প্রায় সন্ধ্যের মুখে ফ্রান্সিসরা সেই গৃহকর্তার বাড়ির সামনে এল। দেখল একটা শস্যটানা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। ভাইকিংরা ধ্বনি তুলল—ও—হো—হো।

গৃহকর্তা বেরিয়ে এল। ফ্রান্সিসের কাছে এসে বলল—

—আপনাদের জন্য গাড়ি আনিয়ে রেখেছি।

—অনেক ধন্যবাদ। ফ্রান্সিস হেসে বলল।

বিস্কো ডাকল—ফ্রান্সিস।

—কী বলছো? ফ্রান্সিস ওর দিকে তাকাল।

—বলছিলাম এখন সামনে রাত। কোথায় থাকবো, খাবো। বরং এখানেই আমরা আশ্রয় নিই। থাকা-খাওয়া দুটোই জুটবে। কাল ভোরে বেরিয়ে পড়বো। বিস্কো বলল।

ফ্রান্সিস গৃহকর্তাকে বলল—এই রাতে গেলে রাতের খাওয়াদাওয়ার সমস্যায় পড়বো। আপনি যদি আমাদের—মানে এই রাতটা—

—অবশ্যই। আসুন—আসুন। গৃহকর্তা বলল।

রাতে ঐ বাড়িতেই ভাইকিংরা থাকল-খেল। গাড়ির ঝাঁকুনিতে সবাই কমবেশি গা হাত কোমরের ব্যথায় কাহিল হয়ে পড়ল।

হাত পায়ে ব্যথা নিয়েই রাত কাটাল ভাইকিংরা।

ভোর হল। ফ্রান্সিসের ঘুম ভাঙল। বন্ধুরা মুখটুখ ধুচ্ছে। নিজেও মুখ ধুয়ে এল। একটু পরেই সকালের খাবার দেওয়া হল। বাসি মোটা রুটি আর তরিতরকারী। খেতে খেতে বিস্কো বলল—

—ফ্রান্সিস এখন কী করবে?

—আমরা দুজন বাদে তোমরা সবাই জাহাজে ফিরে যাবে। ফ্রান্সিস বলল।

—রাজা হানমের গুপ্তধন খুঁজবে? বিস্কো বলল।

—নিশ্চয়ই। ফ্রান্সিস বলল।

এবার কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে শাঙ্কো বলল—ফ্রান্সিস যদি কিছু না মনে কর তবে একটা কথা বলি।

—বলো। ফ্রান্সিস বলল।

—আমি ভাবছি—মানে শরীরটা ভালো যাচ্ছে না। এটা তো সবাইকে বলা

যায় না। আমি জাহাজেই থাকবো। কয়েকটা দিন বিশ্রাম নেবো। ফ্রান্সিস কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর বলল—তুমি কি দেশে ফিরে যেতে চাও? শাঙ্কো চমকে গিয়ে বলল—না, না ফ্রান্সিস। তোমার সঙ্গ আমি কোনমতেই ছাড়বো না। একটু থেমে বলল—আমি জাহাজে যাবো না।

—না তোমার বিশ্রাম চাই। আমি বিস্কোকে নেব। ফ্রান্সিস বলল।

—বেশ। কয়েকদিন বিশ্রাম না নিলে আমি পারবো না। শাঙ্কো বলল।

—ঠিক আছে। তুমি বিস্কোকে ডেকে দাও। ফ্রান্সিস বলল।

একটু পরে শাঙ্কো বিস্কোকে নিয়ে এল। ফ্রান্সিস শাঙ্কোর শরীর খারাপের কথা বলল। এটাই বলল—শাঙ্কো বিশ্রাম নেবে। তুমি আমার সঙ্গে থাকবে।

—ঠিক আছে। তবে শাঙ্কোর ছোরা ছোঁড়ার হাত আমার নেই। ও নিঁখুত।

কয়েকজন ভাইকিং বন্ধু এল ফ্রান্সিসের কাছে। বলল—দুপুরের খাওয়াটা খেয়ে বিকেল নাগাদ রওনা দিতে চাই। ফ্রান্সিস মাথা এপাশ ওপাশ করল। বলল—না। এখনই রওনা দেব।

—দুপুরে কোথায় খাব? একজন ভাইকিং বন্ধু বলল।

—যদি খাবারের ব্যবস্থা না করতে পারি তবে খাব না। ফ্রান্সিস বলল।

—রাতও তো হয়ে যাবে। একজন ভাইকিং বলল।

—হ্যাঁ তা তো হবেই। আমরা রাতেই গাড়ি চালাবো।

এবার যাওয়ার তোড়জোড় চলল। অল্পক্ষণের মধ্যেই ভাইকিংরা গিয়ে গাড়িতে চড়ল। ফ্রান্সিস এ বাড়ির কর্তা ভদ্রলোককে কাছে আসতে বলল। ভদ্রলোক এগিয়ে এলেন। ফ্রান্সিস তার দু'হাত নিজের দু'হাতে জড়িয়ে ধরলো। বলল—আপনি আপনার স্ত্রী মেয়েকে আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাবেন।

গাড়ি ভাইকিংদের নিয়ে চলল। ঝাঁকুনিও চলল। আজকে আর আগের দিনের মত কষ্ট হচ্ছে না। পাথরের টুকরো পাতা মাটির পথ। বোধহয় সেইজন্যেই।

অন্ধকার। কোনদিকে কোথাও আলোর চিহ্নমাত্র নেই।

হঠাৎ একটা মোড়ে কিছু মোমবাতির আলো দেখা গেল। কিছু দোকানপাট। ভাগ্যি বলতে হবে একটা সরাইখানাও পাওয়া গেল।

ফ্রান্সিস বিস্কোকে নিয়ে গাড়ি থেকে নামল। দুজনে সরাইখানায় ঢুকলো। কয়েকটা টানা টেবিল মতো। তার ওপর জ্বলন্ত মোমবাতি রাখা। সরাইখানার মালিক এগিয়ে এল। কৃতার্থের হাসি হেসে বলল—আপনারা খাবেন?

ফ্রান্সিস মোটামুটি বুঝল। মাথা ঝাঁকাল। তারপর মালিককে বাইরে নিয়ে এল। গাড়ি দেখিয়ে বলল—আমরা সবাই খাবো। মালিক ভাইকিংদের অন্ধকারে যতটুকু দেখল বুঝল এত লোকের খাবার তার নেই। সে বলল সে কথা। ফ্রান্সিস বিস্কোকে বলল—যাও শাঙ্কোর কাছ থেকে দুটো সোনার চাকতি নিয়ে এসো। বিস্কো চলে গেল। অল্পক্ষণের মধ্যেই সোনার চাকতি নিয়ে এল। দুটো চাকতিই মালিককে দিল। বলল—রান্না চড়ান। বুনো মুরগী কিনে আনুন। বুনো মুরগীর

ঝোল আলু দিয়ে আর রুটি। কী? পারবেন তো? মালিক হাসল। বলল পারবো।

দোকানের মালিক তার দুই রাঁধুনিকে নিয়ে রান্নার আয়োজন করতে লাগল। গাড়ি থেকে কিছু ভাইকিং বন্ধু নেমে এল। দোকানে ঢুকল। লম্বা টুলে হাত পা ছড়িয়ে বসল। গল্পগুজব চলল। এক বন্ধু ডাকল—ফ্রান্সিস?

ফ্রান্সিস তার দিকে তাকাল। ভাইকিং বন্ধুটি বলল—মনে হয় কাল সকালের আগে খেতে পাবো না।

—কী যে বলো। এদের পেশাই হল রান্না করা, পরিবেশন করা। ঠিক পারবে। দেখো। ফ্রান্সিস বলল।

সময় তো কাটাতে হবে। ভাইকিংরা কয়েকজন দল বেঁধে রাস্তার ওপর দাঁড়াল। হাততালি শুরু হল তারপর সেইসঙ্গে নাচ। ইয়া মোটা এক বন্ধু গান ধরল। দেশের গান। কয়েকজন ভাইকিং ওকে থামিয়ে দিল। বলল—অন্য গান গা। দেশের গান শুনলে ভীষণ মনখারাপ করবে। মোটা গায়ক তাই সরু নাকি গলায় অন্য গান ধরল। গান আর হাততালির সঙ্গে নাচও চলল।

একসময় রান্না শেষ হল। সবাই দুড়্দাড়্ ছুটে এল। লম্বা টুলে সবাই বসতে পারল না। মালিক আর একটা লম্বা টুল এনে দিল। তাতেও কুলোল না। ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে বলল—দু'তিনটে করে পাতা নাও। তারপর মাংসের ঝোল আটকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খাও। ফ্রান্সিস আর কয়েকজন ভাইকিং দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খেতে লাগল।

ফ্রান্সিস যা আশঙ্কা করছিল তাই হল। মাংসের ঝোলে টান পড়ল। মালিক ফ্রান্সিসের কাছে এল। মুখ কাঁচুমাঁচু করে বলল—মাংস তো শেষ। কী করি?

—কী আর করবেন। একটা দুটো মুরগী কাটতেই পারতেন।

—আর মুরগী ছিল না। সরাইওয়ালা বলল।

—হুঁ। ফ্রান্সিস একটু গলা চড়িয়ে বলল—ভাইসব—মাংস কম পড়ে গেছে। শুধু রুটি খাও। একটু গুঞ্জন উঠল। কিন্তু কেউ কিছু বলল না। গাড়োয়ান তিনজনকেও ফ্রান্সিস খেতে ডাকল।

আবার গাড়ি চলল অন্ধকারে।

ফ্রান্সিস আকাশের দিকে তাকাল। আকাশ সাদাটে হয়েছে। পূবদিকে আকাশ লালচে হয়েছে।

একটু পরেই সূর্য উঠল।

ভোর ভোর সময়ে ওরা কানবহনার রাজ্যে পৌঁছল।

ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে বলল—গাড়ি থামাও। তিনটে গাড়িই থামল।

ফ্রান্সিস বিস্কো আর পিরেল্লোকে নিয়ে গাড়ি থেকে নামল। গলা চড়িয়ে বলল—ভাইসব জাহাজে উঠে রাজকুমারীকে বলো যে আমি দিনকয়েকের মধ্যেই ফিরবো। আমার জন্যে যেন দুশ্চিন্তা না করে।

—ঠিক আছে। তুমি তাড়াতাড়ি কাজ সার। শাঙ্কো বলল। তারপর ওর

বোঁচকাটা বিস্কোকে দিল। বলল—এই বোঁচকায় চোরাই মাল আছে। বেশ দামি। সাবধানে রাখবে। ফ্রান্সিস তোমায় সবকিছু বলবে।

শাঙ্কোদের গাড়ি চলে গেল।

ফ্রান্সিসরা ওদের ঘরের সামনে এল। ঘর তালাবন্ধ। ফ্রান্সিস পিরেল্লোর দিকে তাকাল। বলল—সেনাপতি মশাইকে একটু খবর পাঠাতে হয় যে আমরা এসেছি। ঘরের চাবিটাও তো আনতে হয়।

—যাচ্ছি। পিরেল্লো চলে গেল।

কিছু পরে একজন সৈন্যকে নিয়ে ফিরলেন। সৈন্যটি বলল—আপনারা যেন কাল রাজদরবারে যান। আপনাদের সঙ্গে সেনাপতি কথা বলবেন।

সৈন্যটি ঘরের দরজাটা খুলল। ফ্রান্সিসের দিকে চাবিটা বাড়িয়ে ধরল। ফ্রান্সিস চাবিটা নিল।

তিনজনে ঘরে ঢুকল: ঘরে পাতা ঘাসের বিছানায় শুয়ে পড়ল। বিস্কোও বোঁচকাটা মেঝেয় রাখল।

পিরেল্লো বলল—ফ্রান্সিস বোঁচকাটা এবার আমাকে দিন।

—না। ফ্রান্সিস মাথা নাড়লেন। রাজা কানবহনাকে দিয়ে দেব।

—পেলেন কোথায় জিজ্ঞেস করলে আপনি কী বলবেন? পিরেল্লো বলল।

আপনার কথা বলবো। ফ্রান্সিস বলল।

—আমি দেবমূর্তি চুরি করেছি জানলে আমার ফাঁসি হয়ে যাবে। পিরেল্লো বলল।

—ঠিক আছে। দেখি কী করা যায়। ফ্রান্সিস বলল।

—আপনি এখন কী করবেন? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—বাড়ি যাবো। কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেবো। আমার কাজের বৌটিকে ডাকবো। কিছু খাবো। তারপর রাজসভায় যাবো।

—সেখানেই দেখা হবে। ফ্রান্সিস বলল।

পিরেল্লো চলে গেলেন।

ফ্রান্সিসরাও কিছু খেয়ে নিল। তারপর রাজবাড়ির দিকে চলল।

রাজসভায় বেশ ভিড়। বিচার চলছে। ফ্রান্সিসরা গিয়ে দাঁড়াল। সেনাপতিও একপাশে বসে আছে। সেনাপতি রাজার অনুমতি নিয়ে আসন থেকে নেমে এল। ফ্রান্সিসদের কাছে এসে বলল—আপনাদের কী ব্যাপার? কোথায় গিয়েছিলেন?

—রাজা মুর্জাতার দেশে। ফ্রান্সিস বলল।

—কেন? সেনাপতি জানতে চাইল।

—কী আর বলবো। আমাদের মিথ্যে বলে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। বিস্কো বলল।

—সে আবার কী? সেনাপতি বলল।

—সব পরে বলবো। এখন আমারা রাজা হানমের গুপ্তধন উদ্ধার করতে কাজ শুরু করবো। রাজার কাছে সেই ব্যাপারে অনুমতি নিতে এসেছি। ফ্রান্সিস বলল।

সেনাপতি রাজার কাছে এল। কী বলল রাজাকে। রাজা কী বললেন। সেনাপতি ফ্রান্সিসদের ডাকল। ফ্রান্সিসরা এগিয়ে গেল। রাজা ফ্রান্সিসকে চিনলেন। বললেন—

—শুনুন। আপনাদের সবরকম সাহায্য দেওয়া হবে। আপনারা কাজ শুরু করুন।

হঠাৎ ফ্রান্সিস শুনল পেছন থেকে রাজপুরোহিত পিরেল্লো গলা চড়িয়ে বলে উঠল—মান্যবর রাজা এই দুই বিদেশী মন্দিরের শায়িত সাত দেবমূর্তি চুরি করেছে।

—মিথ্যে কথা। বিস্কো গলা চড়িয়ে বলল। ফ্রান্সিসের কাছে এরমধ্যে বিস্কো সবই শুনেছিল।

—আমার কথা বিশ্বাস না হয়—মাননীয় সেনাপতিকে পাঠান। উনি নিজের চোখে সব দেখবেন। এরা চোর। পিরেল্লো বললেন।

রাজা ক্রুদ্ধ চোখে ফ্রান্সিসদের দিকে তাকালেন। বললেন—তোমরা মূর্তি চুরি করেছো?

ফ্রান্সিস এরকমভাবে একটা সমস্যায় জড়িয়ে যাবে এটা আগে ভাবে নি। একটা বোকার মত কাজ করেছে ও। মনে জোর আনল। বলল—মহামান্য রাজা আমরা এখনও জানি না সাত দেবতাদের মন্দির কোথায়? মূর্তি দেখা তো দূরস্থান, চুরিটুরির কথা তো ওঠেই না।

—দেখা যাক। রাজা সেনাপতিকে ডাকলেন। সেনাপতি কাছে এল।

রাজা বললেন—মূর্তি চুরির খবর আপনি কবে পেয়েছেন?

—দিন সাতেক আগে। সেনাপতি বলল।

—ঠিক আছে। আপনি যান। রাজা বললেন। তারপর পিরেল্লোকে বললেন—আপনি যান। দেবমূর্তিগুলো যথাস্থানে রাখবেন।

—আমার একটা কথা ছিল। ফ্রান্সিস বলল।

—কী কথা?

—দিন ছয় সাতেক আগে—এক গভীর রাতে এই রাজপুরোহিত পিরেল্লো আমাদের জাহাজে এসেছিলেন। তিনি বললেন—আমি সোনার দেবমূর্তি চুরি করে এনেছি। এই দেশ থেকে পালাবো। আমাদের জাহাজে চড়ে। আমরা বলি এ দেশের রাজপুরোহিত আপনী। কত সম্মান আপনার। এসব ছেড়ে চলে যাবেন কেন? উনি বলেন—বহুদিন দেশছাড়া। আর এখানে ভালো লাগছে না। জিজ্ঞেস করলাম—আপনার দেশ কোথায়? বললেন পর্তুগাল। আমরা তাঁকে স্পষ্ট বলি আমরা একজন চোরকে আশ্রয় দেব না। ফ্রান্সিস বলল তারপর আপনার সভায় আসবো আর বোঁচকায় বাধা দেবমূর্তি দিয়ে দেবো। কিন্তু পরে

আমি মত পাল্টালাম। পিরেল্লো বলছিলেন—ধরা পড়লে তাঁকে ফাঁসি কাঠে ঝোলানো হবে। তখন ঠিক করলাম রাজপুরোহিতকে আর বিপদে ফেলবো না। মূর্তিগুলো একটা বোঁচকায় ভরে সেটা আমাদের ঘরে রেখে এলাম। রাজা হানমের গুপ্তধন উদ্ধারের বিষয়ে আপনার সঙ্গে কথা বলবো। তাই এসেছি। আমরা চোর না। যা ঘটেছিল তার সবই আমি বললাম। ফ্রান্সিস থামল। তারপর বলল—যদি অনুমতি দেন আমার আরও কিছু বলার ছিল।

—ঠিক আছে, বলো। রাজা বললেন।

—আমি পিরেল্লোকে বললাম—আমাদের মন্দিরে নিয়ে চলুন আমরা ওখানে যথাস্থানে মূর্তি রেখে দেব। পিরেল্লো রাজি হল। আমাদের নিয়ে আর দেবমূর্তি নিয়ে আমাদের মন্দিরে নিয়ে চললেন। ফ্রান্সিস একটু থামলো। পরে বলতে লাগলো—আমরা হাঁটতে লাগলাম। কিন্তু কোথায় মন্দির? আমরা মাঝে মাঝেই জিজ্ঞেস করেছি মন্দির কোথায়? পিরেল্লো বলেছেন সে মন্দির মাটির নীচে। ওপর থেকে দেখাবো কী করে। আমরা আর কোন কথা না বলে হাঁটতে লাগলাম। দেবমূর্তির বোঁচকাটা আমরা হাতছাড়া করলাম না। সন্ধ্যে হয় হয় এমন সময় আমরা রাজা মুজার্তার রাজত্বে পৌঁছালাম। গর্ভগৃহের মন্দির আর আমাদের দেখা হল না। সব ঘটনা সত্যি সত্যি বললাম। এখন আপনার বিচার।

রাজা কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন—একটা জিনিস বোঝা যাচ্ছে তোমরা মন্দির দেখোনি। কাজেই সাত দেবমূর্তি চুরির সঙ্গে তোমরা জড়িত নও।

—না, না। ওরা মিথ্যেবাদী। পিরেল্লো বলে উঠলেন।

—না। মিথ্যেবাদী আপনি। আপনিই কারো সাহায্য নিয়ে মূর্তি চুরি করেছিলেন। বিস্কো বলল।

সেনাপতি রাজার দিকে এগিয়ে এলেন। বলল—

—মান্যবর রাজা। ঐ ঘরে একটা বোঁচকায় মূর্তিগুলো রাখা আছে।

রাজা কানবহনা হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন। চারদিকে তাকিয়ে বললেন—আজকের সভা এখানেই শেষ। ততক্ষণে সভায় আসা প্রজারা চলে যেতে লাগল। অল্পক্ষণের মধ্যেই প্রজারা চলে গেল। রাজা পিরেল্লোর দিকে তাকালেন।

বললেন—আপনি স্নান করে আসুন। আপনি দেবমূর্তিগুলো যথাস্থানে রেখে দেবেন। পিরেল্লো মাথা একটু নুইয়ে চলে গেলেন।

—সেনাপতি। রাজা ডাকলেন।

—বলুন মান্যবর। সেনাপতি বলল।

—আমাদের ঐ ঘরে নিয়ে চলুন। রাজা বললেন।

—আসুন। সেনাপতি বলল।

রাজা সেনাপতি আর ফ্রান্সিসরা রাজবাড়ির বাইরে এলেন। সেনাপতি একটু এগিয়ে হাঁটতে লাগলেন। ফ্রান্সিসদের ঘরের সামনে এসে ঘরটা সেনাপতি দেখালেন।

সেনাপতি দরজার তালা খুলল। রাজা ভেতরে ঢুকলেন। সেনাপতি বোঁচকাটা দেখালেন। রাজা বোঁচকাটার দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর বললেন—কেউ যেন বোঁচকাটা না ছোঁয়। স্নান সেরে এখুনি পিরেল্লো আসছেন। উনি দেবমূর্তিগুলো যথাস্থানে রাখবেন।

রাজা আর ফ্রান্সিসরা বাইরে এল। ফ্রান্সিস বলল—মাননীয় রাজা, আমরা এখন কী করবো?

—হুঁ। ভেবেছিলাম কয়েদঘরে ঢোকাবো। এখন ভাবছি একটা সুযোগ তোমাদের দেব। রাজা বললেন।

—তাহলে রাজা হানমের গুপ্তধনের সন্ধান শুরু করবো? ফ্রান্সিস বলল।

—ঠিক আছে। তবে একটা কথা না বলতে পারলে তোমাদের ফাঁসি দেব। রাজা বললেন।

ফ্রান্সিস একটু চুপ করে থেকে বলল—মাননীয় রাজা আমাদের ওপর অতটা নির্মম হবেন না। আমাদের ফাঁসী দিয়ে আপনার লাভ? আমরা তো আপনার শত্রু নই। আপনার দেশবাসীও নই।

—ঠিক আছে। পরে সব দেখা যাবে। রাজা বললেন। তখনই পিরেল্লো এলেন।

—আপনারা কাজ করুন। এই বলে সেনাপতিকে সঙ্গে নিয়ে রাজা চলে গেলেন।

ফ্রান্সিস আর বিস্কো ঘরটায় ঢুকলো। দেখল পিরেল্লো বোঁচকাটা তুলছে—ফ্রান্সিস বলল—আপনাদের সঙ্গে আমরাও যাবো।

—কোথায়? পিরেল্লো বলল।

—মন্দিরটা দেখতে। ফ্রান্সিস বলল।

—আপনারা বিদেশী। মন্দিরে ঢোকা বারণ। পিরেল্লো বললেন।

—রাজামশাইতো সেনাপতিকে ঢালাও বলে দিয়েছেন আমরা এই রাজ্যের যেখানে খুশি যেতে পারি। আমাদের যাতে কেউ বাধা না দেয় রাজা সেকথাও বলেছেন। আপনিও তখন রাজসভায় উপস্থিত ছিলেন।

—বেশ। চলুন। পিরেল্লো অগত্যা রাজী হলেন।

পিরেল্লো বোঁচকাটা মাথায় তুলে নিল। ঘর থেকে বেরিয়ে এল। ফ্রান্সিসরা দরজা বন্ধ করে বাইরে এলো। তিনজন চলল।

মন্দিরটা রাজবাড়ির চৌহদ্দির মধ্যেই। মন্দিরে ঢুকতেই চারজন প্রহরী ফ্রান্সিসদের আক্রমণ করল।

অন্য প্রহরীটি ফ্রান্সিসকে লক্ষ্য করে বর্শা তুলতে গেল কিন্তু ফ্রান্সিস ওকে হাত তুলতেই দিল না। এক লাফে ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। প্রহরীটি কিছু বোঝার আগেই ফ্রান্সিস ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রহরীর বর্শাটা ধরে ফেলল। তারপর এক হ্যাঁচকা টানে বর্শাটা প্রহরীর হাত থেকে ছাড়িয়ে নিল। বিস্কো তখন অন্য প্রহরীর

হাত থেকে ছোরাটা বের করে নিয়ে তার পিঠে বসিয়ে দিল। প্রহরীটি মুখে শব্দ তুলল—আঁ। তারপর পাথরের সিঁড়ির ওপর গড়িয়ে পড়ল।

হাতে ধরা বর্শাটা ফ্রান্সিস পিরেল্লোর বুকে তাক করল। চাপাস্বরে বলল, এখন আপনি আমার নিশানার সামনে। শুধু বর্শাটা ছোঁড়ার অপেক্ষা।

পিরেল্লো কেঁদে ফেললেন। বলে উঠলেন, দোহাই আমায় হত্যা করবেন না।

আপনি আমাদের হত্যা করতে চেয়েছিলেন। বলুন, তাই কিনা? ফ্রান্সিস গম্ভীর স্বরে জানতে চাইল।

না। হত্যা নয়, আপনাদের আহত করতে চেয়েছিলাম। পিরেল্লো বললেন।

কিন্তু কেন?

সোনার লোভে। আমি বুঝেছিলাম আপনারা রাজা হানমের গুপ্ত ধনসম্পদ উদ্ধার করতে পারবেন। তখন আহত নিরস্ত্র আপনারা আমাকে বাধা দিতে পারবেন না। দুজন প্রহরী আর আমি মিলে আপনাদের উদ্ধার করা ধনসম্পদ নিয়ে পালিয়ে যেতে পারব।

হুঁ। ফ্রান্সিস মুখে শব্দ করল। তারপর বলল, কাল সকালে আমি রাজসভায় যাবো। রাজা কানবহনাকে সব বলব। উনি আপনাদের যা করবার করবেন।

না-না। দোহাই, আপনি রাজাকে কিছু বলবেন না। রাজা আমাদের ফাঁসিতে লটকাবেন। পিরেল্লো বললেন।

ফ্রান্সিস একটু ভাবল। তারপর বলল, আপনারা আমাদের হত্যা করতে চেয়েছিলেন। আমরা কোনরকমে জীবন রক্ষা করলাম। তার আগে কি একবারও ভেবেছিলেন যে আমরা বিদেশী, নিরস্ত্র, অসহায়!

—আপনাদের হত্যা করতে গিয়েছিলাম এই অপরাধের জন্যে যা শাস্তি দিতে চান দিন। শুধু একটা অনুরোধ, রাজাকে কিছু জানাবেন না।

ফ্রান্সিস, একে ছেড়ে দাও। কী হবে এই ছুঁচোটাকে মেরে? বিস্কো বলল।

আহত প্রহরীরা তখন সিঁড়ির ওপর শুয়ে কাতরাচ্ছে। তাদের পাশ দিয়ে ফ্রান্সিসরা সিঁড়ি দিয়ে উঠে বাইরে চলে এল। বাইরে তখন সন্ধ্যে। চলল রাজবাড়ির দিকে।

ঘরে ঢুকে ফ্রান্সিস টান টান হয়ে শুয়ে পড়ল। বিস্কো ফ্রান্সিসের পাশে বসল। বলল, এবার কি করবে?

রাজা হানমের গুপ্তধন আছে ঐ সাজঘরে। ফ্রান্সিস বলল।

ছড়াটায় সাজঘরের উল্লেখ আছে। বিস্কো বলল।

হ্যাঁ। সেইজন্যই সাজঘরটা ভালো করে দেখতে হবে। ফ্রান্সিস বলল।

তুমি কি নিশ্চিত যে গুপ্তধন সাজঘরেই আছে? বিস্কো বলল।

সম্পূর্ন নিশ্চিত নই। তবে পুজোর ঘরে অথবা সাজঘরে রাজা হানমের গুপ্তধন আছে এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত।

এখন কি করবে? বিস্কো জানতে চাইল।

কাল সকালে রাজসভায় যাব। রাজা কানবাহনার অনুমতি নেব, তারপর খোঁজাখুঁজি শুরু করবো।

রাতের খাওয়া-দাওয়া সেরে ওরা ঘরে এসে শুয়ে পড়ল। বিস্কো ঘুমিয়ে পড়লেও ফ্রান্সিস-এর চোখে কিন্তু ঘুম নেই। রাজা কানবহনার অনুমতি পাওয়া যাবে। কারণ ফ্রান্সিস আগেই বলে দেবে যে গুপ্তধন উদ্ধার করাই তার উদ্দেশ্য। গুপ্তধন থেকে ওরা কিছুই নেবে না। এটা শুনলে রাজামশাই লাফিয়ে উঠবেন। গুপ্তধন উদ্ধারের জন্য সর্বপ্রকারে সাহায্য করবেন। গুপ্তধন পাওয়ার লোভ কেউ দমন করতে পারে না। রাজাও পারবেন না। মনে হয় অনুমতি সহজেই পাওয়া যাবে। এইসব ভাবতে ভাবতে ফ্রান্সিস ঘুমিয়ে পড়ল।

পরের দিন সকালের জলখাবার খেয়ে ফ্রান্সিসরা রাজসভার দিকে চলল।

রাজসভায় ঢোকার মুখে দেখল রাজপুরোহিত পিরেল্লো ওদের অপেক্ষাতেই দাঁড়িয়ে আছেন। কাছাকাছি আসতেই রাজপুরোহিত বলেলন আমি আপনাদের জন্যেই অপেক্ষা করছি। তারপর ফ্রান্সিসদের দিকে তাকিয়ে বললেন, গতকালের কথা ভুলে যান। আপনাদের আমরা আহত করতে চেয়েছিলাম তার জন্য মাপ চাইছি।

বেশ আমি এ ব্যাপারে রাজাকে কিছু বলব না। আপনি আমাদের তার সঙ্গে কথা বলার ব্যবস্থা করে দিন।

দেখছি। পিরেল্লো চলে গেলেন। একটু পরে ফ্রান্সিসরা দেখল, মন্ত্রীর সামনে মাথা নীচু করে পিরেল্লো কী বলছেন। মন্ত্রী মাথা ঝাঁকালেন। পিরেল্লো ফ্রান্সিসদের কাছে এলেন। বললেন, কিছু পরে আপনাদের ডাক পড়বে। ফ্রান্সিস আর কোন কথা বলল না। দুজনে অপেক্ষা করতে লাগল।

সেনাপতি ফ্রান্সিসদের নাম ডাকলেন। ফ্রান্সিস, বিস্কো এগিয়ে এল মাথা ঝুঁকিয়ে রাজাকে সম্মান জানিয়ে বলল, আপনি আমাদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করেছেন তাতে আমরা খুশি। একটু থেমে ফ্রান্সিস বলল, এবার কাজের কথা বলি। রাজপুরোহিত পিরেল্লো আমাদের মন্দিরে নিয়ে গেছেন, গর্ভকক্ষে নিয়ে গেছেন। পাশের সাজকক্ষও দেখিয়েছেন। শুধু একবার দেখেছি সেসব। কাজেই মাত্র একবার দেখে কিছু সিদ্ধান্তে আসা যাবে না আমরা আবার ভালোভাবে দেখব। তারপর বলতে পারব—রাজা হানমের ধনসম্পদ কোথায় রাখা হয়েছে।

হুঁ। দেখ চেষ্টা করে। কোনকিছুর প্রয়োজন পড়লে সেনাপতিকে বলবে। সব পাবে। রাজা বললেন।

ফ্রান্সিসরা একটু মাথা ঝুঁকিয়ে চলে এল। পিরেল্লোও ওদের কাছে এলেন। পিরেল্লো নিশ্চিন্তের হাসি হেসে বললেন, আপনাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ রইলাম। আমার বিরুদ্ধে খুনের চেষ্টার অভিযোগ উঠলে আজ রাতেই আমার জীবন শেষ হয়ে যেত। এই রাজা কি খুব বদরাগী? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

সাংঘাতিক। যে তাঁকে মাথা নুইয়ে ভক্তি-শ্রদ্ধা না জানায় তাকে হাত-পা বেঁধে ইরা নদীতে ফেলে দেওয়া হয়।

ভাগ্যিস যথাসময়ে মাথা নীচু করে শ্রদ্ধা-ভক্তি জানিয়েছি। আমরা খুব বেঁচে গেলাম। বিস্কো বলল।

ফ্রান্সিসরা তাদের আস্তানায় ফিরে এল। পিরেল্লো পিছু ছাড়লেন না। ঘরের তালা খোলা হলো। সবাই ঘরটায় ঢুকল। ফ্রান্সিস শুয়ে পড়ল। পিরেল্লো বিস্কো বলল।

ফ্রান্সিস? পিরেল্লো ডাকলেন।

হুঁ।

সত্যিই কি আপনি এই রহস্যের সমাধান করতে পারবেন?

সবকিছু না দেখে না বুঝে বলতে পারবো না। তবে রাজা হানমের গুপ্তধন আমি উদ্ধার করবোই। তার জন্য একটু সময়ের দরকার। সেই সময়টা আমাদের পেতে হবে।

সেই সময় আপনারা পাবেন। পিরেল্লো বললেন।

দেখা যাক।

ফ্রান্সিস, আপনারা তো মন্দিরে রাজা হানমের গুপ্তধনের খোঁজে যাবেনই। অনুরোধ, আমাকেও সঙ্গে নিন। পিরেল্লো বললেন।

না। আপনাকে বিশ্বাস করি না। আপনি আমাদের সঙ্গে যেতে পারবেন না। ফ্রান্সিস বলল।

আমি আপনাদের কোনো ক্ষতি করব না। বরং আপনাদের সাহায্য করব।

আপনার সাহায্যের দরকার নেই। আমরাই সব পারব। বিস্কো বলল।

তবু আমাকে সঙ্গে নিন। পিরেল্লো বললেন।

না। আপনার সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই। বিদেয় হোন। ফ্রান্সিস বলল।

আমার অনুরোধ—পিরেল্লো বলতে গেলেন।

আপনার কোনো অনুরোধ শুনতে আমার আগ্রহ নেই। ফ্রান্সিস বলল।

পিরেল্লো আর কোনো কথা বললেন না। বেরিয়ে চলে গেলেন।

ফ্রান্সিস? বিস্কো ডাকল।

বলো। ফ্রান্সিস ওর দিকে তাকাল।

পিরেল্লোকে সঙ্গে রাখলে ভালো হতো।

বিস্কো তুমি ঠিক বুঝতে পারোনি। পিরেল্লো গুপ্তধনের লোভে প্রায় পাগল হয়ে গেছে। যে কোনো মুহূর্তে আমাদের হত্যা করতে পারে।

ওর হাতে তো কোনো অস্ত্রই নেই।

কোমরে একটা বড় ছোরা গোঁজা আছে। ফ্রান্সিস বলল।

বলো কি? বিস্কো আঁতকে উঠল।

হ্যাঁ। আমরা কাজে ব্যস্ত থাকবো। গুপ্তধন উদ্ধারের মুখে ও আমাদের হত্যা করবে।

হুঁ। এটা হতে পারে। এখন কী করবে? বিস্কো জানতে চাইল। শোন। একটা লড়াইয়ের সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছি। পিরেল্লো এ-দেশের রাজপুরোহিত। প্রহরীরা ওর কথা শুনবে। ও প্রহরীদের গুপ্তধনের লোভ দেখাবে। দলে টানবে। প্রহরীরা নির্দেশ পেলেই আমাদের আক্রমণ করবে। কাজেই আমাদেরও সাবধান থাকতে হবে। ফ্রান্সিস বলল।

অর্থাৎ আমাদেরও লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। বিস্কো বলল।

হ্যাঁ, ঠিক তাই। কয়েকজনকে তরোয়াল নিয়ে আসতে বলবে। ওরা সবাই এলে মন্দিরে নামব। ফ্রান্সিস বলল।

বিস্কো খাবার খেয়ে রওনা হয়ে গেল।

একটু রাতে জাহাজে পৌঁছল বিস্কো। ভাইকিং বন্ধুরা ছুটে এল। সকলেই জানতে চাইছে—ফ্রান্সিস ভালো আছে কিনা। গুপ্তধন উদ্ধার হয়েছে কিনা।

বিস্কো সব বলল। ফ্রান্সিসের শেষ নির্দেশটাও বলল। বিস্কোরা চারজন পোশাক পাল্টে কোমরে তরোয়াল গুঁজে জাহাজের ডেকে উঠে এল।

শাঙ্কো তৈরী হয়ে এল। বলল আমিও যাব চলো।

ডেকের একপাশে মারিয়া চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল। বিস্কো মারিয়ার কাছে এল। বলল, ভয়ের কিছু নেই। ওখানে একটা ছোটোখাটো লড়াইয়ের মতো হতে পারে। আমরা জিতব। কোনোরকম দুশ্চিন্তা করবেন না। আমরা তাড়াতাড়িই ফিরে আসবো। শাঙ্কোরা এবার চলল রাজবাড়ির দিকে।

ভোর হয় হয় এমন সময় ওরা রাজবাড়ি পৌঁছল। প্রধান প্রবেশদ্বারে পেতলের বর্শা হাতে চারজন প্রহরী পথ আটকাল। শাঙ্কো এগিয়ে এল। বলল, সেনাপতি আমাদের সবরকম স্বাধীনতা দিয়েছেন। আমাদের আটকাবে না। একজন প্রহরী শাঙ্কোকে চিনল। দরজা খুলে বলল, আপনারা আসুন।

শাঙ্কোরা বিরাট মাঠে এল। শাঙ্কোর পেছনে পেছনে ওরা চলল ফ্রান্সিসদের আস্তানার দিকে। ফ্রান্সিসদের ঘরের সামনে এল সবাই। শাঙ্কো দরজায় ধাক্কা দিল।

আসছি। ফ্রান্সিসের গলা। ফ্রান্সিসের দরজা খুলল। বন্ধুরা ঘরে ঢুকল।

শাঙ্কো আর বিস্কোর কাছে সবই শুনেছিল ওরা। নতুন করে জানার মতো কিছু ছিল না। ফ্রান্সিসের কাছে আর কিছু জানতে চাইল না।

শুকনো খড়ের বিছানায় বসল সবাই। ফ্রান্সিস বলল, সবই শুনেছ। আমার কেমন মনে হচ্ছে গুপ্তধনের কথা বলে পিরেল্লো কয়েকজন প্রহরীকে দলে টেনেছে। গুপ্তধন আবিস্কৃত হয়ে গেলে ওরা আমাদের আক্রমণ করতে পারে। আমাদের সাবধান থাকতে হবে।

মন্দিরে কখন যাবে? বিস্কো বলল।

দুপুরের খাওয়া-দাওয়া সেরে। ঐ মন্দিরে কতক্ষণ থাকতে হবে জানি না। কাজেই পেট ভরে খেয়ে যেতে হবে। ফ্রান্সিস বলল।

একসময় রাজবাড়ির রাঁধুনি এসে খবর দিয়ে গেল, এখন খেতে দেওয়া হবে।

খাওয়া-দাওয়া সেরে ফ্রান্সিসরা তৈরী হলো। বিস্কো ফ্রান্সিসের তরোয়ালটা এনেছিল। এবার ফ্রান্সিসকে দিল।

ফ্রান্সিসরা চলল মাঠের নীচের মন্দিরের দিকে।

মন্দিরের সামনে যখন ওরা এল, দূর থেকেই ফ্রান্সিস দেখল প্রহরীর সংখ্যা বেশী। ওখানে নিশ্চয়ই পিরেল্লো আছেন। উনি এত সহজে হাল ছেড়ে দেবেন না।

প্রবেশদ্বারের সম্মুখে দেখল পিরেল্লো দাঁড়িয়ে আছেন।

ফ্রান্সিসরা এসে দাঁড়াল। পিরেল্লো কি ইঙ্গিত করলেন প্রহরীরা সারি দিয়ে মন্দিরে ঢোকার মুখে দাঁড়াল।

ফ্রান্সিস প্রহরীদের সামনে গেল। বলল, আমরা লড়াই চাই না। আমাদের দুজনকে গর্ভমন্দিরে ঢুকতে দাও।

না। সর্দার প্রহরী বলল।

তুমি ভাই সেনাপতির হুকুম জানো না। ফ্রান্সিস বলল।

কী হুকুম? সর্দার জিগ্যেস করল।

গুপ্তধনের সন্ধান করতে আমরা যে কোনো জায়গায় যখন খুশি যেতে পারবো। এটা রাজার হুকুম। ফ্রান্সিস বলল।

অদ্ভুত হুকুম। সর্দার বলল।

হ্যাঁ, একটু অদ্ভুতই। পথ ছাড়ো।

সেনাপতির কাছে লোক পাঠাচ্ছি সেনাপতির হুকুম জানতে। সর্দার প্রহরী বলল।

বেশ। মিছিমিছি দেরি হবে এই আর কি। ফ্রান্সিস হতাশার ভঙ্গি করে বলল।

একজন প্রহরী বর্শা হাতে ছুটে গেল। কিছু পরে তাকে দেখা গেল মাঠের ওপার দিয়ে ছুটে আসছে। সর্দার প্রহরীর কাছে এসে সে হাঁপাতে লাগল। বলল, সেনাপতি বলেছেন, এঁরা যেখানে খুশি যেতে পারেন। আর আমরা যেন এঁদের সাহায্য করি।

ঠিক আছে। আপনি যান। সর্দার বলল।

ফ্রান্সিস বন্ধুদের বলল, প্রথমে আমি আর বিস্কো যাবো। তোমরা এখানেই থাকো। ফ্রান্সিস-বিস্কো পাথরের দরজার দিকে চলল।

পিরেল্লো ছুটে এসে বললেন, আমাকেও নিয়ে চলুন।

না, আপনি যাবেন না। শাঙ্কো বলল।

কেন যাবো না? এ দেশ আমাদের। দেশের ভালো-মন্দ তো আমরাই দেখবো। আপনারা তো বিদেশী। পিরেল্লো উত্তর দিলেন।

ফ্রান্সিস ঢোকার দরজার কাছে দাঁড়িয়ে পড়ল। বলল, ঠিক আছে। আপনারাই যান। রাজা হানমের গুপ্ত ধনসম্পদ খুঁজে বের করুন।

আমরা পারব না। আপনারা পারবেন। গুপ্তধন পেলে আপনারা সেটা নিয়ে পালিয়ে যেতে পারেন। পিরেল্লো বললেন।

সেটা দেখার জন্যে এই প্রহরীরা আছে। রাজা আছেন। ফ্রান্সিস বলল।

না। রাতের অন্ধকারে আপনারা সব মূল্যবান গুপ্তধন নিয়ে পালাবেন। পিরেল্লো বললেন।

ঠিক আছে। আপনার যখন এরকম সন্দেহ, আসুন আমাদের সঙ্গে। শুধু একটা কারণে আপনাকে সঙ্গে নিচ্ছি। রাজা হানমের ছড়াটা আপনি আমাদের দেখিয়েছেন। এতে গুপ্ত ধনভাণ্ডার খুঁজতে সুবিধে হবে। চলুন। ফ্রান্সিস বলল।

পাথরের দরজার পাশে লোহার আংটায় আটকানো দুটো মশাল বিস্কো নিল। পিরেল্লো বললেন, একটা আমাকে দিন। বিস্কো ফ্রান্সিসের দিকে তাকাল। ফ্রান্সিস মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল।

চকমকি পাথর ঠুকে আগুন জ্বালিয়ে শাঙ্কো দুটো মশাল ধরাল। ফ্রান্সিস বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে বলল, ভাইসব, তোমরা অপেক্ষা কর। অধৈর্য হয়ো না।

শাঙ্কো একটা মশাল নিল। পিরেল্লো অন্যটা। সিঁড়ি দিয়ে ওরা নামতে লাগল। বেশ গরম লাগছে। তিনজনই ঘামছে।

সিঁড়ি শেষ। একটা পাথরের মেঝে। ফ্রান্সিস মশালের আলোয় চারদিক খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। দেখতে-দেখতে ছড়াটা ও আওড়াতে লাগল ঃ

ছোট্ট সাজের ঘরে
রেখেছি বড় আদরে।
ধনসম্পদ কার তরে?
বুদ্ধিমান উদ্ধার করে
বোকারা হা-হুতাশ করে।

ফ্রান্সিস বলল, কী পিরেল্লো! ঠিক বলেছি।

হ্যাঁ। আশ্চর্য। আপনি ছড়াটা একবার দেখেই মুখস্থ করে ফেলেছেন।

ফ্রান্সিস কিছু বলল না। দেওয়ালগুলো খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। বেদীর মতো টানা পাথরের উপর ফুলপাতা।

ফ্রান্সিস পিরেল্লোকে বলল, এই বেদীটা কি বরাবর আছে নাকি আপনারা গেঁথে ছিলেন?

না। এই বেদী আমরা বরাবর এইরকমই দেখে আসছি।

হুঁ। ফ্রান্সিস মুখে শব্দ করল। তারপর পাথরের জোড়াগুলো খুব ভালো করে দেখতে লাগল। নাঃ, কোনো আলগা জোড়া নেই।

এবার ফ্রান্সিস পেছনের সাজঘরে ঢুকল। দেবতাদের পোশাক একটা লম্বাটে পাথুরে পাটাতনের ওপর জড়ো করা। ফ্রান্সিস চারপাশে তাকিয়ে দেখল। পাথরের দেওয়াল। এবড়ো-খেবড়ো। শুধু দেবতাদের পোশাক যে পাথুরে পাটাতনের ওপর রাখা সেই পাটাতনটা মসৃণ পাথরের।

ফ্রান্সিস ভাবতে লাগল কোথায় থাকতে পারে রাজা হানমের গুপ্ত ধনভাণ্ডার। ফ্রান্সিস বলল, পিরেল্লো—দেবতাদের পোশাক এখানেই থাকে।

হ্যাঁ। বছর অন্তর-অন্তর পুরোনো পোশাক খুলে ফেলে দেবতাদের নতুন সাজপোশাক পরানো হয়।

পুরোনো পোশাকগুলো ফেলে দেওয়া হয়? ফ্রান্সিস বলল।

না। সে-সব পোশাক রাজ্যের ধনীরা কিনে নেয়। খুব পবিত্র সেই পোশাকগুলো। পিরেল্লো বললেন।

এত পোশাক জমে আছে কেন? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

এখনও বিক্রি করার সময় আসেনি। পিরেল্লো বললেন।

ফ্রান্সিস পাথুরের পাটাতনে রাখা সাজপোশাক দেখতে লাগল। একটা পাটাতনে কুঁদে কুঁদে গোল দাগ তোলা হয়েছে। এর নীচে কী আছে? এখানে পাথুরে পাটাতনটা কি ফাঁপা? নীচে কিছু আছে? বিস্কোকে ডাকল। মশালটা বিস্কোর হাতে ছিল। বলল, মশালটা নিচু কর।

বিস্কো মশলাটা নীচু করে ধরল। ফ্রান্সিস গোল দাগটা ভালো করে দেখল।

বিস্কো মশাল হাতে নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগল। একটু দ্রুতই পা ফেলে উঠতে লাগল। কিছুক্ষণের মধ্যেই সিঁড়ি শেষ। বাইরে বেরিয়ে দেখল উজ্জ্বল জ্যোৎস্না। চারদিক বেশ ভালোভাবেই দেখা যাচ্ছে। বন্ধুদের দেখল মাঠটায় বসে আছে। দুজন ভাইকিং বন্ধু এগিয়ে এল। বলল, কী খবর বল।

ফ্রান্সিস খুব সম্ভব হদিস পেয়েছে।

তাহলে মনে হচ্ছে ফ্রান্সিস রহস্যের সমাধান করেছে। বন্ধুটি বলল।

তাই তো মনে হচ্ছে। বিস্কো বলল।

বিস্কো নিজেদের আস্তানায় চলল।

ওদিকে পিরেল্লো সর্বক্ষণ ফ্রান্সিসকে লক্ষ্য করে যাচ্ছেন। এতে ফ্রান্সিস বেশ অস্বস্তি বোধ করছিল। কিন্তু উপায় নেই।

এবার পিরেল্লো এগিয়ে এলেন, বললেন, কোনো হদিস পেলেন?

না। তবে চেষ্টা করছি। ফ্রান্সিস বলল।

মিথ্যে কথা। আপনি গুপ্তধনের হদিস পেয়েছেন।

না। হদিস পাইনি এখনও। তবে কিছুটা আন্দাজ করেছি। ফ্রান্সিস বলল।

তবে সেটা বলুন। পিরেল্লো বললেন।

না। গুপ্তধন সম্বন্ধে সব বলতে আমি আপনার কাছে দায়বদ্ধ নই। ফ্রান্সিস উত্তর দিল।

তবে কাকে বলবেন আপনার এই গুপ্তধন খোঁজার কথা। পিরেল্লো জানতে চাইলেন।

বলবো রাজা কানবহনাকে। ফ্রান্সিস বলল।

না। আপনি আমাকে সব বলবেন। পিরেল্লো জোর দিলেন।

আগেই বলেছি আপনার কাছে আমি দায়বদ্ধ নই।

তাহলে আপনাদের মরতে হবে। পিরেল্লো বললেন।

অতটা কব্জির জোর থাকলে আমাদের হত্যা করুন। ফ্রান্সিস জানাল।

ফ্রান্সিস কিছু বোঝার আগেই পিরেল্লো কোমর থেকে একটা বাঁকা মাথা বড় ছোরা বের করে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। অন্যমনস্ক ফ্রান্সিস ছিটকে পড়ল মেঝেয়। পিরেল্লো ছোরাটা ফ্রান্সিসের বুক লক্ষ্য করে বিঁধতে গেলে ফ্রান্সিস ঘুরে গেল আর ছোরাটা বিঁধল ওর বাঁ বাহুমূলে। রক্ত বেরিয়ে এল। বিস্কো একটা লাফ দিয়ে পিরেল্লোকে জাপটে ধরল। তারপর বুকের নীচে হাত দিয়ে ওর ছোরাটা বের করল। ফ্রান্সিস চেঁচিয়ে উঠল, ওকে হত্যা করো না। গুপ্তধনের ব্যাপারে ভাবতে-ভাবতে ওর মাথার ঠিক নেই।

শাঙ্কো দ্রুত ফ্রান্সিসের কাছে এল। মশালের আলোয় দেখল কাটা জায়গাটা বড় না হলেও বেশ রক্তপাত হচ্ছে। শাঙ্কো কোমরের ফেট্টি থেকে কাপড় ছিঁড়ে ফ্রান্সিসের কাটা জায়গাটা বেঁধে দিল। ফ্রান্সিসের একটু আরাম লাগল। রক্ত পড়া বন্ধ হলো।

ওদিকে পিরেল্লো দ্রুত উপরে উঠে এলেন। চার বর্শাধারীকে ডাকলেন। বললেন, দুটো চোর রাজা হানমের গুপ্তধন উদ্ধার করেছে। সেই ধনভাণ্ডার নিয়ে ওরা বাইরে আসবে। পালাতে চাইবে। ওদের পালাতে দিও না। তৈরী থাকো।

বিস্কো গলা চেপে বলল, বোঝাই যাচ্ছে এই লোকটা প্রহরীদের সাহায্যে ফ্রান্সিস আর বিস্কোকে বন্দী করবে।

এখনই প্রহরীদের আক্রমণ করবো? একজন ভাইকিং বন্ধু জানতে চাইল।

না। আগে ফ্রান্সিসরা উঠে আসুক। বিস্কো বলল।

কিছুপরে ফ্রান্সিসকে ধরে ধরে বিস্কো প্রধান দ্বার পর্যন্ত এল। এবার পিরেল্লো গলা চড়িয়ে বললেন, এই দুজনেরই কথাই বলছিলাম। ওদের হত্যা কর।

বিস্কো দ্রুত উঠে দাঁড়িয়ে চিৎকার করল, ও—হো—হো—।

বন্ধুরাও ধ্বনি তুলল, ও-হো-হো।

প্রহরীরা বর্শা হাতে ফ্রান্সিস আর বিস্কোর দিকে ছুটে এল। বিস্কোরা প্রহরীদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। শুরু হলো লড়াই। বর্শা দিয়ে তরোয়াল ঠেকানো অসুবিধে। একবার বর্শা হাতছাড়া হলে আক্রমণকারী নিরস্ত্র হয়ে যায়। লড়াইয়ের মধ্যে ফ্রান্সিসের উচ্চস্বর শোনা গেল, ভাইসব, কাউকে হত্যা করো না। প্রয়োজনে বন্দী কর।

অল্পক্ষনের মধ্যে লড়াই শেষ। প্রহরীদের মধ্যে দু তিনজন আহত হয়ে ঘাসে ঢাকা মাঠে পড়ে রইল।

ফ্রান্সিস চারদিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে পিরেল্লোকে খুঁজতে লাগল। চাঁদের উজ্জ্বল আলোয় দেখল পিরেল্লো আর একজন প্রহরী একটা ওক গাছের তলা দিয়ে ছুটছে। ফ্রান্সিস বলল, বিস্কো আমি ছুটতে পারছি না। রক্তপড়া বেড়ে যাবে। তুমি ছুটে গিয়ে পিরেল্লোকে ধর।

বিস্কো সঙ্গে-সঙ্গে ছুটল। পলায়মান পিরেল্লো। আর একজন প্রহরী তখন রাজবাড়ির পাশ দিয়ে ছুটে পালাচ্ছে। বিস্কো দ্রুত ছুটল। কিছুক্ষণের মধ্যেই বিস্কো পিরেল্লোদের কাছে এসে পড়ল। চেঁচিয়ে বলল, পিরেল্লো পালিয়ে রেহাই পাবেন না। কাজেই পালাবার চেষ্টা না করে আমাদের কাছে আসুন। ফ্রান্সিস আপনাকে ধরে নিয়ে যেতে বলেছে।

পিরেল্লো দাঁড়িয়ে পড়লেন। সঙ্গের যোদ্ধাটিও থামল। দুজনেই মুখ খুলে হাঁপাতে লাগল। বিস্কো ওদের কাছে এল। হাঁপাতে হাঁপাতে বিস্কো বলল—যদি রাজা হানমের ধনভাণ্ডার আবিষ্কার করতে পারি, রাজা কানবহনাকে বলবো ধনভাণ্ডারের কিছু অংশ আপনাকে যেন দেন।

সত্যি বলছো? পিরেল্লো বললেন।

হ্যাঁ, সত্যি বলছি। আপনি ফ্রান্সিসের কাছে চলুন। আমরা আপনার কোনোরকম ক্ষতি করবো না। বরং আপনি ফ্রান্সিসকে হত্যা করতে গিয়েছিলেন সেইজন্যে আমি আপনাকে এক্ষুণি মেরে ফেলতে পারি। বিস্কো বলল।

আমার দোষ হয়ে থাকলে—পিরেল্লো বলতে লাগলেন।

তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বিস্কো বলল, ঠিক আছে, আপনি ফিরে চলুন।

তিনজন ফিরে চলল মন্দিরের দিকে। মন্দিরের দরজার কাছে এসে দেখল প্রহরীরা আহত হয়ে এখানে ওখানে ঘাসের ওপর পড়ে আছে। ফ্রান্সিস কোমরের ফেট্টিতে তরোয়াল ঢুকিয়ে রেখেছে।

ফ্রান্সিস মশালের আলোয় খুব ভালো করে পাথরের পাটাতনটা দেখতে লাগল। দেবতাদের পোশাকের স্তূপ সরিয়ে দেখতে লাগল। তারপর পোশাকগুলো সরাতে শুরু করল। হঠাৎই দেখল—পাথরের নয় মসৃণ কাঠের বেদীমত। ফ্রান্সিস মাথা তুলে বলল—বিস্কো—মশালটা নামিয়ে ধরো। এ জায়গাটা ভালোভাবে দেখতে হবে। বিস্কো মশাল নামিয়ে ধরল। ফ্রান্সিস বুঝল ওর অনুমান ঠিক। ঐ একহাত লম্বা জায়গাটা মসৃণ কাঠের।

—বলেন কী?

—হ্যাঁ। পিরেল্লো কাঠের পাটাতনটা দেখলেন। বললেন—আশ্চর্য—আমরা কোনদিন এটা লক্ষ্য করি নি। ওখানকার পোশাকও তুলে দেখি নি।

—আরো আছে। ফ্রান্সিস আঙ্গুল দিয়ে দেখাল নীচের দিকে কাঠের তাকমত। ফ্রান্সিস আঙ্গুল চেপে দেখল তাকটা ভীষণ শক্ত। ফ্রান্সিস বলল—মশালটা কাছে আন। বিস্কো তাই করল। ফ্রান্সিস দেখল—কাঠ কুঁদে কুঁদে একটা ত্রিভুজমত আঁকা। তার মাঝখানে একটা ফুটোমত। বোঝাই যাচ্ছে ওটা তালা। কিন্তু এই তালার চাবি কই? ফ্রান্সিস অস্ফুটস্বরে বলতে লাগল। কথাটা বলতে বলতে ঐ জায়গাতেই কয়েক পাক ঘুরল।

তারপর বলে উঠলো—শায়িত দেবতার গর্তগুলো দেখতে হবে। বিস্কো এসো। দেবমূর্তিগুলো দেখবো। দুজনে গুনল। সব মিলিয়ে সাতটা গর্ত। তাতে

দেবমূর্তি শায়িত। ফ্রান্সিস সাতের শেষে আরো দুটি গর্তমত দেখল। ফ্রান্সিস মনোযোগ দিয়ে দেখতে লাগল। তখনই মশালটা নিভু নিভু হয়ে এল।

—পিরেল্লো তেল পাওয়া যাবে কোথায়? ফ্রান্সিস বলল।

—বাইরে। সদর দরজার পাহারাদারদের কাছে। বিস্কো প্রায় নিভে যাওয়া মশালের আলোয় আস্তে আস্তে ওপরে উঠে এল। প্রহরীদের কাছ থেকে একটা জ্বলন্ত মশাল নিয়ে নীচে নেমে এল।

—মশাল দেবমূর্তির মুখের কাছে নিয়ে এস। বিস্কো তাই করল। ফ্রান্সিস বলল—এখন অনেক পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। ফ্রান্সিস লক্ষ্য করলএখানে মাটি একটু উঁচু হয়ে আছে। ফ্রান্সিস আঙ্গুল দিয়ে জায়গাটা ঘসল। মাটি ঝুর্‌ঝুর্‌ করে পড়ল। দেখা গেল গর্ত। অন্য গর্তওগুলোর মতোই। ফ্রান্সিস বলল—পিরেল্লো বলুন তো এখানে একটা গর্ত আছে কিন্তু দেবমূর্তি নেই।

—হ্যাঁ। তাই দেখেই তো ভাবছি বাড়তি গর্ত। আমরা এটা কোনদিন লক্ষ্য করিনি।

—পিরেল্লো হঠাৎ বলল—ফ্রান্সিস?

—বলুন।

—আপনী কি গুপ্তধনের হদিশ করতে পারলেন?

—না। ঠিক জায়গাটা এখনও বুঝতে পারি নি। আচ্ছা পিরেল্লো সেই চামড়ায় লেখা ছড়াটা আপনার কাছে আছে?

—ওটা সবসময় আমার বুকে সাঁটা থাকে। ছড়াটা আমার মুখস্থ হয়ে গেছে। কাজেই ওভাবে রেখেছি। আমি বহুবার ছড়াটা দেখেছি। কিন্তু ছড়াটা ছাড়া আর কিছুই বুঝি নি।

—আমি পুরো চামড়াটা একবার দেখব। খুলে দেখাতে পারেন?

—বেশ দেখুন। পিরেল্লো কথাটা বলে বুকে দুহাত দিল। তারপর আঙ্গুল দিয়ে খুঁটে খুঁটে চামড়ার টুকরোটা খুলে নিল। ফ্রান্সিসের হাতে দিল। ফ্রান্সিস একটু গভীর মনোযোগ দিয়ে ছড়াটা বলতে লাগল। তারপর চামড়াটা ওল্টাল। খুব অস্পষ্ট আঁকিবুঁকির মতো। ফ্রান্সিস বলে উঠল—শাঙ্কো আরও একটা জ্বলন্ত মশাল আনা চাই। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি না। শাঙ্কো একছুটে দরজায় একটা মশাল নিয়ে এল। ফ্রান্সিস পিরেল্লোকে বলল—আচ্ছা এটার উল্টোপিঠ কোনদিন দেখেছিলেন?

—না তো। পিরেল্লো বোকার মত ফ্রান্সিসের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

—তবু এবারে আরেকটু স্পষ্ট দেখা গেল। একটা অস্পষ্ট ত্রিকোণ আঁকা। এই চিহ্নটাও পূজোর ঘরে দেখিনি। এবার সাজঘরটা দেখতে হবে।

—চলো। ফ্রান্সিস মন্দিরের দরজার দিকে চলল। মশাল হাতে ফ্রান্সিস নামতে লাগল। পূজোর ঘরে এল। তারপর সাজঘরে এল। মশাল শাঙ্কোর হাতে দিল। পাথরের তাকে জড় করা পোশাক সব সরাতে লাগল। পোশাকগুলি সরিয়ে

দিতেই পাটাতনের কোণার দিকে অস্পষ্ট দাগ—ত্রিকোণ। তার ঠিক মাঝখানে ছোট্ট গোল দাগ। সেটাও অস্পষ্ট।

ফ্রান্সিস পিরেল্লোকে চামড়াটা ফিরিয়ে দিল। পিরেল্লো নিয়ে বুকে সেঁটে রাখলেন। বললেন—কিছু হদিশ পেলেন। ফ্রান্সিস হেসে বলল—অত সহজে।

—তাহলে কী নিয়ে আপনি ভাবছেন? পিরেল্লো জানতে চাইলেন।

—একটা সমস্যা। পিরেল্লোকে বলল ফ্রান্সিস।

—কী সমস্যা?

—আপনার গুরুদেব হোমক যে চামড়ার টুকরো আপনাকে দিয়েছেন তাতে কিছু নির্দেশ আছে। ছড়াটা এমনি এমনি লেখা নয়। এটারও অর্থ আছে। সেটা নিয়েও ভাবছি।

—বুঝলাম—বাঁকা হাসি হেসে পিরেল্লো বললেন—গুপ্তধন উদ্ধার করা আপনার অসাধ্য। ঠিক কিনা?

—উঁহু। ফ্রান্সিস বলল—আমি সমাধানের শেষ পর্যায়ে।

—তাহলে বের করুন।

—এখনই হবে না। শুধু শেষ সমস্যাটার সমাধান বাকি।

—সমস্যাটা কী?

—শেষ সাত সংখ্যক গর্তটায় দেবমূর্তি ঢুকিয়ে শায়িত রাখা আছে। কিন্তু তারপরেও আট সংখ্যক একটা গর্তমত রয়েছে। তাতে দেবমূর্তি নেই। তাহলে ওটা কেন রাখা হয়েছে? গর্তটা কিছু মাটি দিয়ে ভরা আছে। কথাটা বলে ফ্রান্সিস গর্ত থেকে সব মাটি বের করল। বলল—বিস্কো—এই গর্তটায় কী আছে দেখ তো।

এবার বিস্কো গর্তটার মধ্যে আঙ্গুল ঢুকিয়ে দেখল শুধু মাটিই নয় আরো কিছু আছে। নরম কিছু। ও আঙ্গুল বেঁকিয়ে সেই নরম জিনিসটা টেনে বের করল। তুলো। নরম তুলো। বিস্কো বলল—ফ্রান্সিস—এই দেখ শুধু তুলো। ফ্রান্সিস হাতে নিয়ে দেখল। বলল—নিশ্চয়ই একটা শক্ত কিছু লাগল। ফ্রান্সিস ঠিক বুঝতে পারল না ওটা কী? আস্তে আস্তে জিনিসটার গায়ে আঙ্গুল বুলোতে বুলোতে বলল—মনে হচ্ছে—একটা হ্যাঁ—একটা চাবি।

—চাবি? পিরেল্লো বললেন।

—হ্যাঁ চাবি। ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে চাবিটা বের করল। ফ্রান্সিস চাবিটা চোখের সামনে এনে দেখাল।

—কীসের চাবি? চাবিটা কেন রাখা আছে? পিরেল্লো বলল।

—কারণ নিশ্চয়ই আছে। দামী কোন কিছু জিনিস গোপনে রাখার জন্যে। ফ্রান্সিস বলল।

—তাহলে কি রাজা হ্যানমের গুপ্ত ধনভাণ্ডার খোলার চাবি এটা? পিরেল্লো বললেন।

—সেটা দেখতে হবে। ফ্রান্সিস বলল।
—তাই দেখুন। পিরেল্লো বললেন।
—শুধু আমরা থাকলে সেটা হবে না। সেনাপতি মশাইকেও থাকতে হবে। ফ্রান্সিস বলল।
—তাহলে তো মাননীয় সেনাপতিকে ডাকতে হয়। পিরেল্লো বললেন।
—সে কথাই বলছিলাম। আপনি বিস্কোকে নিয়ে যান। সেনাপতিমশাইকে বলবেন রাজা হানমের গুপ্ত ধনভাণ্ডার আমরা প্রায় উদ্ধার করেছি। ফ্রান্সিস বলল।
—মিথ্যে কথা। আপনি গুপ্তধনের হদিশ পেয়েছেন। পিরেল্লো বলল।
—না। হদিশ এখনও পাই নি। ফ্রান্সিস বলল।
—তবে সেটা বলুন। পিরেল্লো বলল।
—না। গুপ্তধন সম্বন্ধে সব আপনাকে বলতে আমি দায়বদ্ধ নই। ফ্রান্সিস বলল।
—তবে কাকে বলবেন এই গুপ্তধন খোঁজার কথা? পিরেল্লো জানতে চাইল।
—বলবো মাননীয় রাজা আর সেনাপতিকে। ফ্রান্সিস বলল।
—না। আপনি আমাকে সব বলবেন। পিরেল্লো গলায় জোর দিয়ে বলল।
—আগে সব বলেছি, আমি আপনার কাছে দায়বদ্ধ নই। ফ্রান্সিস বলল।
—তাহলে আপনাদের মরতে হবে। পিরেল্লো কড়া গলায় বলল।
অতটা কব্জির জোর থাকলে আমাদের হত্যা করুন। ফ্রান্সিস শান্ত সুরে বলল।
ফ্রান্সিস কিছু বোঝার আগেই পিরেল্লো কোমর থেকে একটা বাঁকা মাথা বড় ছোরা বের করে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। অন্যমনস্ক ফ্রান্সিস ছিটকে পড়ল মেঝেয়। পিরেল্লো ছোরাটা ফ্রান্সিসের বুক লক্ষ্য করে বিঁধতে গেলে ফ্রান্সিস ঘুরে গেল আর ছোরাটা বিঁধল ওর বাঁ বাহুমূলে। রক্ত বেরিয়ে এল। বিস্কো একটা লাফ দিয়ে পিরেল্লোকে জাপটে ধরল। তারপর বুকের নীচে হাত দিয়ে ওর ছোরাটা বের করল। ফ্রান্সিস চেঁচিয়ে উঠল, ওকে হত্যা করো না। গুপ্তধনের ব্যাপারে ভাবতে-ভাবতে ওর মাথার ঠিক নেই।
বিস্কো দ্রুত ফ্রান্সিসের কাছে এল। মশালের আলোয় দেখল কাটা জায়গাটা বড় না হলেও বেশ রক্তপাত হচ্ছে। শাঙ্কো কোমরের ফেট্টি থেকে কাপড় ছিঁড়ে ফ্রান্সিসের কাটা জায়গাটা বেঁধে দিল। ফ্রান্সিসের একটু আরাম লাগল। রক্ত পড়া বন্ধ হলো।
ওদিকে পিরেল্লো দ্রুত উপরে উঠে এলেন। চার বর্শাধারীকে ডাকলেন। বললেন, দুটো চোর রাজা হানমের গুপ্তধন উদ্ধার করেছে। সেই ধনভাণ্ডার নিয়ে ওরা বাইরে আসবে। পালাতে চাইবে। ওদের পালাতে দিও না। তৈরী থাকো।
বিস্কো গলা চেপে বলল, বোঝাই যাচ্ছে এই লোকটা প্রহরীদের সাহায্যে ফ্রান্সিস আর বিস্কোকে বন্দী করবে।

এখনই প্রহরীদের আক্রমণ করবো? একজন ভাইকিং বন্ধু জানতে চাইল।

না। আগে ফ্রান্সিসরা উঠে আসুক। বিস্কো বলল।

কিছুপরে ফ্রান্সিসকে ধরে ধরে বিস্কো প্রধান দ্বার পর্যন্ত এল। এবার পিরেল্লো গলা চড়িয়ে বললেন, এই দুজনেরই কথাই বলছিলাম। ওদের হত্যা কর।

বিস্কো দ্রুত উঠে দাঁড়িয়ে চিৎকার করল, ও—হো—হো—।

প্রহরীরা বর্শা হাতে ফ্রান্সিস আর বিস্কোর দিকে ছুটে এল। বিস্কোরা প্রহরীদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। শুরু হলো লড়াই। বর্শা দিয়ে তরোয়াল ঠেকানো অসুবিধে। একবার বর্শা হাতছাড়া হলে আক্রমণকারী নিরস্ত্র হয়ে যায়। লড়াইয়ের মধ্যে ফ্রান্সিসের উচ্চস্বর শোনা গেল, ভাইসব, কাউকে হত্যা করো না। প্রয়োজনে বন্দী কর।

অল্পক্ষনের মধ্যে লড়াই শেষ। প্রহরীদের মধ্যে দু তিনজন আহত হয়ে ঘাসে ঢাকা মাঠে পড়ে রইল।

ফ্রান্সিস চারদিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে পিরেল্লোকে খুঁজতে লাগল। চাঁদের উজ্জ্বল আলোয় দেখল পিরেল্লো আর একজন প্রহরী একটা ওক গাছের তলা দিয়ে ছুটছে। ফ্রান্সিস বলল, বিস্কো আমি ছুটতে পারছি না। রক্তপড়া বেড়ে যাবে। তুমি ছুটে গিয়ে পিরেল্লোকে ধর।

বিস্কো সঙ্গে-সঙ্গে ছুটল। পলায়মান পিরেল্লো আর একজন প্রহরী তখন রাজবাড়ির পাশ দিয়ে ছুটে পালাচ্ছে। বিস্কো দ্রুত ছুটল। কিছুক্ষণের মধ্যেই বিস্কো পিরেল্লোদের কাছে এসে পড়ল। চেঁচিয়ে বলল, পিরেল্লো পালিয়ে রেহাই পাবেন না। কাজেই পালাবার চেষ্টা না করে আমাদের কাছে আসুন। ফ্রান্সিস আপনাকে ধরে নিয়ে যেতে বলেছে।

পিরেল্লো দাঁড়িয়ে পড়লেন। সঙ্গের যোদ্ধাটিও থামল। দুজনেই মুখ খুলে হাঁপাতে লাগল। বিস্কো ওদের কাছে এল। হাঁপাতে হাঁপাতে বিস্কো বলল—যদি রাজা হানমের গুপ্ত ধনভাণ্ডার আবিষ্কার করতে পারি, রাজা কানবহনাকে বলবো ধনভাণ্ডারের কিছু অংশ আপনাকে যেন দেন।

সত্যি বলছো? পিরেল্লো বললেন।

হ্যাঁ, সত্যি বলছি। আপনি ফ্রান্সিসের কাছে চলুন। আমরা আপনার কোনোরকম ক্ষতি করবো না। বরং আপনি ফ্রান্সিসকে হত্যা করতে গিয়েছিলেন সেইজন্যে আমি আপনাকে এক্ষুণি মেরে ফেলতে পারি। বিস্কো বলল।

আমার দোষ হয়ে থাকলে—পিরেল্লো বলতে গেলেন।

তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বিস্কো বলল, ঠিক আছে, আপনি ফিরে চলুন।

তিনজন ফিরে চলল মন্দিরের দিকে। মন্দিরের দরজার কাছে এসে দেখল প্রহরীরা আহত হয়ে এখানে ওখানে ঘাসের ওপর পড়ে আছে। ফ্রান্সিস কোমরের ফেট্টিতে তরোয়াল ঢুকিয়ে রেখেছে।

ফ্রান্সিস পিরেল্লোকে বলল—আপনি একটা কাজ করুন। একবার

সেনাপতিমশাইয়ের বাড়িতে যান। সেনাপতিকে বলুন—আমরা গুপ্তধন উদ্ধার করেছি। আপনি কিছু যোদ্ধাকে পাঠিয়ে দিন। নিজেও আসুন। বিস্কো বলল—ফ্রান্সিস আমি রাজপুরোহিত পিরেল্লোকে কথা দিয়েছি যে তাঁকে আমরা গুপ্তধনের কিছু অংশ দেব।

—বেশ। রাজাকে বলবো। তারপর অনুরোধ করবো। ফ্রান্সিস বলল।

ভোর হয়েছে। রাজবাড়ির পেছনে বিরাট বাগান। গাছগাছালি। পাখির ডাক শুরু হয়ে গেছে। রোদও উঠল।

পিরেল্লো আর বিস্কো সেনাপতির বাড়ির সামনে এল। বাইরের দরজা বন্ধ। একজন প্রহরী বর্শা হাতে পাহারা দিচ্ছে। প্রহরী পিরেল্লোকে দেখে মাথা একটু নুইয়ে শ্রদ্ধা জানাল। পিরেল্লো বললেন—প্রহরী সেনাপতিকে খবর দাও। খুব দরকারি কথা আছে।

প্রহরীটি দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল। পিরেল্লোদেরও ঢুকতে বলল। পিরেল্লো আর বিস্কো ঢুকল। একটা বেশ বড় ঘর। গোল শ্বেতপাথরের টেবিল ঘরের মাঝখানে। টেবিলটার চারপাশে কালো আবলুস কাঠের আসন পাতা। গদিপাতা। দুজনে বসল।

একটু পরে প্রহরী ভেতর থেকে বেরিয়ে এল। বলল—অপেক্ষা করুন। মাননীয় সেনাপতি আসছেন।

আরো কিছুক্ষণ পরে সেনাপতি এল। বিস্কোরা উঠে দাঁড়াল। সেনাপতিমশাই বসতে ইঙ্গিত করল। বিস্কোরা বসল। পিরেল্লোর দিকে তাকিয়ে বলল—কী ব্যাপার বলুন তো? এত সকালে এসেছেন।

পিরেল্লো বিস্কোকে কিছু বলার জন্যে ইঙ্গিত করলেন। বিস্কো বলতে লাগল — আমরা জাতিতে ভাইকিং। দেশে দেশে আমাদের জাহাজটায় চড়ে ঘুরে বেড়াই। কোথাও কোনো গুপ্তধনের কথা জানলে আমরা বুদ্ধি খাটিয়ে উদ্ধার করি।

—তারপর উদ্ধার করা গুপ্তধন নিয়ে পালিয়ে যান। সেনাপতি গোঁফের ফাঁকে হাসলেন।

—অনেক জায়গাতেই এই ধরনের কথা আমরা শুনেছি। কথাটা আমাদের কাছে নতুন নয়। আর একথাটা যে সত্যি নয় সেটার প্রমাণ আপনাকে দিয়ে যাবো। বিস্কো বলল।

—ঠিক আছে। এখন রাজপুরোহিত বলুন আমার কাছে এসেছেন কেন?

—এই ভাইকিংরা রাজা হানমের গুপ্তধন উদ্ধার করেছে বলে দাবি করছে। তাই একবার সব বুঝেশুনে নিতে আপনাকে যেতে অনুরোধ করেছে। পিরেল্লো বললেন।

—সত্যিই কি পেরেছে গুপ্তধন উদ্ধার করতে? সেনাপতি বললেন।

—মন্দিরে গেলেই সব জানতে পারবেন। বিস্কো বলল।

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে সেনাপতি বলল—ঠিক আছে। আপনারা যান—আমি আসছি।

বিস্কোরা ফিরে এল। ফ্রান্সিসকে বলল—সব বলা হয়নি। তবে সেনাপতি বললো যে সে আসবে।

—ফ্রান্সিস—বিস্কো ডাকল।

—হুঁ। বলো। ফ্রান্সিস বিস্কোর দিকে তাকাল।

—সত্যিই কি তুমি রাজা হানমের গুপ্তধনের খোঁজ পেয়েছো? বিস্কো বলল। ফ্রান্সিস কোমরের ফেট্টিতে রাখা একটা লম্বা চাবি বের করল। বিস্কোকে চাবিটা দেখিয়ে বলল—সমাধান। সেনাপতি মশাইকে আসতে দাও।

কিছুপরে সেনাপতি ঘোড়ায় চড়ে এল। সঙ্গে চারজন প্রহরী।

ঘোড়া থেকে নেমে সেনাপতি বলল—রাজপুরোহিত কী উদ্ধার করেছেন দেখান। পিরেল্লো ফ্রান্সিসের দিকে তাকালেন। ফ্রান্সিস এগিয়ে এসে মাথা একটু নিচু করে সম্মান জানিয়ে বলল—আমার সঙ্গে আসুন।

সবাই সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগল। ফ্রান্সিস দেখল আহত প্রহরীরা এখান থেকে চলে গেছে। ফ্রান্সিস ভাবল যাক বাঁচা গেল। কিছুক্ষণের লড়াইয়ের খবরটা সেনাপতি পায় নি।

মশালের আলোয় মন্দিরের গর্ভকক্ষে এল সবাই। ফ্রান্সিস পেছনের সাজঘর দেখিয়ে বলল—মাননীয়, গুপ্তধন রয়েছে ঐ সাজঘরে।

—তাই নাকি! সেনাপতি গলা চড়িয়ে বলল।

সেনাপতিকে নিয়ে ফ্রান্সিস আর পিরেল্লো সাজঘরে ঢুকল। ফ্রান্সিস কাঠের বেদীর কাছে এল। ফেট্টি থেকে চাবিটা বের করল। বেদীটার ওপর জড়ো করা পোশাক সরিয়ে দিল। বেদীর গায়ে চাবির ফুটো। ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে ওর চাবিটা ঢোকাতে লাগল। চাবিটা শেষ পর্যন্ত ঢুকিয়ে আসতে ডানদিকে মোচড় দিল। ডালা খুলল না।

বিস্কো দ্রুত ফ্রান্সিসের পেছনে গিয়ে দাঁড়াল। যদি গুপ্তধন দেখাতে না পারে তবে ফ্রান্সিস বিপদে পড়তে পারে। তখন সাহায্য চাই।

ফ্রান্সিসের মুখ তখন ঘেমে উঠেছে। শুধু হাতে মুখ কপাল মুছে নিয়ে ফ্রান্সিস আবার চাবিটা ঢোকাল। দুএকবার এদিক-ওদিক ঘুরিয়ে জোরে ডানদিকে মোচড় দিল। কট্। একটা মৃদু শব্দ হল। পাটাতন খুলে গেল। ফ্রান্সিস পাটাতনের ঢাকনাটা এবার খুলে ফেলল। একটা কালো চামড়ার ব্যাগমত দেখা গেল। ফ্রান্সিস ব্যাগটা তুলে বেদীর ওপর রাখল। তারপর মুখ বাঁধা সোনালি মোটা সুতোয় বাঁধা দড়িটা খুলে ফেলল। মুখটা খুলে একমুঠো সোনার চাকতি তুলে এনে বেদীতে রাখল। তারপরে বের করল একটা চারপাশে হীরে বসানো আয়না। সবাই অবাক হয়ে দেখতে লাগল। ফ্রান্সিস একটা মুক্তোর মালা তুলে দেখিয়ে সব কালো চামড়ার ব্যাগটায় ভরে রাখল। দড়ি বন্ধ করে ব্যাগটা সেনাপতিকে দিয়ে বলল—মাননীয় সেনাপতি এটাই রাজা হানমের গুপ্ত ধনভাণ্ডার। আমাদের কাজ শেষ। এবার আমরা জাহাজে ফিরে যাবো।

—সে কি। সেনাপতি বলল—ধনভাণ্ডারের কিছু অংশ তো আপনাদের প্রাপ্য।

—না। আমরা কিছু নেব না। তবে একটা অনুরোধ করছি। মাননীয় রাজাকে বলবেন এই গুপ্ত ধনভাণ্ডারের কিছু অংশ যেন রাজপুরোহিত পিরেল্লোকে দেওয়া হয়। উনি গুপ্তধনের জন্যে পাগল হয়ে উঠেছিলেন। এবার ফ্রান্সিস পিরেল্লোকে বলল—এবার দেখলেন তো গুপ্তধনের প্রতি আমাদের কোন লোভ নেই।

বিস্কো ধ্বনি তুলল—ও—হো—হো।

ভাইকিং বন্ধুরাও গলা মেলালো—ও—হো—হো।

ফ্রান্সিসরা সদর রাস্তায় এল। চলল বন্দরের দিকে। গরম হাওয়া ছুটেছে। তার মধ্যে দিয়ে ফ্রান্সিসরা হাঁটতে লাগল। বিস্কো বলল—ফ্রান্সিস।

—হুঁ। বলো।

—বলছিলাম বেশ বেলা হয়েছে। জাহাজে ফিরে আর আমাদের জন্যে রান্না করতে হবে না।

—ঠিক আছে। একটা সরাইখানা দেখ। ফ্রান্সিস বলল।

পাওয়া গেল একটা বেশ বড় সরাইখানা। ফ্রান্সিসরা সরাইখানায় ঢুকল। সবার বসার জায়গা হল না। ফ্রান্সিস সরাইওয়ালাকে গিয়ে বলল—যত তাড়াতাড়ি পারো খেতে দাও। আমরা খুব ক্ষুধার্ত। নিশ্চয়ই-নিশ্চয়ই। সরাইওয়ালা পাকা দাড়ি নেড়ে বলল। ছুটল রান্নাঘরের দিকে।

ফ্রান্সিসরা খাওয়ার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল।

চাঁদের আলো বেশ উজ্জ্বল। ডেকে দাঁড়িয়ে ফ্রান্সিস আর মারিয়া তাকিয়ে তাকিয়ে সমুদ্রের জলে চাঁদের আলোর ঝিকিমিকি দেখছিল।

সমুদ্রতীরে বিস্তৃত বনভূমি। ফ্রান্সিসের জাহাজ বনভূমির কাছে এল।

পেড্রো একটা গাছের মোটা ডালের সঙ্গে মাস্তুলের টানা দাঁড় বাঁধল ও আর নোঙর ফেলল না। জাহাজ আর বনভূমির ভেতরে ঢুকল না।

পেড্রো মাস্তুল থেকে নেমে এল। ফ্রান্সিসকে বলল— বনের মধ্যে আর জাহাজ ঢোকালাম না।

—ঠিক আছে। ফ্রান্সিস বলল।

রাত বাড়ল, সে আসার জন্য হাঁকডাক শুরু হল।

রাতের খাওয়া দাওয়া শেষ হল। আজকে বেশ গরম পড়েছে। সমুদ্রের হাওয়ারও তেমন জোর নেই।

খালাশিরা অনেকেই ডেকের ওপরই শুয়ে পড়ল। কিছুক্ষণের মধ্যে ঘুমিয়েও পড়ল।

ফ্রান্সিসরা এখনও জানে না কী বিপদের মুখে ওরা জাহাজ বেঁধেছে।

ঐ বনভূমির ওপাশে ঘন গাছের আড়ালে নোঙর করা ছিল একদল জলদস্যুর জাহাজ। ফ্রান্সিসদের সাড়া পেতেই জলদস্যুরা সব চুপ করে গেল। নিঃশব্দে চলল ওদের চলাফেরা। কারো মুখে কথা নেই।

নিস্তব্ধ রাত। শুধু সমুদ্রের বাতাসের শন্ শন্ শব্দ। সময় বুঝে জলদস্যুনেতা ওদের জাহাজটা জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে আস্তে আস্তে চালিয়ে ফ্রান্সিসদের জাহাজের কাছে নিয়ে এল। এত নিঃশব্দে যে ফ্রান্সিসরা বুঝতে পারল না। ফ্রান্সিসরা তখন নিশ্চিন্তে ঘুমুচ্ছে।

জলদস্যুরা নিঃশব্দে ফ্রান্সিসদের জাহাজে উঠতে লাগল। ডেকের ওপর ঘুমিয়ে-থাকা ভাইকিংদের কাছে বিস্ময় শালকাদের পিঠে-বুকে তরোয়ালের খোঁচা দিতে লাগল। শাঙ্কোদের ঘুম ভেঙে গেল। তাকিয়েই দেখে জলদস্যুর দল। ওরা স্বপ্নেও ভাবেনি আবার জলদস্যুদের পাল্লায় পড়বে। ভাইকিংরা আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াতে লাগল। জলদস্যুদের জনাকয়েক নিচে কেবিন ঘরে নেমে গেল। দুজন খোলা তরোয়াল হাতে অস্ত্রঘরের সামনে দাঁড়াল যাতে ফ্রান্সিসরা অস্ত্র না নিতে পারে।

জলদস্যুরা ভাইকিংদের সারি বেঁধে দাঁড় করাল কেবিনঘর থেকে সবাইকে বন্দী করে নিয়ে এল। ফ্রান্সিস মারিয়াও এল।

জলদস্যুপতি বলল—তোমাদের দলনেতা কে?

ফ্রান্সিস এগিয়ে এসে বলল—আমি।

—তোমরা বিদেশী?

—হ্যাঁ। আমরা ভাইকিং।

—তা তোমাদের কথা শুনেছি। জাহাজ চালাতে আর তরোয়াল চালাতে তোমরা ওস্তাদ। সমুদ্রের সঙ্গে তোমাদের নাড়ির যোগ। একটু থেমে জাহাজের চারদিকে তাকিয়ে জলদস্যুনেতা বলল—তোমাদের তো ভিখিরির দশা। তোমাদের জাহাজ লুঠ করে কিছুই পাবনা।

দলনেতা এবার মারিয়ার দিকে তাকাল। বলল—এ কে?

—আমাদের দেশের রাজকুমারী। হ্যারি বলল।

—তা এখানে কেন?

—আমাদের দলনেতা এঁর স্বামী। কাজেই স্বামীর সঙ্গেই তিনি যাবেন। হ্যারি বলল।

—আগে হলে এর কাছ থেকে গয়নাগাঁটি পাওয়া যেত। এখন তো ভিখারিনী। দলনেতা থামল। তারপর বলল—না-না। গলায় সোনার হার আছে। দলপতি মারিয়ার দিকে হাত বাড়াল। মারিয়া ওর হাত সরিয়ে দিল। দলনেতা দ্রুত হাত বাড়িয়ে হারটা ছিঁড়ে নিল। মারিয়া কেঁদে উঠল। ফ্রান্সিস মৃদুস্বরে বলল—কান্নাকাটি করো না। দলনেতা গলা বাড়িয়ে বলল সবাইকে আমাদের ক্যারাভেল জাহাজে নিয়ে চল। সবচেয়ে নিচের কয়েদঘরে বন্দী করে রাখো। ফ্রান্সিস চেঁচিয়ে বলল—আমরা কী অপরাধ করেছি যে আমাদের বন্দী করবে?

দলনেতা হো হো করে হেসে উঠল। বলল—শোন তাহলে তোমাদের নিয়ে ক্রীতদাস বেচাকেনার হাটে নিয়ে যাবো। য়ুরোপীয় ক্রীতদাস তো পাওয়া যায় না। তোমাদের জন্য ভালো দাম পাবো। তার ওপর রয়েছে তোমাদের রাজকুমারী। ক্রীতদাসী হিসেবে দারুণ দাম পাবো। শাঙ্কো ওদের দেশিয় ভাষায় বলল—ফ্রান্সিস—লড়াই। ফ্রানিস মাথা নাড়ল। বলল—আমরা কি এখনও নিরস্ত্র সহজেই হেরে যাবো।

—এদের সবকটাকে কয়েদ ঘরে ঢোকাও জলদস্যুপতি বলল। ফ্রান্সিস বলল—না। আমাদের রাজকুমারীকে ঐ নরককুণ্ডে রাখা চলবে না।

—তাহলে তো এখানে রাজপ্রাসদে নিয়ে আসতে হয়। জলদস্যুপতি বলল।

—তার দরকার নেই। উনি আমাদের জাহাজে থাকবেন। ফ্রান্সিস বলল।

—যদি পালিয়ে যায়, জলদস্যুপতি বলল।

—উনি একা সমুদ্র সাঁতরে পার হবেন অসম্ভব? ফ্রান্সিস বলল।

—ঠিক আছে তাই থাকবে। জলদস্যুপতি বলল।

মারিয়ার ক্ষেত্রে এই ব্যবস্থাটা হতে ফ্রান্সিস খুশি হল। এবার পালানোর ধান্দা। কিন্তু ঐ নরক থেকে কি পালানো সম্ভব? চেষ্টা চালিয়ে দেখতে হবে।

ফ্রান্সিসদের নিয়ে চলল জলদস্যুরা। একেবারে নিচেরতলায় কয়েদখানা।

প্রহরীরা কয়েদখানার লোহার দরজার বড় বড় তালা খুলল। সশব্দে দরজা খোলা হল। ফ্রান্সিসরা দলবেঁধে ঢুকল।

লোহার দরজা বন্ধ করা হল। অন্ধকার ঘরে দুটো মশাল জ্বলছে। ফ্রান্সিসরা বসে পড়ল। ফ্রান্সিস শুয়ে পড়ল। ও দেখল ওদের আগেও চারপাঁচজন কয়েদী আছে। তাদের মধ্যে একজন বৃদ্ধ। একে বন্দী করেছে কেন? ক্রীতদাস কেনা বেচার হাটে এই বৃদ্ধের কী মূল্য?

ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে সেই বৃদ্ধের কাছে গেল। পাশে গিয়ে বসল। বলল—আপনি এখানে কতদিন বন্দী আছেন?

—হিসাব করে বলতে পারবো না। তবে দীর্ঘদিন। বৃদ্ধ বলল।

—আপনাকে নিয়ে ওরা কি করবে? ক্রীতদাস কেনাবেচার হাটে আপনার কোন মূল্যই নেই। ফ্রান্সিস বলল।

—কী জানি। কেন যে ওরা আমাকে এভাবে ফেলে রেখে দিয়েছে তা ওরাই জানে। বৃদ্ধ বলল।

—আপনাকে ছেড়ে দেওয়া উচিত। ফ্রান্সিস বলল।

—এরা উচিত অনুচিতের ধার ধারে না। বৃদ্ধ বলল।

ফ্রান্সিস বন্ধুদের কাছে ফিরে এল। জলদস্যুদের এই ক্যারাভেল জাহাজের বন্দীশালা যে কী ভয়াবহ তার অভিজ্ঞতা ফ্রান্সিসদের আছে। ফ্রান্সিস ভাবল যে ভাবেই হোক এই বন্দীশালা থেকে পালাতে হবে। কিন্তু কীভাবে? ও এটাও স্থির করল প্রহরীদের সঙ্গে লড়াই করে পালাতে হবে। নিরস্ত্র অবস্থায় লড়তে গেলে হয়তো পালানো যাবে কিন্তু তাতে কিছু বন্ধুর জীবন যাবে। ও ভাবল—এই ব্যাপারে বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলা যাক। ও বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে বলল—ভাইসব একটা কথা বলছিলাম। এই কয়েদঘরে আমাদের জীবন শেষ করতে আমি রাজি নই। তাই বলছিলাম চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে হবে। আমরা প্রহরীদের সঙ্গে লড়াই করে পালাবো। কিন্তু সেটা করতে গেলে কিছু বন্ধুর প্রাণ যাবে। তোমরা কজন প্রাণ দিতে রাজি বল।

বন্ধুরা ফ্রান্সিসের কথা শুনে বেশ অবাকই হল। ফ্রান্সিস এভাবে বলছে কেন? ফ্রান্সিস বলল—এখানে থাকলেও আমাদের প্রাণ যাবে। সুতরাং আগে থেকে মৃত্যু বরণ করে কয়েকজন বন্ধুর জীবনের বিনিময়ে আমরা পালাতে পারবো।

—কিন্তু ফ্রান্সিস তুমি শুধু আমাদের মুক্তির কথা ভাবছো রাজকুমারী মারিয়ার কী হবে? হ্যারি বলল।

—আমরা মুক্তি পেলে মারিয়াকেও মুক্ত করতে পারবো। ফ্রান্সিস বলল।

—সেক্ষেত্রে সমস্ত জলদস্যুদের লড়াইয়ে হারাতে হবে। সেটা কি পারবে? শাঙ্কো বলল।

—একটা তরোয়াল হাতে পেলে পারবো। ফ্রান্সিস বলল। বন্ধুরা চিন্তায় পড়ল। ফ্রান্সিস এরকম সিদ্ধান্ত নিচ্ছে কেন বুঝে উঠতে পারল না। আসলে ফ্রান্সিস অধৈর্য হয়ে উঠেছিল।

বন্ধুরা কয়েকজন বলে উঠল—ফ্রান্সিস তুমি যদি বল আমরা প্রাণ দিতে রাজি।

—তাহলে সেভাবেই তৈরি থাকব। লড়াই হবেই। ফ্রান্সিস বলল।

লোহার দরজাটার ঢং ঢং শব্দ হল। প্রহরীরা খাবার নিয়ে এসেছে। দরজা খুলে দুজন প্রহরী খোলা তরোয়াল হাতে দরজার দুপাশে দাঁড়াল। বাকি দুজন প্রহরী খাবার নিয়ে ঢুকল। ফ্রান্সিসদের সামনে একটা করে গোল পাতা পেতে দিল। তারপর দুজনে মিলে খাবার দিল। পোড়া রুটি। তরিতরকারির ঝোল আর মাছ। ফ্রান্সিসরা খেতে লাগল। ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে সেই একই কথা বলল—পেটপুরে খাও। ভালো না লাগলেও খাও। শরীর ঠিক রাখো।

খাওয়া শেষ। প্রহরীরা এঁটো পাতা নিয়ে চলে গেল। দরজা বন্ধ হল।

ফ্রান্সিসরা শুয়ে বসে সময় কাটাতে লাগল।

ফ্রান্সিস বৃদ্ধটির কাছে গেল। কথাইবা বলে সময় কাটানো। বৃদ্ধটি শুয়ে ছিল, ফ্রান্সিস কাছে আসতে উঠে বসল। ফ্রান্সিস বলল—আপনার দেশ কোথায়?

—পর্তুগাল।

—কী করে বন্দী হলেন?

—সে অনেক কথা। আমাদের জাহাজ জলদস্যুরা লুঠ করল। সবাইকে বন্দী করল। তারপর ক্রীতদাসের বেচাকেনার হাটে অনেককে বিক্রি করল। আমার তখন প্রচণ্ড জ্বর। অসুস্থ মানুষকে কে কিনবে? আমি বেঁচে গেলাম। আমাকে যতবারই ঐসব হাটে নিয়ে গেছে আমি হাত পা ভাঙার ভান করেছি। খরিদদার একজন হাত পা ভাঙা মানুষকে কিনবে কেন? জলদস্যুরা যত বলে আমি সুস্থ আমি ততবারই হাত পা ভাঙার ভান করি। এভাবেই আমি বেঁচে গেলাম। অবশ্য যদি এই নরককুণ্ডে থাকাকে তুমি বেঁচে থাকা বলো।

—আপনি কখনও পালাবার চেষ্টা করেন নি। ফ্রান্সিস জিজ্ঞাসা করল।

—না। সেটা অসম্ভব। বৃদ্ধ বলল। তারপর দরজার দিকে একবার দেখে নিয়ে বলল—আমি একটা কাজ অনেকদূর এগিয়ে রেখেছি। বাকিটা পারবে?

ফ্রান্সিস চমকে উঠল। বলল কী কাজ?

—জাহাজের তলায় যে জোড়া থাকে আমি দীর্ঘদিন ধরে তা ঘষে ঘষে পাতলা করেছি। বৃদ্ধ বলল।

—সত্যি? ফ্রান্সিস চমকে উঠল। বৃদ্ধ কী বলছে?

—হ্যাঁ এই লোহার হাতল দিয়ে। বৃদ্ধ একটা লোহার হাতল পাশ থেকে দেখাল। তারপর বলল—ঐ জোড় একবারে পাতলা হয়ে গেছে। এখন শক্ত কিছু দিয়ে চাড় দিতে পারলে জোড় খুলে যাবে। মানুষ বেরোবার মত ফাঁক অনায়াসে করা যাবে।

স্থান কাল ভুলে ফ্রান্সিস ধ্বনি তুলল—হো হো হো। বন্ধুরা অবাক। সঙ্গে ওরাও অবশ্য ধ্বনি তুলল। সবাই ফ্রান্সিসের কাছে এল। ফ্রান্সিস চাপা গলায় বলল—এখন কিছু বলা যাবে না। সব পরে বলছি।

ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়াল। চারিদিকে তাকিয়ে দেখে নিল। প্রহরীরা দরজা থেকে দূরে ওদের দৃষ্টির আড়ালে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে আড্ডা দিচ্ছে।

—চলুন। দেখান ব্যাপারটা। ফ্রান্সিস বৃদ্ধকে বলল। বৃদ্ধ উঠে দাঁড়াল। দুজনে নিচে নেমে এল। বৃদ্ধ জোড়ের জায়গাটায় এল। আলো খুবই কম। তার মধ্যেই বৃদ্ধ জোড়াটা দেখাল ফ্রান্সিস হাতে দিয়ে দেখল—সত্যি জোড়ের মুখটা পাতলা লাগছে। ও বুঝল শক্ত লোহার শাবল দিয়ে চাড় দিলে জোড় খুলে যাবে। এবার শেষ সমস্যা একটা লোহার শাবল। এটা জোগাড় করা সম্ভব নয়। তবে চেষ্টা করতে হবে।

ফ্রান্সিস এবার প্রহরীদের একবার দেখে নিল? ওরা ধারে কাছে নেই। ও এবার বন্ধুদের কাছে ডাকল। তারপর সমস্ত ঘটনাটা বলল। তারপর বলল—এখন সমস্যা একটা শাবলের মত লোহার।

হ্যারি বলল—প্রহরীরা যে লোহার ডাণ্ডাটা দিয়ে শব্দ করে ওটা ওখানে ঝোলানো থাকে। ওটা হলে হবে তো?

সাঙ্কো সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়ল। দরজার কাছে গেল। ঝুলিয়ে রাখা লোহার ডাণ্ডাটা নিয়ে এল। দেখা গেল এটার মুখ ভোঁতা। হবে না।

হ্যারিই এবার বুদ্ধি দিল। বলল—যদি একটা তরোয়াল পাওয়া যায় তাহলে ব্যাপারটা অনেক সহজ হয়ে যায়। তরোয়ালের চাড় দিলে ফাঁক বাড়ানো যাবে।

—কিন্তু তরোয়াল পাবো কোথায়? বিস্কো বলল।

—চাইলে প্রহরীরা দেবে না? শাঙ্কো বলল।

—অসম্ভব—ফ্রান্সিস বলল—তাছাড়া তরোয়ালটা অনেকক্ষণ আমাদের কাছে রাখতে হবে। অত সময় পাবো না।

এবার হ্যারি বলল—শোন। আমি একটা উপায় বলছি। আমরা দস্যুনেতাকে বলবো যে আমাদের তরোয়াল পূজোর একটা রীতি আছে। দুটো তরোয়াল আমাদের দিতে হবে। একদিন একরাত ধরে পূজো হবে। পূজো হয়ে গেলে তরোয়াল ফেরত দেব।

—সাবাস হ্যারি। এটাই একমাত্র পথ। ফ্রান্সিস বলল।

ফ্রান্সিস প্রহরীদের ডাকলেন প্রহরী এগিয়ে এল।

ফ্রান্সিস বলল—তোমাদের দলনেতাকে বল আমি একটা অত্যন্ত দরকারি কথা বলবো।

—কী কথা? প্রহরী বেশ আয়েসি ভঙ্গীতে বলল।

—মুণ্ডু। ফ্রান্সিস বলল।

—এ্যাঁ? প্রহরী চমকে উঠল।

—আমার কথা হবে দলনেতার সঙ্গে। তুমি কে হে? ফ্রান্সিস বলল।

—না। না মানে—প্রহরী আমতা আমতা করতে লাগল।

—যাও। দলনেতাকে আসতে বল। ফ্রান্সিস হুকুমের সুরে বলল। প্রহরী চলে গেল।

কিছু পরে দলনেতা এল। দাঁত ছড়িয়ে হেসে বলল—

—কেমন আছো সব?

—খুব ভালো। শাঙ্কো বলল।

—হ্যাঁ শরীরটা ঠিক রাখো। এবার থেকে মাংসও খেতে দেওয়া হবে। দলনেতা বলল।

—তাহলে তো খুবই ভালো। হ্যারি বলল।

এবার ফ্রান্সিস বলল—একটা দরকারি কথা ছিল।

—বলো। দলনেতা উৎসুখ মুখে ফ্রান্সিসের দিকে তাকাল।

—আমাদের দেশের একটা রীতি আছে—তরোয়াল পুজো। ফ্রান্সিস বলল।

—সে আবার কী? দলনেতা বেশ আশ্চর্য হলো।

—বীরত্বের পূজো। সেটা আমরা এখানে করবো। তার জন্য দুটো তরোয়াল লাগবে। ফ্রান্সিস বলল।

—বেশ তো দুটো তরোয়াল নিও। তবে আগেই বলছি, পালাবার মতলব থাকলে কেউ রেহাই পাবে না। দলনেতা চড়া গলায় বলল।

—পালাবার মতলব থাকলেই কি পালাতে পারবো। আপনার কয়েদখানা থেকে পালানো প্রায় অসম্ভব। শাঙ্কো বলল।

—প্রায় অসম্ভব মানে? একেবারে অসম্ভব। দলনেতা বলল।

ফ্রান্সিস সাবধান হল। বলল—ঐ একই কথা। এবার দুটো তরোয়াল দিন।

—পূজো হবে কখন? দলনেতা জিজ্ঞেস করল।

—সন্ধ্যে থেকে শুরু হবে। সারারাত চলবে। হ্যারি বলল।

—ও। জলদস্যুপতি আস্তে আস্তে চলে গেল। যাবার সময় একজন—প্রহরীকে বলল—ওদের দুটো তরোয়াল দে। প্রহরী দুটো তরোয়াল দিল।

সন্ধ্যের একটু পরেই ফ্রান্সিসরা দুটো জ্বলন্ত মশালই খুলে নিল। তরোয়াল মশাল নিয়ে চলল নিচে খোলের দিকে। প্রহরীরা বলল—কী ব্যাপার? তোমাদের পূজো কোথায় হবে?—নিচে। সেলে। মশাল লাগাব। বিস্কো বলল।

নিচে খোলে নেমে এল ওরা। দুজন দুদিকে মশাল ধরে রইল। ফ্রান্সিস একমুহূর্ত দেরি করল না। একটা তরোয়ালের মাথা পাতলা জোড়টায় ঢুকিয়ে দিল। শাঙ্কো একটু দূরে আর একটা তরোয়ালের মাথা ঢোকাল। এবার আস্তে আস্তে চাড় দিতে লাগল। জোড় খুলে যেতে লাগল। খুলতে খুলতে একজন মানুষের শরীরের সমান হল।

সকালের আলো দেখা গেল—নিচে বালি। ফ্রান্সিস চাপা স্বরে বলল—শেষ সমস্যাটা মিটল। ভেবেছিলাম জলের মধ্যে পড়ব। এখন সহজেই নেমে যাওয়া যাবে। কিন্তু ফাঁক তো বেশি নয়। বেশ টেনে হিঁচড়ে শরীরটা জাহাজের নিচে থেকে বের করে আনতে হল। হাতপা কেটে গেলেও তবু মুক্তি। এখন সহজেই নিয়ে যাওয়া যাবে। কিন্তু ফাঁক যে বেশি নয়। তবু আস্তে আস্তে সবাই বেরিয়ে এল।

ভাইকিংরা মশাল নিভিয়ে দিল। বৃদ্ধকে ধরাধরি করে বাইরে আনল।

সবাই একত্র হল।

আকাশের চাঁদ উজ্জ্বল। চারদিক মোটামুটি স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। জলদস্যুদের

জাহাজটার সঙ্গে ওদের জাহাজ দড়ি দিয়ে বাঁধা। এবার নিজেদের জাহাজ চালিয়ে পালানো।

সবাই জলে নামল নিঃশব্দে সাঁতরে চলল ওদের জাহাজের দিকে।

ফ্রান্সিস শাঙ্কোকে নিয়ে হাল বেয়ে বেয়ে ওপরে উঠল। তখনই দেখল কয়েকজন জলদস্যু মাস্তুলের নিচে বসে আছে। ফ্রান্সিস গলা নামিয়ে বলল—শাঙ্কো তরোয়াল দুটো আনো। শাঙ্কো নিচের দিকে তাকিয়ে তরোয়াল দিতে বলল।

একটু পরেই দুজনে তরোয়াল হাতে পেল। ফ্রান্সিস চাপা স্বরে বলল—এরা নরঘাতক। নিরীহ মানুষ নির্বিকারে হত্যা করে। এদের ওপর দয়া দেখানোর কোন মানে হয় না। দুটোকে খতম কর। বাকি দুটোকে দড়ি দিয়ে বাঁধো। তারপর কিছুদুরে গিয়ে জলে ফেলে দাও। এখানে ফেললে শব্দ হবে। জলদস্যুরা টের পাবে।

ফ্রান্সিস আর শাঙ্কো খোলা তরোয়াল হাতে জলদস্যুদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। ওরা ভুত দেখার মত চমকে উঠল। ওরা তরোয়াল খোলার আগেই ফ্রান্সিস একজনের বুকে তরোয়াল ঢুকিয়ে দিল। সে ডেকের ওপর গড়িয়ে পড়ল। অন্যজন ততক্ষণে তরোয়াল তুলেছে। শাঙ্কো দ্রুত দুপা সরে গিয়ে তরোয়ালের কোপ বসালো ওর মাথায়। জলদস্যুটি মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল।

অন্য দুজনের সঙ্গে তরোয়ালের লড়াই চলল। ফ্রান্সিস জলদস্যুটির সঙ্গে হালকা চালে তরোয়াল চালাতে লাগল। ও চাইছিল জলদস্যুদের ক্লান্ত করতে। তাহলে সহজেই বন্দি করা যাবে।

লড়াই চলল। যে জলদস্যু ফ্রান্সিসের সঙ্গে লড়াই করছিল সে হঠাৎই লড়াই থামিয়ে হাঁ করে শ্বাস নিতে লাগল। ফ্রান্সিস দ্রুত ওর তরোয়াল দিয়ে জলদস্যুটির তরোয়ালে ঘা মারল। জলদস্যুর তরোয়াল ছিটকে পড়ল। মাস্তুলের গা থেকে ছেঁড়া দড়ি এনে ফ্রান্সিস ওর হাত বেঁধে ফেলল। অন্য জলদস্যুটিকে সঙ্গে তখন শাঙ্কোর তরোয়ালের লড়াই চলছে। শাঙ্কো তক্কে তক্কে রইল ওর পায়ে তরোয়ালের ঘা মারতে। সুযোগ পেয়ে গেল, শাঙ্কো হঠাৎ এক লাফে ওর সামনে গিয়ে হাজির হল। জলদস্যুটি হকচকিয়ে গেল। শাঙ্কো এক মুহূর্ত দেরি না করে ওর পায়ে তরোয়াল চালাল। পা কেটে গেল। জলদস্যু পা টিপে বসে পড়ল। শাঙ্কোও ফ্রান্সিসের দেখা দেখি মাস্তুল থেকে ছেঁড়া দড়ি নিয়ে জলদস্যুটির হাত বেঁধে ফেলল। হাত বাঁধা দুজনে ডেকের ওপর বসে রইল।

ততক্ষণে বন্ধুরা জাহাজে উঠে পড়েছে। ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে বলল—যত দ্রুত সম্ভব জাহাজ ছাড়। দাঁড়ঘরে যাও। দাঁড় টানা শুরু কর। পাল খাটাও। কিন্তু কোনরকম শব্দ যেন না হয়। সব কাজ নিঃশব্দে করতে হবে। জলদস্যুদের জাহাজে হৈচৈ শুরু হয়েছে। ওরা এতক্ষণ বুঝতে পেরেছে যে আমরা পালিয়েছি। সব জলদি।

অল্পক্ষণের মধ্যেই ফ্রান্সিসদের জাহাজের পাল ফুলে উঠল। জাহাজ গতি পেল। জলদস্যুদের জাহাজ পেরিয়ে যাবার সময় শাঙ্কো চার জলদস্যুকে দুহাতে ধরে ঘোরাতে ঘোরাতে সমুদ্রে ছুঁড়ে ফেলল।

ফ্রান্সিস চারদিকে তাকাল। মারিয়া কোথায়? মারিয়া ডেকে উঠে আসেনি। ফ্রান্সিস চিন্তায় পড়ল ও দ্রুত সিঁড়ি বেয়ে নিজেদের কেবিনঘরে এসে দেখল দরজা খোলা। ফ্রান্সিস এক লাফে ঘরে ঢুকল। দেখল মারিয়া চাদর জড়িয়ে শুয়ে আছে। দুচোখ বোঁজা। ফ্রান্সিস দ্রুত কাছে এসে ডাকল মারিয়া-মারিয়া। মারিয়া চোখ মেলে তাকাল। হাসল।

—কী হয়েছে তোমার?

—জ্বর হয়েছে। তবে ভাল আছি। মারিয়া বলল।

ফ্রান্সিস মারিয়ার কপালে গলায় হাত বুলোল। গা পুড়ে যাচ্ছে জ্বরে।

ফ্রান্সিস বলল—কী বলছো? সাংঘাতিক জ্বর। আমি ভেনকে ডেকে আনছি।

একটু পরে ভেন এল। হাতে দুটো বোয়াম। ন্যাকড়া, দুটো পাথর। ভেন মারিয়ার কপালে হাত রাখল।

ঝোলা থেকে দুটো শুকনো ফুল বের করল। পাথর দুটো চেপে ফল দুটো গুঁড়ো করল। ন্যাকড়ায় ছাঁকল জল মিশিয়ে হাতের তালুতে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তিনটে বড়ি বানাল। মারিয়ার হাতে দিয়ে বলল—এখন একটা খান। রাত্রে একটা খাবেন। কাল সকালে একটা খাবেন। মারিয়া বড়ি তিনটে নিল ফ্রান্সিস কাঠের গ্লাসে জল নিয়ে এল। মারিয়া একটা বড়ি নিলো।

ভেন চলে গেল। যাবার সময় বলে গেল—কিছুনা। ঠাণ্ডা লেগেছে।

—তাই হবে। কাল রাত্রে অনেকক্ষণ ডেকএর ওপর ছিলাম। ঠাণ্ডা হাওয়ায় ঠাণ্ডা লেগেছে। তবু ফ্রান্সিসের চিন্তা গেল না। এই বিদেশে এমন কঠিন অসুখ করলে মারিয়াকে বাঁচানোই যাবে না। মারিয়ার কপালে সারা রাত ফ্রান্সিস জলপট্টি লাগল। ভেন এর ওষুধে কাজ হল। পরদিন সন্ধ্যে নাগাদ মারিয়া সুস্থ হল।

সেই বৃদ্ধ লোকটিকে ফ্রান্সিসরা নিজেদের জাহাজেই তুলে নিয়েছিল। ফ্রান্সিসদের সঙ্গেই রইল।

দিন কয়েক পরে

সেদিন ফ্রান্সিস ফ্রেজারের কাছে এল। বলল—ফ্রেজার কিছু দিক ঠিক করতে পারলে?

—কিছু না। বলতে পারো একেবারে আন্দাজে চলছে জাহাজ।

—শুধু উত্তরেদিকটা ঠিক রাখো। ফ্রান্সিস বলল।

—তাই বা পারছি কই। ফ্রেজার বলল।

—এ ছাড়া কোন উপায় নেই। দেখি ধারে কাছে কোন দেশ দ্বীপ পাই কি না। পেলে দিক চেনাটা সহজ হবে। ফ্রান্সিস বলল।

চারপাঁচদিন পরের কথা। সেদিন দুপুরে নজরদার পেড্রো চেঁচিয়ে বলল—আমাদের দেশের এক জাহাজ যাচ্ছে। জাহাজে দেশের পতাকা উড়ছে। ফ্রান্সিসকে বলো। বিস্কো সঙ্গে সঙ্গে ফ্রান্সিসের কেবিনঘরে এল, বলল—আমাদের দেশের একটা জাহাজ আমাদের জাহাজের খুব কাছে। ওদের সঙ্গে কথা বলব?

—নিশ্চয়ই। দেশবাসী বলে কথা। চলো ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়াল।

—আমাদের কাছে যে কোন পতাকাই নেই। ওরা বুঝতে পারেনি। বিস্কে বলল।

—আমাদের জাহাজে অনেকদিন আগেই ছিঁড়ে উড়ে গেছে। ফ্রান্সিস বলল।

ফ্রেজার তাদের জাহাজ নতুন জাহাজের কাছাকাছি আনল। ফ্রান্সিস চিৎকার করে বলল—ভাই তোমরা কি ভাইকিং? ভাইকিং দেশ থেকে এসেছো?

—হ্যাঁ। ঐ জাহাজের একজন গলা চড়িয়ে বলল। ফ্রান্সিসদের জাহাজের ভাইকিং বন্ধু ধ্বনি তুলল—ও হে বো। ঐ জাহাজ থেকেও ভাইকিংরাও গলা মেলাল। সবাই আনন্দ করতে লাগল।

জাহাজ দুটো গায় গায় লাগল। ফ্রান্সিস লাফিয়ে ঐ জাহাজে গেল। ভাইকিংদের দিকে তাকিয়ে বলল—তোমাদের দলনেতা। এজন বেশ শক্তসমর্থ যুবক এগিয়ে এল। বলল—আমি। ডেভিড।

—আমি ফ্রান্সিস তোমরা এদিকে এসেছো কেন? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—ব্যবসা করি আমরা। বড় বড় বন্দর থেকে দড়িপালের কাপড় সস্তায় কিনে বিভিন্ন ছোট ছোট বন্দরে বিক্রি করি।

—তোমরা গুপ্তধনের সন্ধান করো না? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—না-না। ডেভিড মাথা নাড়ল।

—আমরা তাই করি। অনেক গুপ্তধন আমরা আবিষ্কার করেছি। দেশে দেশে ঘুরে বেড়াতে, গুপ্তধন খুঁজে বের করতে আমরা আনন্দ পাই। ফ্রান্সিস বলল।

—বদলে তোমরা কি পাও? ডেভিড জানতে চাইল।

—কিছুই না। ফ্রান্সিস বলল।

—সে কি কত কষ্ট করে গুপ্তধন খুঁজে বের করলে অথচ বিনিময়ে কিছুই নাও না। ডেভিড বলল।

—হ্যাঁ। ওটাই আমাদের নীতি। ফ্রান্সিস বলল।

—তাহলে তো বহু দেশ ঘুরেছো? ডেভিড বলল।

—অনেক অনেক দেশ। ফ্রান্সিস বলল।

—দেশে ফিরবে না? ডেভিড জানতে চাইল।

—সেটাই আর হয়ে উঠবে না। ফ্রান্সিস বলল।

ডেভিড হঠাৎ বলল—দাঁড়াও দাঁড়াও। তুমি তোমার নাম বললে ফ্রান্সিস।

—হ্যাঁ। ফ্রান্সিস মাথা ওঠানামা করল।

—তুমি আর তোমার বন্ধুরাই কি সোনার ঘণ্টা উদ্ধার করেছো? ডেভিড বলল।

—হ্যাঁ। ফ্রান্সিস বলল।

—আমরা রাজবাড়িতে দেখেছি। ডেভিড বলল। তোমাদের বীরত্বের কথা সারা দেশ জানে। তোমাকে চিনতে আমার দেরি হল এজন্য মাফ কর। ডেভিড বলল।

—না না ওতে কী? তোমরা কবে দেশে ফিরবে? ফ্রান্সিস বলল।

—মাস ছয়েক পরে। ডেভিড বলল।

—আমরাও দেশে ফেরার চেষ্টা করছি। কিন্তু সমুদ্রপথ হারিয়ে কোথায় যে যাচ্ছি তার ঠিক নেই।

—সোজা উত্তরমুখো জাহাজ চালাও—দেশে পৌঁছুতে পারবে। ডেভিড বলল।

অন্য জাহাজের ভাইকিংরা এতক্ষণে ফ্রান্সিসের কথা জেনে গেছে। ওরা দলবেঁধে এসে ফ্রান্সিসের সঙ্গে করমর্দন করে গেল। ফ্রান্সিস জিজ্ঞেস করল—তোমরা কোথা থেকে ফিরছ?

—ঐ যে পাহাড়ি দ্বীপ হিচকক ওখান থেকে আসছি। ডেভিড বলল।

—এখন ওখানকার রাজা কে? ফ্রাসিস জানতে চাইল।

—রাজা সামুল। ভীষণ রগচটা না? কারো কথায় ব্যবহারে একটু এদিক ওদিক দেখলেই কয়েদ ঘর। আমাদেরও ধরেছিল। বলেছিল—নিশ্চয়ই তোমাদের জাহাজে অস্ত্রশস্ত্র আছে।

বললাম—আমরা ব্যবসায়ী মানুষ। অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে আমরা কী করব? বিশ্বাস করল না আমাদের জাহাজ তল্লাসী করল। বিপদ হল—আমরা তরোয়াল বর্শা তৈরি করি জমা করি। বিক্রি করি। একটা ঘরে এসব জমা রাখতাম। কিন্তু সেসব পাচার করার সময় পেলাম না। ধরা পড়ে গেলাম। রাজা মামুলির সে কি রাগ। আমাদের এই মারে তো সেই মারে। আমাদের পাঁচদিন কয়েদঘরে আটকে রাখলো পরে কী ভেবে কে জানে আমাদের সমস্ত অস্ত্রপাতি নিয়ে আমাদের মুক্তি দিল।

মুক্তি পেয়ে আমরা আর জাহাজে ফিরলাম না। কখন আবার আমাদের ধরে। উঠলাম গিয়ে এক সরাইখানায়।

সেখানে এক আশ্চর্যজনক ঘটনা শুনলাম। সেদিন গভীর রাত। ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। কে গোঙাচ্ছে। কে? সরাইখানায় অনেকেই ঘুমিয়ে আছে। শুনলাম একটা কোণ থেকে কাতরানোর শব্দ ভেসে আসছে। একটু দেখতে হয়। কী ব্যপার? বিছানা ছেড়ে উঠলাম। সেইদিকে গেলাম। একটা আলোঅন্ধকারে দেখলাম এক বৃদ্ধ শুয়ে গোঙাচ্ছে। বৃদ্ধের মুখের ওপর ঝুঁকে বললাম—আপনি কি অসুস্থ? বেশ কষ্ট করে বৃদ্ধ বলল—হ্যাঁ। আমি বাঁচবোনা। কথাটা মিথ্যে নয়। সত্যিই বৃদ্ধ গুরতর অসুস্থ। বৃদ্ধ হাঁপাতে হাঁপাতে বলল—আমার কাছে একটা জিনিস আছে। সেটা কাকে দিয়ে যাবো তাই আমার চিন্তা।

—সেটা কী? আমি জানতে চাইলাম।

—একটা পেতলের মাপকাঠি। বৃদ্ধ বলল—

—একটা মাপকাঠি নিয়ে এত ভাবছেন কেন? আমি বললাম।

—সব ঘটনা শুনলে তুমি বুঝতে পারবে। ডেভিড বলল—এবার সেই বৃদ্ধ যা বলল—তাই বলছি। প্রায় দেড়শো দুশো বছর আগে বর্তমান রাজা মামুনের পূর্ব পুরুষ এক রাজা ছিল। রাজা সুমালী। সেও ছিল এক আধ পাগল রাজা। তার মাথায় বিচিত্র সব চিন্তা আসতো। একদিন সমুদ্রের ধারে বেড়াচ্ছে একটা ঝুনো নারকেল তার কাঁধে পড়ল। রেগে গিয়ে সে এলাকার সব নারকেল গাছ কেটে ফেলার হুকুম দিল। তার বিচিত্র সব কাণ্ড কারখানার কথা শুনলে অবাক হয়ে যাবে।

সবচেয়ে অদ্ভুত কাণ্ড করল রাজা প্রাসাদের বিরাট এক ঘরে ছোট ছোট ঘর তৈরি করলো। কোন ঘরেরই দরজা জানলা নেই। ঘরগুলোর মাঝখান দিয়ে গলি। রাজা সুমালীর শখ—সেই ঘরের আড়ালে আড়ালে গলিপথ দিয়ে ছুটো ছুটি করে লুকো চুরি খেলবেন।

সেই খেলা যেদিন শুরু হল প্রাসাদের বাইরে রাজ্যের লোক ভেঙে পড়ল। দুপুরে রাজা সুমালী এলো। মন্ত্রী সেনাপতি অমাত্যরা সবাই এলেন। পাকা দাড়ি গোঁফের ভিড়। তারা ঘরের আড়ালে আড়ালে লুকোচুরি খেলা শুরু করল। সে কি উৎসাহ কী উদ্দীপনা। কিছুক্ষণের মধ্যেই খেলা জমে গেল। বুড়োদের সে কি ছুটোছুটি। প্রজারা হাততালি দিয়ে উৎসাহ দিতে লাগল।

কিন্তু হাজার হোক বয়েস তো হয়েছে। কতক্ষণ আর ছুটোছুটি করবেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই বুড়োরা হাত পা ছড়িয়ে বসে পড়ল। খেলা বন্ধ হয়ে গেল।

আবার পরদিন খেলা হল। এই অদ্ভুত খেলা দেখতে বিদেশী রাজাদের লোকেরাও এল। প্রজারাতো আছেই।

কয়েকদিন পর পর খেলা চলল রাজ অন্তঃপুরের মেয়েরাও খেলা দেখতে এল। সেখানেই খেলা শেষ হতে রানি এসে দাঁড়ালেন। রাজা সুমালীকে ধমক দিয়ে বললেন—বুড়ো বয়েসে ভিমরতি ধরেছে। বন্ধ কর এসব খেলা। এই পরিশ্রম আমাদের সহ্য হবেনা। অকালে মারা যাবেন। এই খেলা আর হবে না।

রাজা সুমালী মাথা চুলকোতে লাগলেন। কী বলবেন বুঝে উঠতে পারলেন না। প্রজাদের সামনে মন্ত্রী অমাত্যের সামনে রাজা বেশ অপ্রস্তুত হলেন।

আর কি। খেলা বন্ধ হয়ে গেল। রাজা সুমালীর মন খুব খারাপ হয়ে গেল। ঘরগুলো আর ভাঙা হল না। সেগুলো রয়েই গেল।

পাগল রাজার বিচিত্র সব কাহিনী হিচকক দ্বীপের ধারে সমুদ্রে প্রচুর ঝিনুক। ঝিনুকে বড় বড় মুক্তো। সমুদ্রের ধারে ঝিনুক তুলে মুক্তো খোঁজে যারা তাদের ভিড় লেগেই আছে। দলে দলে লোক ঝিনুক তোলে আর ঝিনুকের মুখ খুলে খুলে মুক্তো বের করে। অনেক লোকের এটাই জীবিকা।

হঠাৎ রাজা সুমালী ঘোষণা করলেন কেউ সমুদ্র থেকে মুক্তো তুলতে পারবে না। শুধু উনি নিজে তুলবেন।

হাতে ছোট জাল নিয়ে রাজা সুমালী একদিন সকালে সমুদ্রের ধারে এলেন। সেদিনও প্রজাদের সে কি ভিড়।

মুক্তো শিকারীদের মতই রাজার পরনে নেংটি। জাল হাতে সমুদ্রে ঝাঁপ দিলেন। উঠলেন একটু পরেই। জালে পড়া ঝিনুক। জাল নিয়ে পাড়ে রাখলেন। এক সৈন্যকে বললেন—এ্যাই সব ঝিনুক ভাঙ্। দ্যাখ—মুক্তো পাস কিনা। সৈন্যটি ঝিনুক ভাঙতে লাগল।

রাজা আবার নামলেন জলে। কিছুক্ষণ পরেই উঠে এলেন। জাল ভর্তি ঝিনুক। আবার এক সৈন্যকে বললেন—ঝিনুক ভাঙ্।

ঝিনুক ভাঙা হতে লাগল। রাজার ভাগ্যি। দু দফায় ঝিনুকে দুটো বড় মুক্তো পাওয়া গেল। সমবেত প্রজারা রাজার জয়ধ্বনি দিল—রাজা সুমালীর জয় হোক। রাজা সুমালীও খুশি। সগর্বে চারিদিক তাকাতে তাকাতে পোশাক পরলেন। রাজপ্রাসাদে ফিরে গেলেন।

মুক্তো শিকারীদের জীবিকাই ছিল এটা। তারা রাজার দরবারে গেল। নিজেদের সমস্যার কথা বলল। রাজা অনড়—না—শুধু আমি মুক্তো তুলবো।

এবারেও রানিই প্রজাদের বাঁচালেন। রানি রাজসভায় প্রজাদের বললেন—দাঁড়াও। আমি দেখছি। রাজার দিকে চেয়ে বললেন—তোমার কি মাথা খারাপের বাকি নেই। ঐ জলে চুবানি খেয়ে মুক্তো তুলতে যাচ্ছ? বন্ধ কর এসব। মুক্তো শিকারীরা এই মুক্তো বিক্রী করে সংসার চালায়—বেঁচে আছে, আর সেটা তুমি বন্ধ করে দিতে যাচ্ছ?

রাজা সুমালী কয়েকবার মাথা চুলকে বললেন—ঠিক আছে। তোরা মুক্তো তুলবি। রাজসভায় উপস্থিত প্রজারা উচ্চকণ্ঠে রাজার নামে জয়ধ্বনি দিল।

তারপর? ফ্রান্সিস বলল।

—এই পাগলা মনভুলা রাজা আর একটি কাণ্ড করেছিলেন। সেটা জানা গেল তাঁর মৃত্যুর পূর্বক্ষণে।

তখন তিনি মৃত্যুশয্যায়।

হঠাৎ ঘোষণা করলেন—আমি ইনকা কর্মকারদের সাহায্যে একটা সম্পূর্ণ সোনার ঘর তৈরি করিয়েছে। সেটা আমি অত্যন্ত গোপনে করিয়েছি। কিন্তু সমস্যা হল আমি যে মাপকাটি ব্যবহার করেছিলাম সেটা হারিয়ে ফেলেছি। আমি জানি না সেটা কোথায়? কাজেই একমাত্র নির্ভর উত্তরপুরুষরা। তারা যদি সেই সোনার ঘর আবিষ্কার করতে পারে। আমি কোন সূত্রও দিয়ে যেতে পারলাম না।

রাজা সুমালী মারা গেলেন।

রাজা সুমালী ঘরটি তৈরি করেছিলেন অত্যন্ত গোপনে। যে দরজা জানালাহীন ঘরগুলো তৈরি করা হয়েছিল সেটাকে চারদিক দিয়ে দেওয়াল গাঁথা হল। একটা মাত্র দরজা। তাও তালাবন্ধ। গভীরভাবে ইনকা কর্মকারেরা আগুনের উনুন জ্বেলে মোম গলিয়ে সোনার ঘরে ঢালে। আস্তে আস্তে সোনার ঘর তৈরি হয়। বেশ সময় লেগেছিল। সেই কাজের সময় ধারেকাছে কাউকে যেতে দেওয়া হত না। এমন কি প্রহরীদেরও না।

রাজা সুমালীর প্রচুর স্বর্ণসম্পদ ছিল। দু'তিন পুরুষের সঞ্চয়। কাজেই একটা ছোট ঘর নিশ্চয়ই তৈরি করার মত সোনা তাঁর ছিল।

সোনার ঘর তৈরির চিন্তাটাই পাগল রাজার মাথায় এসেছিল কেন সেটা বোঝার উপায় ছিল না। পাগলের খেয়াল।

—তাহলে সেই সোনার ঘর কেউ উদ্ধার করতে পারে নি। ফ্রান্সিস বলল।

—না। তোমরা চেষ্টা করবে? ডেভিড বলল।

—হ্যাঁ। ফ্রান্সিস মাথা নাড়ল।

—তাহলে মন্ত্রীমশাইয়ের সঙ্গে এই নিয়ে কথা বলতে পারো। মন্ত্রীমশাই খুব ভাল মানুষ। ডেভিড বলল।

—দেখি ফ্রান্সিস বলল।

ফ্রান্সিসরা নিজেদের জাহাজে ফিরে এল। ফ্রান্সিস নিজের কেবিনঘরে ঢুকল। মারিয়া চুপচাপ বসেছিল। ফ্রান্সিস বলল—মারিয়া তোমার এ দেশের অতীতের এক রাজার কথা বলি। সে এক বিচিত্র কাহিনী।

হ্যারি দরজায় এসে দাঁড়াল।

—এসো এসো হ্যারি। এই হিচকক দ্বীপের অতীতের এক রাজার কাহিনী বলি।

ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে শোনা কাহিনী সব বলল। সব শুনে মারিয়া হ্যারি দুজনেই অবাক।

—সেই সোনার ঘর তাহলে হিচকক দ্বীপে আছে? হ্যারি বলল।

—হ্যাঁ। কোথায় আছে সেটার খোঁজখবর করতে গেলে ওখানে যেতে হবে। সব দেখতে হবে জানতে হবে। মারিয়ার মুখ ভার হল। আস্তে আস্তে বলল—তার মানে আরো কিছুদিন এখানে থাকতে হবে।

—হ্যাঁ মারিয়া। কী করবো বলো। আমার ভালো লাগে এসব। কী হবে দেশে ফিরে? সেই তো খাও দাও ঘুমোও এর জীবন। ফ্রান্সিস বলল।

—কিন্তু আমার তো বাবা মাকে দেখতে ইচ্ছে করে। মারিয়া বলল।

—খুবই স্বাভাবিক। তবু বলে মারিয়া এই কষ্টটা মেনে নাও। ফ্রান্সিস বলল।

—বেশ মারিয়া আর কোন কথা বলল না।

এরমধ্যে ভাইকিংরা পাগলারাজা সুমালীর কাহিনী শুনে নিয়েছে। ফ্রান্সিস সোনার ঘর খুঁজে বের করার পরিকল্পনা নিয়েছে তাও জানল ওরা।

সেদিন শাঙ্কো ছুটতে ছুটতে এল। খুব খুশী। শাঙ্কো হাঁপাতে হাঁপাতে বলল—উৎসব—উৎসব

—কীসের উৎসব? হ্যারি জানতে চাইল।

—এই হিচকক দ্বীপে প্রতিবছর এই দিনে সমুদ্র পূজা হয়। মেলা বসে সমুদ্রতীরে। রাজা রানি আসেন। রাজ পুরোহিত ফুলপাতা দিয়ে সমুদ্র পূজা করে। শাঙ্কো বলল।

—সমুদ্র পূজা কথাটা নতুন শুনলাম। ফ্রান্সিস বলল।

—ফ্রান্সিস—হ্যারি হেসে বলল—আমরাও তো তরোয়ালি পূজা করেছিলেন।

ফ্রান্সিস হেসে ফেলল। বলল—ঐ তরোয়ালপূজা করেই তো পালাতে পারলাম। তুমি মাথা থেকে জব্বর পরিকল্পনা বের করেছিলে। কত লোক সমুদ্রতীরে জড়ো হয়েছে। মেলা বসেছে। নানা দোকানপাট বসেছে। জোর কেনাকাটা চলছে। আমরাও যাবো।

—বেশ। সবাই যাবো। এরকম মেলাটেলায় তো যাওয়া হয় না।

—দেশের মেলার কথা মনে করিয়ে দিলে ফ্রান্সিস। মনটা খারাপ হয়ে গেল। হ্যারি একটু ভারি গলায় বলল।

—পাগল। ওসব নিয়ে ভেবো না। আমরা কি কোনদিন দেশে ফিরবো না? ফ্রান্সিস বললো।

—সত্যিই কি দেশে ফিরে যেতে পারবো ফ্রান্সিস? হ্যারি বলল। হ্যাঁ। এটা ঠিক কয়েকজন বন্ধুকে আমরা হারিয়েছি। এটা তো স্বাভাবিক। দীর্ঘদিন ধরে কত কত দ্বীপে, দেশে ঘুরে বেড়ালাম। বিপদ আপদ তো হবেই। এর জন্যে ভয় পেয়ে দেশে ফিরে যাওয়া কোন কাজের কথা নয়। ফ্রান্সিস বলল আমরা এখনই যাবো।

—ঠিক আছে। বন্ধুদের বল। সবাইকে খবর দিতে শাঙ্কো প্রায় ছুটে বেরিয়ে গেল।

ফ্রান্সিস নিজের কেবিনঘরে গেল। দেখল মারিয়া সুঁচ-সুতে দিয়ে ছেঁড়া পোশাক সেলাই ফোঁড়াই করছে। ফ্রান্সিস হেসে বলল—মারিয়া—অনেকদিন তো মেলা-টেলা দেখ না।

—সমুদ্রের জলে মেলা বসে? হুঁঃ! মারিয়া মুখ ঘুরিয়ে বলল।

—না ডাঙাতেই বসে। মেলায় যাবে? ফ্রান্সিস বলল। মারিয়া হাঁ করে ফ্রান্সিসের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। ফ্রান্সিস জানে মেলায় লোকজন দোকানপাট এসব দেখলে মারিয়া সবচেয়ে খুশি হয়।

—কী বলছো বুঝে উঠতে পারছি না। মারিয়া বলল। এসো—সমুদ্রের ধারে কত লোক এসেছে। ডেক-এ উঠে দেখে এসো—সমুদ্রের ধারে কত লোক এসেছে। মেলা বসেছে? ফ্রান্সিস বলল।

—বলো কি। দেখি তো! মারিয়া হাতের কাজ রেখে দরজার দিকে ছুটল।

একটু পরেই ফিরে এল। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল মেলা দেখতে যাবো।

—সবাই যাবে। এবার তুলে রাখা ভালো পোশাক-টোশাক গুলো বের কর। আমরা সবাই ভালো পোশাক পরে যাবো।

মারিয়া পোশাক বের করার জন্যে বাক্সটাক্স চামড়ার ঝোলা খোঁজাখুজি শুরু করল।

একটু পরেই দরজায় টোকা দেয়ার শব্দ। ফ্রান্সিস দরজা খুলল। শাঙ্কো দাঁড়িয়ে। পরনে নতুন পোশাক। প্রায় চেঁচিয়ে উঠল—তোমরা এখনও তৈরি হওনি। ওদিকে—

—আরে বাবা আমরা যেতে যেতে মেলা উঠে যাবে না। তোমরা ডেকে গিয়ে অপেক্ষা কর। আমরা যাচ্ছি। শাঙ্কো ছুটে চলে গেল। ফ্রান্সিস শাঙ্কোর সাজসজ্জা দেখে খুশি হল। ময়লা পোশাক পরে জাহাজের হাজারটা কাজ, কখনও কখনও ডেকে রাত কাটালো দুপুরের চড়া রোদ কয়েক ঘরের কষ্ট—যাক অন্তত একদিনের জন্যে হলেও নিজের খুশিমত সাজতে পেরেছে।

মারিয়া ফ্রান্সিসকে একটা নতুন পোশাক বের করে দিল। পরিয়েও ছিল। পরিয়েও দিল। ফ্রান্সিস হেসে বলল এবার এই ঘরে একটা আয়না রাখবো। দেওয়ালে আটকে রাখবো। জাহাজের ঝাঁকুনিতে পড়ে যাবে না।

—কোন দরকার নেই—মারিয়া বলল—আয়নায় মুখটুখ দেখলে মন খারাপ হবে। তার চেয়ে এই বেশ আছি।

—বেশ। ফ্রান্সিস আর কিছু বলল না।

মারিয়াও একটা নতুন গাউন পরল। নীল সবুজ রঙের। মাথার চুল আঁচড়াল। মুখটা একবার দু'হাতে ঘসে নিল। তারপর বলল—চলো। ফ্রান্সিস একবার মারিয়াকে দেখল। মারিয়ার চেহারায় এখনও রাজকুমারীর সৌন্দর্য মুছে যায় নি। শুধু গায়ে ও মুখের দুধ আলতা রংটা আর নেই। একটু তামাটে হয়েছে।

দুজনে ডেকে উঠে এল। বন্ধুরা হৈ হৈ করে উঠল। আজকে সবাই নতুন পোশাকে উচ্ছল। ফ্রান্সিস বলল—সবাই যাবে।

—সবাই যাবো। শাঙ্কো বলল।

—কয়েকজন জাহাজের পাহারায় থাকো। ফ্রান্সিস বলল।

—না-না। সবাই যাবো। বিস্কো বলল।

—ঠিক আছে। শুধু ভেন থাকুক। ও বয়স্ক মানুষ। হৈ চৈ করতে পারবে না। হ্যারি বলল।

—বেশ। শাঙ্কোরা বলল।

সবাই জাহাজ থেকে নেমে এল। তখন অন্ধকার হয়ে এসেছে।

মেলা এলাকায় লোকজনের ভিড়। ফ্রান্সিসরা ভিড়ের মধ্যে ঘুরে বেড়াতে লাগল।

শাঙ্কো বিকেলেই এক স্বর্ণকারের দোকানে গিয়েছিল। দুটো সোনার চাকতি বদলে কিছু স্থানীয় মুদ্রা এনেছিল। সেসব বন্ধুদের দিল। বনসুরা মনের আনন্দে কেনা কাটা করল। কারো জাহাজে ফেরার নাম নেই।

তখন রাত হয়ে গেছে। মেলার এলাকায় লোকের ভিড় কমে গেছে।

ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে বলল—ভাই সব আর নয়। এবার জাহাজে ফেরা।

বেশ আনন্দে সময় কাটল ভাইকিংদের। সবাই জাহাজ ঘাটের দিকে ফিরে আসতে লাগল।

জাহাজ ঘাটে এসে সবাই হতবাক। একী? ওদের জাহাজ কোথায়? সেখানে ছোট নৌকা ভাসছে। ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে বলল—ভাই সব জাহাজ চুরি হয়ে গেছে। একা ভেন রয়েছে সেই জাহাজে। ভেন নিশ্চয়ই বুঝতে পারে নি। এরকম বিপদে কী করবো বুঝে উঠতে পারছি না।

—ফ্রান্সিস দেখো তো নৌকোটার মাঝিকে বলে। ও কিছু দেখেছে কিনা? হ্যারি বলল।

ফ্রান্সিস নৌকাটার কাছে গেল। গলা চড়িয়ে জিজ্ঞেস করল—ভাই শুনছো? মাঝি বোধহয় রান্নাটান্না করছিল এগিয়ে এসে বলল—আমাকে ডাকছো কেন?

—এখানে আমাদের জাহাজ ছিল। তুমি দেখেছো? ফ্রান্সিস বলল।

—হ্যাঁ হ্যাঁ। মাঝি মাথা ঝাঁকিয়ে বলল।

—ওটা চুরি হয়ে গেছে। তুমি দেখেছো কিছু? হ্যারি বলল।

—হ্যাঁ, দেখলাম আটদশজন লোক জাহাজটায় উঠল। নোঙর তুলে জাহাজ ছেড়ে দিল। ভাবলাম তোমারই বোধহয়। মাঝি বলল।

—কতক্ষণ আগে? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—ঘণ্টা খানেক হবে। হ্যারি বলল।

—তাদের হাতে অস্ত্র ছিল? শাঙ্কো জানতে চাইল।

—হ্যাঁ। তরোয়াল ছিল। মাঝি বলল।

—তাদের তুমি আগে দেখেছো? ফ্রান্সিস জিজ্ঞাসা করল।

—না। মাঝি মাথা নাড়ল।

—জাহাজ কোনদিকে গেল? হ্যারি জানতে চাইল।

—দক্ষিণ মুখো। মাঝি হাত তুলে দক্ষিণ দিকে দেখাল।

এবার শাঙ্কো বলল—ফ্রান্সিস কী করবে?

—এখানে জাহাজ কিনবো। দক্ষিণমুখো জাহাজ চালাবো। জাহাজ চোরদের ধরতে হবে। ফ্রান্সিস বলল।

—জাহাজ কিনবে। অত সোনার চাকতি তো আমার কাছে নেই। মারিয়া এগিয়ে এল। বলল—আমাদের বোধনঘরের কাঠের দেওয়ালে আমি সোনার চাকতি রেখে ছিলাম।

—জাহাজ তো নেই। ফ্রান্সিস তারপর বলল—শাঙ্কো তোমার কাছে ক'টা সোনার চাকতি আছে? শাঙ্কো পেটি থেকে সোনার চাকতিগুলো বের করল। গুনে বলল—ছোট জাহাজ কেনা যেতে পারে।

ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে মাঝিকে জিজ্ঞেস করল আমরা জাহাজ কিনবো। এখানে বিক্রির জন্য জাহাজ আছে?

—যে সব রুবিন বলতে পারবে। ও জাহাজ কেনাবেচার কাজ করে। মাঝি বলল।

—রুবিন কোথায় থাকে?

মাঝি আঙ্গুল তুলে সমুদ্রতীরের একটা ঘর দেখাল। বলল—ওখানেই রুবিন থাকে। তবে ওর বদনামও আছে। খালি জাহাজ পেলে ও নিজের বলে বিক্রি করে দেয়। মাঝি বলল।

—রুবিন নিশ্চয়ই আমাদের জাহাজের বেলায়ও এই কাণ্ডটি করেছে। ফ্রান্সিস মৃদুস্বরে বলল।

—রুবিনকে পাকড়াও কর। হ্যারি বলল।

—চলো। ফ্রান্সিস মাথা ঝাঁকিয়ে বলল।

ওরা রুবিনের ঘরের কাছে এল। ছোট ঘর। তবে শক্তপোক্ত। ঘরের দরজা খোলা। ফ্রান্সিস আর হ্যারি ঘরে ঢুকল। দেখল একটা বিছানায় একটা লোক শুয়ে আছে। কাছে গিয়ে দেখল লোকটা ঘুমুচ্ছে। ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে ডাকল—রুবিন। লোকটা ধড়মড়িয়ে উঠে বলল—কী ব্যাপার?

—ব্যাপার গুরুতর। তুমিই রুবিন? ফ্রান্সিস ভারি গলায় জিজ্ঞেস করল।

—হ্যাঁ। রুবিন মাথা নত করল।

—জাহাজ কেনাবেচার কাজ কর। ফ্রান্সিস বলল।

—হ্যাঁ। কিন্তু আমি তো তোমাদের চিনি না। রুবিন বলল?

—এবার চিনবে? আমাদের জাহাজে মাত্র একজন লোক ছিল। সেই অবস্থায় তুমি আমাদের জাহাজ বিক্রি করে দিয়েছো। ফ্রান্সিস বলল।

—কী সব বলছো? তোমাদের জাহাজের ব্যাপারে আমি কিছুই জানি না। রুবিন মাথা ঝাঁকিয়ে বলে উঠল।

ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে বলল—শাঙ্কো-ছোরাটা নিয়ে এসো তো। শাঙ্কো সঙ্গে সঙ্গে ঘরে ঢুকল। জামা দিয়ে হাত ঢুকিয়ে ছোরাটা বের করে ফ্রান্সিসের হাতে দিল। ফ্রান্সিস সঙ্গে সঙ্গে ছোরাটার মুখ রুবিনের গলায় চেপে ধরল। দাঁতচাপাস্বরে বলল—আসল ঘটনাটা বল।

রুবিন মাথা নেড়ে বলল—আমি কিছুই জানি না। ফ্রান্সিস ছোরার চাপ বাড়াল। একইভাবে বলল—যদি মরতে না চাও সত্যি ঘটনাটা বলো। তোমাকে এখানে কেউ বাঁচাতে আসবে না।

রুবিন আবার মাথা নাড়ল। ফ্রান্সিস ছোরার চাপ বাড়াতেই রুবিনের গলায় একটু চেপে রক্ত বেরিয়ে এল। এবার রুবিন বুঝলো জীবন বিপন্ন। এই বিদেশিটা ওকে অনায়াসে মেরে ফেলতে পারে। ও বলে উঠল—ছোরা সরাও—বলছি। হ্যাঁ চেড়ে রুবিন বলল—তোমাদের জাহাজে কেউ নেই দেখে ঐ জাহাজ আমার বলে বিক্রি করে দিয়েছি।

—কার কাছে? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—একজন নয়। জন দশ বারো লোকের কাছে। রুবিন বলল।

—তারা কোথাকার লোক? ফ্রান্সিস আবার প্রশ্ন করল।

—পাতুই দ্বীপ থেকে এসেছিল। রুবিন বলল।

—পাতুই দ্বীপ কোথায়? কতদূর? ফ্রান্সিস আবার জিজ্ঞেস করল।

—দক্ষিণ দিকে। এখান থেকে খুব বেশি দূরে নয়।

ফ্রান্সিস হ্যারির দিকে তাকাল। হ্যারি বলল—যাক একটা হদিশ পাওয়া গেল। এবার ফ্রান্সিস রুবিনের দিকে তাকাল। বলল—আমাদের জাহাজ বিক্রি করে যে মুদ্রা পেয়েছো সে সব কোথায়?

—সে সব দিয়ে আর একটা জাহাজ কিনেছি। রুবিন বলল।

—চুরি করে—না দাম দিয়েছো। ফ্রান্সিস বলল।

—হ্যাঁ-হ্যাঁ—দাম দিয়েই কিনেছি। খোদ মালিকের কাছ থেকে। রুবিন বলল।

—সেই জাহাজ কোথায়? ফ্রান্সিস জিজ্ঞেস করল।

রুবিন পূর্বদিক আঙুলি দেখিয়ে বলল—ঐখানে নোঙর করা।

—চলো? সেই জাহাজ দেখবো। ফ্রান্সিস বলল।

—পুরনো জাহাজ। ভাঙাচোরা। রুবিন বলল।

—ঠিক আছে। তুমি জাহাজটি দেখাবে চলো। ফ্রান্সিস বলল।

—কিন্তু ঐ জাহাজ আমি—রুবিন কথাটা শেষ করতে পারল না?

—কথা বাড়িওনা। চলো ফ্রান্সিস বাধা দিয়ে বলল। ফ্রান্সিস ছোরাটা শাঙ্কোকে ফিরিয়ে দিল। শাঙ্কো ছোরাটা বুকের কাছে পোশাকের মধ্যে ঢুকিয়ে রাখল।

ঘরের বাইরে এসে রুবিন ফ্রান্সিসের বন্ধুর দলকে দেখল। মারিয়াকে দেখে একটু অবাকও হল। রুবিন বুঝল এরা দলে ভারি। একটু এদিক-ওদিক হলে ওরা ওকে বিপদে ফেলতে পারে?

সবাই পূবমুখো চলল।

দু-তিনটি জাহাজ ছাড়িয়ে রুবিন একটা জাহাজের সামনে এল। জাহাজটা দেখিয়ে বলল—দেখ একেবারে লজঝর একটা জাহাজ। সস্তাতেই কিনেছি।

জাহাজটার পাটাতন ফেলাই ছিল। রুবিন আগে জাহাজটায় উঠল। পেছনে ফ্রান্সিস হ্যারি আর শাঙ্কো।

ভালো করে দেখল ফ্রান্সিস। সত্যিই একটা পুরোনো আধভাঙা জাহাজ। ফ্রান্সিস ডাকল—শাঙ্কো? শাঙ্কো এগিয়ে এল। ফ্রান্সিস বলল—ভালো করে জাহাজটা দেখতো। মেরামতি করে জাহাজটা চালানো যাবে কিনা। রুবিন প্রায় চেঁচিয়ে বলে উঠল—আমার কেনা জাহাজ— তোমরা নেবে কেন?

—আমাদের জাহাজ তুমি চুরি করে বিক্রি করেছিলে কেন? ফ্রান্সিস বলল।

—তাই বলে আমার জাহাজ নিয়ে নেবে? রুবিন গলা চড়িয়ে বলল।

—তোমাকে মেরে ফেলিনি এটাই যথেষ্ট। এখন বিদেয় হও। ফ্রান্সিস বলল।

—তার মানে—রুবিন কী বলতে গেল। ফ্রান্সিস বলে উঠল—

—আর একটা কথাও নেই। এই জাহাজ এখন আমাদের। রুবিন কী বলবে বুঝে উঠতে পারল না। বলল—আমি রাজার কাছে নালিশ করবো।

—আমরা বলবো এক জাহাজ চোরের জাহাজ আমরা নিয়ে নিয়েছি। হ্যারি বলল।

—ঠিক আছে। তোমাদের এই দ্বীপ থেকে আমি তাড়াবো। রুবিন বলল।

—তার আগে তুই জাহাজ থেকে নেমে যা। ফ্রান্সিস বলল।

রুবিন গজর গজর করতে করতে জাহাজ থেকে নেমে গেল

শাঙ্কো জাহাজের সব দেখেটেকে ফ্রান্সিসের কাছে এল। ফ্রান্সিস বলল—কেমন দেখলে?

—জাহাজটার অবস্থা খুব খারাপ। হাল আধভাঙা। ডেকের কাঠের পাটাতন কোথাও কোথাও ভাঙা। মাস্তুল পালের দড়িদড়া জরাজীর্ণ।

—নিচে যাও। কেবিন ঘরটরগুলো দেখ। জাহাজটা কেমন? কাঠটাট, যন্ত্রপাতি মজুত আছে দেখ। ফ্রান্সিস বলল। শাঙ্কো চলে গেল।

এবার মারিয়া আর বন্ধুরা জাহাজে উঠে এল। বিস্কো বলে উঠল—এ তো একশো বছরের পুরোনো জাহাজ।

—এই জাহাজ নিয়েই আমাদের জাহাজ উদ্ধারের জন্য যেতে হবে। নতুন জাহাজ কেনার মত স্বর্ণমুদ্রা নেই। ফ্রান্সিস বলল।

বনসুন্না ঘুরে ঘুরে জাহাজটা দেখতে লাগল। কত সুন্দর মজবুত ওদের জাহাজ।

এই জাহাজের সঙ্গে তুলনাই চলবে না। কিন্তু এখন এই জাহাজই ভরসা। চুরি হয়ে যাওয়া জাহাজ উদ্ধার না করা পর্যন্ত এই জাহাজই চালাতে হব।

শাঙ্কো ফ্রান্সিসের কাছে ফিরে এল।

—কেমন দেখলে?

—অবস্থা খুব একটা খারাপ নয়। আর আশ্চর্য হল গুদাম ঘরে যথেষ্ট কাঠ আর যন্ত্রপাতি আছে। জাহাজের মালিক বোধ হয় জাহাজটা সারাইটারাই করবে ভেবেছিল। কিন্তু করে নি। এই অবস্থাতেই বিক্রি করে দিয়েছে।

—যাক্। তাহলে মেরামতি করে কাজ চালানো যাবে। ফ্রান্সিস বলল।

—জাহাজ কি এই অবস্থাতেই চালাবে? শাঙ্কো জানতে চাইল।

—হ্যাঁ। দেরি করবো না। জাহাজ চলতে চলতেই মেরামতির কাজ চলবে। ফ্রান্সিস বলল?

—সবার আগে খাদ্য আর জলের ব্যবস্থা করতে হবে। হ্যারি বলল।

—হাঁ ওটাই প্রাথমিক কাজ। শাঙ্কো কয়েকজনকে নাও। জলের পীপে বস্তা নিয়ে যাও। কেনাকাটা সেরে খাবার জল নিয়ে এসো। ফ্রান্সিস বলল?

শাঙ্কোরা কয়েকজন বস্তা পীপে নিয়ে চলে গেল।

বেশ কিছুক্ষণ পরে শাঙ্কোরা আটা ময়দা চিনি পীপে ভর্তি খাবার জল নিয়ে ফিরে এল।

হ্যারি ফ্রান্সিসের কাছে এল। বলল—এখন কী করবে?

—ফ্রেজারকে বলো ও জাহাজ ছেড়ে দিক। যাবো দক্ষিণের পাতুই দ্বীপে। জাহাজ উদ্ধার করবো। ফ্রান্সিস বলল।

—কিন্তু এই ভাঙা জাহাজ নিয়ে—হ্যারি আপত্তি করতে গেল।

—পারবো। তবে ঝড়ঝাপটা এলে সমস্যায় পড়বো। ফ্রান্সিস বলল।

—তাহলে এই বন্দরে জাহাজ মেরামতি করিয়ে নেবে না? হ্যারি বলল

—না। দেরি করা চলবে না। জাহাজ চলতে চলতেই মেরামতির কাজ চালাতে হবে। সবাইকে হাত লাগাতে হবে। জাহাজে অনেক কাঠ যন্ত্রপাতি আছে। সমস্যা হবে না। ফ্রান্সিস বলল।

—বেশ। তুমি যা বলো। হ্যারি বলল।

—জাহাজ চালাবার দায়িত্বে থাকাবে তিনজন—ফ্রেজার, শাঙ্কো আর সিনেত্রা। বাকি সবাই জাহাজ সারাইয়ের কাজে লাগবে। ফ্রান্সিস বলল।

—তাহলে—আজ রাতেই জাহাজ ছাড়বে! হ্যারি জানতে চাইল।

—হ্যাঁ—দেরি করা চলবে না। ফ্রান্সিস বলল।

রাতের খাওয়া সেরে তিনজন বাদে সবাই জাহাজ মেরামতিতে হাত লাগল। তার আগে পালগুলো পালের কাঠে ভালো করে বেঁধে দিল। আকাশে উজ্জ্বল চাঁদ। আলোর অভাব হচ্ছিল না।

সমুদ্রে জোর হাওয়া পালগুলো জোর বাতাস পেয়ে ফুলে উঠল। দু-একটা পালে ফুটো ছিল। তবু পালের টানে জাহাজ বেশ বেগেই চলল।

প্রথমেই ফ্রান্সিসরা ভাঙা হাল মেরামতিতে হাত লাগল। কর্মরত ভাইকিংদের কথাবার্তা হাতুড়ির ঠুকঠাক শব্দ কাঠের পাঠাতন টানাটানির গর্‌ গর্‌ শব্দ চলল। সারারাত সারাইয়ের কাজ চলল।

পূব আকাশে কমলা রং ছড়িয়ে সূর্য উঠল। ভোর হল। নরম রোদ পড়ল সমুদ্রে জাহাজে।

ভাইকিংরা কাজ থামিয়ে ডেকে বসে বিশ্রাম করতে লাগল।

সকালের খাবার খেয়ে আবার কাজে হাত লাগাল।

কাজ চলল দুপুর পর্যন্ত।

দুপুরের খাওয়ার পর কিছুক্ষণ বিশ্রাম তারপর আবার কাজ।

সন্ধ্যের মধ্যেই হাল মেরামত হয়ে গেল।

ফ্রান্সিস ফ্রেজারের কাছে এল। বলল হাল ঠিক হয়েছে। ফ্রেজার হুইল ঘোরাতে ঘোরাতে বলল—ঠিক আছে। হালের জোর বেড়েছে। জাহাজ এবার ভালো চলবে।

একটা দিন কাটল।

এর মধ্যে জাহাজের ফুটো ফাটা ভাঙা রেলিং সিঁড়ি ঘরের ডেক-এর মেরামতি চলল। আরো কাজ বাকি।

সেদিন গভীর রাতে ফ্রান্সিস যা আশঙ্কা করেছিল তাই হল।

প্রচণ্ড ঝড় ঝাঁপিয়ে পড়ল ফ্রান্সিসদের জাহাজের ওপর। সমস্ত জাহাজটা কেঁপে উঠল। তারপরেই মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হল। সেইসঙ্গে প্রচণ্ড শব্দ তুলে বাজ পড়া।

ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে বলল—ভাইসব যে করেই হোক জাহাজ ডুবতে দেওয়া চলবে না। সবাই কাজে ঝাঁপিয়ে পড়।

ভাইকিংরা দ্রুত পাল নামিয়ে ফেলল। পালের কাঠের দড়িদড়া মাস্তুলের দড়িদড়া প্রাণপণে টেনে ধরে জাহাজটা ভাসিয়ে রাখার চেষ্টা চালাল। ভাইকিংরা যথেষ্ট অভিজ্ঞ নাবিব। ঝড়ঝাপটার সঙ্গে লড়াই করা ওদের কাছে নতুন কিছু নয়। চলল ঝড়ের সঙ্গে লড়াই। ফ্রেজার দৃঢ়হাতে হুইল ঘোরাতে লাগল। উঁচু উঁচু ঢেউয়ের ধাক্কায় জাহাজ একবার দুলুনীতে কয়েকজন ভাইকিং ছিটকে ডেক-এর ওপর পড়ে গেল। পরক্ষণেই উঠে দাঁড়িয়ে বন্ধুদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কাজে লাগল।

জাহাজের ডেক-এর ওপর ঢেউ আছড়ে পড়তে লাগল। সমস্ত জাহাজটাতেই ক্যাঁক ক্যাঁক শব্দ হতে লাগল।

হঠাৎ বৃষ্টি থেমে গেল। টিপ টিপ বৃষ্টি পড়তে লাগল। আকাশ মেঘমুক্ত হতে লাগল। ঝড়ো বাতাস অনেকটা শান্ত হল।

মেঘ সরে গিয়ে উজ্জ্বল চাঁদ দেখা দিল।

ঝড়ের সঙ্গে লড়াইয়ে ক্লান্ত ভাইকিংরা জলজমা ডেক-এর এখানে ওখানে শুয়ে পড়ল।

ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে বলে উঠল—সাবাস ভাইসব। ভাঙা জাহাজ নিয়েও আমরা ঝড়ের বিরুদ্ধে জিতে গেলাম। ও হো হো। ভাইকিংরাও গলা মেলাল। তবে তাদের কণ্ঠস্বরে ভীষণ ক্লান্তি।

ডেক-এর জমা জল সমস্যা হয়ে দাঁড়াল। শাঙ্কো বলল— ফ্রান্সিস। ডেক-এর ধারে ফুটো করতে হবে। নইলে জমা জল বেরোবে না।

তখনই মারিয়া ডেক-এ উঠে এল। ফ্রান্সিসদের কাছে এসে বলল—নিচে কেবিন ঘরগুলোতে জল পড়ছে। কেবিন ঘরের মেঝেয় জল জমে গেছে।

—বোঝা যাচ্ছে জাহাজের ভাঙা ফাঁকফোকর দিয়ে নিচে জল পড়ছে। ফ্রান্সিস বলল।

—জল সরাবার উপায় কী? মারিয়া জানতে চাইল।

—জল ছেঁচে ফেলতে হবে। এছাড়া উপায় নেই। শাঙ্কো বলল।

—কী ভাবে জল ছেঁচবে? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—আমাদের তো গোটা চারেকের কাঠের বালতি রয়েছে। সেই বালতিগুলোয় কেবিন ঘরের জল তুলতে হবে। আমরা কেবিন ঘর থেকে ডেক-এর রেলিং পর্যন্ত সার দিয়ে দাঁড়াব। জল ভর্তি বালতি ধরাধরি করে রেলিং পর্যন্ত নিয়ে আসব। তারপর জল সমুদ্রে ফেলে দেব। এছাড়া কেবিন ঘরের জমা জল সরাবার অন্য কোন উপায় নেই। শাঙ্কো বলল?

—হুঁ। পদ্ধতিটা মন্দ বলো নি। তবে এভাবে জল সরাতে গেলে সময় লাগাবে। ফ্রান্সিস বলল।

—তা লাগবে। শাঙ্কো বলল।

—তাহলে কাজ শুরু কর। এবার ডেক-এর জমা হল। রেলিং-এর একেবারে নিচে বেরিয়ে সমুদ্রের সমতলে একটা দুটো ফুটো করতে হবে। জল গড়িয়ে বেরিয়ে সমুদ্রের জলে পড়বে। ফ্রান্সিস বলল।

—হ্যাঁ। তা করা যাবে। শাঙ্কো বলল।

—দুটো কাজই শুরু কর। ফ্রান্সিস বলল।

কাজ শুরু হল। ভাইকিংরা কেবিন ঘরগুলো থেকে সার দিয়ে জাহাজের রেলিং পর্যন্ত এসে দাঁড়াল। নিচে কেবিন ঘরের জল বালতিতে ছেঁচে তোলা হতে লাগল। জলভর্তি বালতি হাতে হাতে রেলিং পর্যন্ত আনা হতে লাগল। তারপর সমুদ্রে ঢেলে ফেলা হতে লাগল। এভাবেই কেবিন ঘরগুলো থেকে জল সরানোর কাজ চলল।

শাঙ্কো আর বিস্কো গেল ফুটো করতে। কিছুক্ষণের মধ্যেই দুজনে হাতুড়ি বাটালি দিয়ে কেটে কেটে দুটো ফুটো করে ফেলল। ডেক-এর জমা জল ঐ দুটো ফুটো দিয়ে বেরিয়ে যেতে লাগল।

কিছুক্ষণ পরে ডেক-এর জল একেবারেই বেরিয়ে গেল। আনন্দে শাঙ্কো ভাঙা ডেক-এর ওপরেই শুয়ে পড়ল। বিস্কোও হাসতে হাসতে ওর পাশে শুয়ে পড়ল। ওদের দুজনের কাণ্ড দেখে ভাইকিং বন্ধুরাও কেউ কেউ হেসে উঠল।

ওদিকে কেবিন ঘর থেকে জল ছেঁচাও চলল।

বেশ কিছুক্ষণ পরে কেবিন ঘরগুলো জলমুক্ত হল। তবে কাঠের মেঝে ভেজাই রইল।

সেদিন ভোরে ফ্রান্সিসদের জাহাজ একটা দ্বীপের কাছে পৌঁছিল।। মাস্তুলের ওপর থেকে নজরদার পেড্রো চিৎকার করে বলল—একটা দ্বীপ দেখা যাচ্ছে।

ফ্রান্সিস, হ্যারি ডেক-এ উঠে এল। তাকিয়ে দ্বীপটা দেখল।

নিস্তেজ রোদ পড়েছে সমুদ্রে ফ্রান্সিসদের জাহাজে কাছের দ্বীপটায়।

—বুঝতে পারছি না—এটা পাপুই দ্বীপ কিনা? হ্যারি কি বলো? ফ্রান্সিস বলল।

—কাছে গেলেই বোঝা যাবে? পাপুই দ্বীপ হলে জাহাজ ঘাটে আমাদের জাহাজ দেখতে পাবো। হ্যারি বলল।

—তা ঠিক। চলো—জাহাজ ঘাটের কাছে যাই। ফ্রান্সিস বলল।

ফ্রান্সিস ফ্লেজারের কাছে গেল। বলল—ঘাটেই জাহাজ ভেড়াও। জাহাজ ঘাটের কাছে এল।

কিছুদূর থেকে ভাইকিংরা দেখল একটা জাহাজ ঘাটে নোঙর করা। কাছাকাছি আসতেই বুঝল ওটা ওদের চুরি যাওয়া জাহাজ।

ফ্রান্সিসদের জাহাজ ঘাটে ভিড়ল। পাটাতন নামানো হল। মারিয়া আর ফ্রেজার ব্যদে সবাই দল বেঁধে নেমে এল।

ফ্রান্সিস আর হ্যারি ওদের চুরি করা জাহাজের পাতা পাটাতনের কাছে গেল। তারপর জাহাজে উঠল। দেখল ডেক ও মাস্তুলের কাছে একজন লোক দাঁড়িয়ে আছে। ওদের দেখে লোকটি প্রায় ছুটে এল। বলল —এখানে কী চাই?

—দাঁড়াও দাঁড়াও কথা আছে ফ্রান্সিস একহাত তুলে বলল?

—এই জাহাজটা তোমরা হিচকক দ্বীপ থেকে এনেছো—তাই না? হ্যারি বলল।

—হ্যাঁ। লোকটি বলল।

—এটা আমাদের জাহাজ। রুবিন এটা চুরি করে বিক্রি করেছে। ফ্রান্সিস বলল।

—অতসব আমরা জানি না। আমরা দস্তুরমত স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে কিনেছি। লোকটি বলল।

—বলছিলাম পাশের ঐ জাহাজটা তোমরা নাও। আমাদের জাহাজটা ফিরিয়ে দাও। ফ্রান্সিস বলল।

ফ্রান্সিসদের জাহাজটার দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে লোকটা বলল—ঐ ভাঙা জাহাজের সঙ্গে আমাদের জাহাজ বদল করবো। পাগল হয়েছো।

—আমরা ভাইকিং। জাহাজ মেরামতিতে ওস্তাদ। ঐ জাহাজটা এখন যথেষ্ট ভালো অবস্থায় আছে। ওটা নাও। ফ্রান্সিস আবার বলল।

লোকটা কী বলে চিৎকার করে উঠল। নিচের কেবিনঘর থেকে দু-তিনজন লোক উঠে এল। সবাই যুবক। লোকটা ফ্রান্সিসদের দেখিয়ে বলল এরা ঝামেলা করতে এসেছে। এই জাহাজটা নাকি ওদের।

এক যুবক মুখভঙ্গী করে বলে উঠল—কী পেয়েছো তোমরা? এ্যাঁ? জানো—এই জাহাজ এখন রাজা কুতুবুর।

কে রাজা কুতুবু—কী ব্যাপার আমরা জানি না। এটাই আমাদের চুরি-যাওয়া

জাহাজ এটাই জানি। ফ্রান্সিস বলল। এসময় ভেন আস্তে আস্তে সিঁড়ি দিয়ে উঠে এল। ফ্রান্সিস ছুটে গিয়ে ভেনকে জড়িয়ে ধরল। বলল ভেন ভালো আছো ভাই?

ভেন হেসে বলল—ভাল আছি।

ঠিক তখন একজন যুবক জাহাজ থেকে পাটাতনের ওপর দিয়ে দ্রুত নেমে বালিয়াড়ির ওপর দিয়ে তীরভূমির দিকে ছুটল। শাঙ্কো বাধা দিতে গিয়েও পারল না।? যুবকটি ছুটতে ছুটতে সমুদ্রতীর পার হয়ে গেল।

—ব্যাপারটা সুবিধের মনে হচ্ছে না। ফ্রান্সিস মৃদুস্বরে বলল।

—ফ্রান্সিস বিপদ হতে পারে। হ্যারি বলল।

ফ্রান্সিস আর ঐ যুবকদের কিছু বলল না।

অল্প সময়ই কেটেছে। ফ্রান্সিসরা দেখল তীরভূমির ওপর দিয়ে একদল যোদ্ধা খোলা তরোয়াল হাতে ছুটে আসছে। বোঝা গেল যে, যুবকটি বলে গেল সেই রাজাকে খবর দিয়েছে।

ফ্রান্সিসরা নড়বারও সময় পেল না। যোদ্ধার দল দ্রুত ছুটে এসে ফ্রান্সিসদের ঘিরে দাঁড়াল। যোদ্ধাদলের সবাই কালো। যোদ্ধা দলের সর্দার এগিয়ে এল। ফ্রান্সিসদের কাছে এসে বলল—কী ব্যাপার? তোমরা নাকি রাজা কুতুবুর জাহাজ জোর করে নিয়ে যেতে এসেছো?

—না। আমরা কোনরকম জোর করিনি। এই জাহাজ আমাদের হিচকক দ্বীপের বন্দরে চুরি হয়ে গিয়েছিল। আমরা সেই জাহাজ ফিরিয়ে নিতে এসেছি। বদলে আমরা যে জাহাজ জড়ে এসেছি সেই জাহাজটা দিয়ে দেব বলেছি। ফ্রান্সিস বলল।

—ঠিক আছে রাজা কুতুবুর কাছে চল। যা বলার তাঁকেই বলো।

ফ্রান্সিসরা দাঁড়িয়ে রইল।

—বললাম আমার সঙ্গে এসো। বেশ ধমক দিয়ে সর্দার বলল।

যোদ্ধারা ফ্রান্সিসদের ঘিরে নিয়ে চলল। কেউ এদিক ওদিক করে গেলে তরোয়ালের খোঁচা দিতে লাগল। ফ্রান্সিসদের ঘিরে নিয়ে যোদ্ধারা চলল তীরভূমি ছাড়িয়ে বসতির দিকে।

এখানে ওখানে ছাড়া ছাড়া বাড়ি ঘরদোর। কালো কালো মানুষজন। তারা অবাক চোখে ফ্রান্সিসদের দেখতে লাগল।

একটা বড় বাড়ির সামনে এসে যোদ্ধারা দাঁড়াল। বোঝা গেল এটাই রাজবাড়ি। মাটি বালি আর পাথরের বাড়ি।

বাড়ির সামনে কিছুটা ফাঁকা ঘাসের জমি। সেখানে একটা কাঠের আমলে একজন মধ্যবয়স্ক কালো মানুষ বসে আছে। কাটা ডাব মুখের কাছে নিয়ে ডাবের জল খাচ্ছে।

যোদ্ধা-সর্দার লোকটির কাছে গেল মাথা একটু নুইয়ে সম্মান জানিয়ে কিছু বলে গেল। ডাব ছুঁড়ে ফেলে লোকটি ফ্রান্সিসদের দিকে তাকিয়ে দেখল। তারপর ফ্রান্সিসদের এগিয়ে আসতে ইঙ্গিত করল।

যোদ্ধা-সর্দার মৃদুস্বরে বলল—রাজা কুতুবুর কাছে যাও।
ফ্রান্সিসরা রাজার সামনে এসে দাঁড়াল। রাজা কুতুবু বলল—তোমরা বিদেশী? আশ্চর্য তোমরা সবাই নতুন জামাকাপড় পরে আছো।
—হ্যাঁ। আমরা ভাইকিং। জাহাজে চড়ে দেশে দেশে ঘুরে বেড়াই।
—উদ্দেশ্য? রাজা কুতুবু কুৎকুতে চোখে তাকিয়ে বলল।
—কোন উদ্দেশ্য নিয়ে নয়। গুপ্তধন ভাণ্ডারের কথা জানতে পারলে সেসব বুদ্ধি খাটিয়ে পরিশ্রম করে উদ্ধার করি।
—তারপর গুপ্তধন চুরি করে জাহাজে চড়ে পালাও। রাজা কুতুবু বলল।
—না। গুপ্তধনের যিনি প্রকৃত মালিক তাঁকে দিয়ে দি। ফ্রান্সিস বলল।
—বিশ্বাস হচ্ছে না। যাক গে—তোমরা আমার জাহাজ চুরি করতে এসেছো। তোমাদের সাহসতো কম নয়। কুতুব বলল
—আমরা আপনার জাহাজ চুরি করতে আসি নি। ঐ জাহাজটা আমাদের। হিচকক দ্বীপের একজন লোক ঐ জাহাজটা চুরি করে আপনার লোকজনের কাছে বিক্রি করে দিয়েছিল। তাই আমরা আমাদের জাহাজের খোঁজে এসেছি। অনুরোধ আমাদের জাহাজটা আমাদের ফিরিয়ে দিন। ফ্রান্সিস বলল।
—কক্ষনো না। ঐ জাহাজ আমার। কুতুবু গলা চড়িয়ে বলল।
—ঠিক আছে। আমরা ফিরে যাচ্ছি।
—না। তোমাদের কাউকে ছাড়া হবে না। তোমাদের এখানে বন্দী হয়ে থাকতে হবে।
—আমাদের অপরাধ?
—তোমরা জাহাজ চোর। আমার জাহাজ চুরি করতে এসেছিলে। তার শাস্তি পেতে হবে। কুতুবু বলল।
—আমরা যে জাহাজটা চড়ে এসেছি সেই জাহাজটা আপনি রাখুন আমাদের জাহাজটা আমাদের ফিরিয়ে দিন। হ্যারি বলল।
—তোমরা যে জাহাজ চড়ে এসেছো সেটাও চোরাই জাহাজ। আমার সর্দার তাই বলছে। কুতুব বলল।
—আমাদের ওপর মিথ্যে অপবাদ। ফ্রান্সিস বলল।
—কোন কথা শুনতে চাই না। রাজা কুতুবু বলল।
তারপর যোদ্ধা সর্দারকে বলল—কয়েদী মাঠে নিয়ে হাত-পা বেঁধে ফেলে রাখ্। দেখিস্ পালাতে না পারে। জাহাজ চোরের দল। কুতুবু বলল।
ফ্রান্সিস কোন কথা বলল না।
যোদ্ধারা আবার ফ্রান্সিসদের ঘিরে দাঁড়াল। নিয়ে চলল একটা জঙ্গলের দিকে। জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে পায়ে চলা পথ। সেই পথ দিয়ে সবাই চলল। ফ্রান্সিস দুদিকে ভালোভাবে তাকাতে তাকাতে চলল। একটা শুকনো মরা গাছ দেখল ডানদিকে। ঘন জঙ্গল নয়। গাছপালা ছাড়া ছাড়া।

কিছু পরে সবাই একটা ঘাসে ঢাকা ফাঁকা জায়গায় এল। ফাঁকা জায়গাটা প্রায় গোল। চারদিকে কোন পাথরের দেওয়াল বা গাছের ডাল পুঁতে রাখা হয়নি।

সর্দার যোদ্ধা বলল—কয়েদী মাঠের মাঝখানে গিয়ে তোমরা বসো।

ফ্রান্সিসরা মাঠটার মাঝামাঝি জায়গায় এল। তারপর ঘাসের ওপর বসে পড়ল। ফ্রান্সিস শুয়ে পড়ল। তখনই দেখল আরো কয়েকজন মানুষ হাত-পা বাধা অবস্থায় বসে অছে। বোঝা গেল ওরাও বন্দী।

একটু পরেই সর্দার যোদ্ধা কয়েকজন যোদ্ধাকে নিয়ে এল। যোদ্ধারা ফ্রান্সিসদের হাত-পা শক্ত শুকনো লতাগাছ দিয়ে বাঁধতে লাগল। ফ্রান্সিস হাত মুছড়ে বুঝল বুনে লতা বেশ শক্ত। দড়ি বাঁধলে তবু সহ্য করা যায়। কিন্তু এই শুকনো বুনোলতা হাতে পায়ে যেন কেটে বসছে।

দুপুর হয়ে এল। শাঙ্কো একজন যোদ্ধার দিকে তাকিয়ে গলা চড়িয়ে বলল—আমাদের খিদে পেয়েছে। খেতে দাও। খাবার জল দাও।

—চেঁচিও না। অপেক্ষা কর। যোদ্ধা সর্দার বলল।

হাত-পা বাঁধা শেষ হল।

একটু পরেই নারকোল গাছের গুড়ি কুঁদে বড় পাত্র মত করার পাত্র নিয়ে কয়েকজন এল। মাটির পাত্রে জল। সবার সামনে পাতা দেওয়া হল। ভাত সামুদ্রিক মাছের ঝোলমত দেওয়া হল।

হ্যারি যোদ্ধা সর্দারের দিকে তাকিয়ে বলল—হাত-বাঁধা। খাবো কী করে?

—ওভাবেই খেতে হবে। রাজার হুকুম। যোদ্ধা সর্দার বলল।

ক্ষুধার্ত ফ্রান্সিসরা কেউ আর কোন কথা বলল না। বেশ অসুবিধার মধ্যেই ওরা খাবার খেয়ে নিল।

—সান্ধ্য হল। ফ্রান্সিসরা কোনরকমে শুয়ে বসে রইল।

রাতের খাওয়া শেষ হল। চাঁদের আলো বেশ উজ্জ্বল। চারপাশে সব কিছু মোটামুটি স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। শাঙ্কো ফ্রান্সিসের কাছে এল। ফিস্‌ফিস্ করে বলল—ছোরাটা বের করবো?

—না আজকে নয়। দু-একদিন যাক। আমরা নতুন। ওরা এখন আমাদের কড়া পাহাড়ায় রাখবে। ফ্রান্সিস বলল।

—প্রহরীই তো নেই। শাঙ্কো বলল।

—রাজবাড়ির দিকে তাকিয়ে দেখো ঝাউ গাছটার নিচে তিনজন প্রহরী বসে আছে। ফ্রান্সিস আস্তে বলল।

—মাটিতে বসে আছে? শাঙ্কো বলল।

—না। নারকোল গাছের কাটা কাঠের ওপর। আমি অনেকক্ষণ যাবৎ লক্ষ্য করছি তাই দেখতে পেয়েছি।

—তাহলে পালাব না? শাঙ্কো বলল।

—নিশ্চয়ই পালাবো। সমস্ত সুযোগ বুঝে। ফ্রান্সিস আস্তে বলল।

সকলের খাবার খাওয়া হল। হাত-পা বাঁধা অবস্থাতেই। বাঁধা হাত নিয়ে খাওয়া। অর্ধেক খাবারই পড়ে গেল। কিন্তু ওরা বুঝল এই অবস্থাতে থাকতে হবে। পালাতে না পারলে এই জীবনই মেনে নিতে হবে।

দুপুরে রাজা কুতুবু এল। হাতের শেকলে বাঁধা একটা অ্যালশেসিয়ান কুকুর। ফ্রান্সিসদের ঐ অবস্থায় দেখে কুকুরটা ঘেউ ঘেউ শুরু করল। বিরক্তির সঙ্গে শাঙ্কো বলে উঠল—কুকুরের ডাক থামান।

—তোমাদের বিদেশি দেখে তো তাই ডাকছে। চিনে গেলে আর ডাকবে না। কালো মুখে সাদা দাত বের করে কুতুবু হেসে ফেলল। তারপর বলল—ভাবছি তোমাদের ভাঙা জাহাজটা বিক্রি করে দেব। কী হবে আর ঐ জাহাজটা রেখে। তোমরা তো আর ঐ ভাঙা জাহাজে এই জীবনে আর চড়তে পারবে না। বিক্রি করে মাঝখান থেকে আমার কিছু স্বর্ণমুদ্রা আয় হবে।

ফ্রান্সিসরা কেউ কোন কথা বলল না।

—তোমরা কী বল? কুতুবু হেসে জানতে চাইল।

ফ্রান্সিস বেশ কষ্ট করে উঠে দাঁড়াল। বলল—তাহলে আপনার জীবন বিপন্ন হবে।

—কী? আমাকে হত্যা করবে? রাজা কুতুবু চিৎকরে করে বলে উঠল। হ্যারি সঙ্গে সঙ্গে চাপা স্বরে বলল—ফ্রান্সিস শান্ত হও। ভুলে যেও না আমরা বন্দী। রাজা আমাদের আরও ক্ষতি করতে পারে।

রাজার চিৎকার শুনে প্রহরীরা খোলা তরোয়াল হতে ছুটে এল।

—তোমাদের এক বেলার খাবার বন্ধ করে দেওয়া হল। দেখি তোমাদের গায়ে কত জোর। রাজা কুতুবু গলা চড়িয়ে বলল।

—একবেলা কেন—দু'বেলার খাবারই বন্ধ করে দিন। তাড়াতাড়ি মরে যেতে পারবো। এই জানোয়ারের মত বেঁচে থাকা—। হ্যারি বলল।

—জাহাজ চোরদের এভাবেই শাস্তি দিতে হয় যাতে ভবিষ্যতে আর জাহাজ চুরি না করে। রাজা কুতুবু বলল।

—আমাদের আর ভবিষ্যৎ কোথায়। এখানেই তো আমাদের জীবন শেষ। ফ্রান্সিস বলল। রাজা ছুটে ফ্রান্সিসের কাছে এল। চেঁচিয়ে বলল—তুমিই এই দলের সর্দার—না?

—হ্যাঁ। ফ্রান্সিস ঘাড় নাড়ল।

—আমাকে হত্যা করার হুমকি দিয়েছো। রাজা কুতুবু বলল।

—হ্যাঁ। ফ্রান্সিস বলল।

—তোমাকে গাছের ডালে লটকাবো। কথাটা বলেই রাজা কুতুবু প্রহরীদের দিকে তাকাল। চেঁচিয়ে বলল অ্যাই—এটাকে ঐ বড় গাছটার ডালে দড়ি দিয়ে বেঁধে ঝুলিয়ে রাখ।

প্রহরী কয়েকজন তরোয়াল কোমরে গুঁজে ফ্রান্সিসদের কাছে ছুটে এল। ফ্রান্সিস দাঁড়িয়েই ছিল। ওরা ফ্রান্সিসকে টেনে নিয়ে চলল বড় গাছটার দিকে।

গাছের প্রথম ডালটা বেশ উঁচুতে। প্রহরীরা গাছের ডালে উঠল। ডালে দড়ির ফাঁস পড়াল। তারপর দড়ির মাথা নামিয়ে দিল। নিচে থেকে প্রহরীরা ফ্রান্সিসের বাঁধা হাতের মধ্যে দড়ি ঢুকিয়ে ডালে বসা প্রহরীটার হাতে দড়ির মুখটা ছুঁড়ে দিল। প্রথমবার ডালেবসা প্রহরীটি দড়ির মুখটা ধরতে পারল না। আবার দড়ির মুখাটা ছোঁড়া হল। এবার ও ধরে ফেলল। দঁড়িটা টানতে লাগল। হাত-পা বাঁধা ফ্রান্সিস ওপরের দিকে উঠতে লাগল। বেশি কিছুটা উঠতে প্রহরীটা দড়িটা ডালে জড়িয়ে শক্ত করে বেঁধে দিল। ফ্রান্সিসের শরীরটা ঝুলতে লাগল।

রাজা কুতুবু গাছের তলায় এল। ওপরের ফ্রান্সিসের দিকে তাকিয়ে বলল— আমাকে হত্যার হুমকি? মর্ না খেয়ে। খাবার জলও পাবি না।

—আমাদের জাহাজী জীবন। মাঝে মাঝেই খাদ্যে জলে টান পড়ে। ফ্রান্সিস আর কোন কথা বলল না। আর কিছু বলতে গেলে রাজা চটে যেতে পারে। চুপ করে থাকাই ভালো।

রাতে খাওয়ার পর শাঙ্কো হ্যারির কাছে এল। বলল —হ্যারী কি করবে?

—কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না। ফ্রান্সিস এভাবে মেজাজ হারাবে ভাবি নি। হ্যারি বলল।

—কিন্তু ফ্রান্সিসকে তো বাঁচাতে হবে। শাঙ্কো বলল।

—সেটা একমাত্র তুমি পারো। ছোরাটা আছে তো? হ্যারি বলল।

—তা আছে। শাঙ্কো মাথা ওঠানামা করল।

—আর একটা দিন দ্যাখো। হ্যারি বলল।

—খাবার না পেয়ে, জল না পেয়ে ফ্রান্সিস বাঁচবে না। শাঙ্কো বলল। আমরা তার আগেই ওকে নিয়ে পালাবো। হ্যারি বলল।

—দুপুরে খেতে দেয় নি। রাতের বেলায়। কিন্তু হাত বাঁধা। অর্ধেক খাবার ফেলা গেল। শাঙ্কো বলল।

—তা তো হবেই। হ্যারি বলল।

—শরীর বেশ দুর্বল লাগছে। শাঙ্কো বলল।

—দুর্বলতাকে প্রশয় দিও না। শরীরের দুর্বলতা মনকেও দুর্বল করে করে। হ্যারি বলল

—তাহলে বলছো কালকে পালাব। শাঙ্কো বলল।

—হ্যাঁ আমি ছক কষেছি। প্রহরীদের কাছে যাচ্ছি। হ্যারি বলল।

—প্রহরীদের কাছে? কেন? শাঙ্কো জানতে চাইল।

—গায়ে দেবার চাদরের মত মোটা কাপড় চাইবো। হ্যারি বলল।

—দেবে? শাঙ্কো বলল।

—দেখি। না দিলে রাজা কুতুবুর কাছে চাইবো। তাই একদিন সময় নিচ্ছি। হ্যারি বলল।

—এই গরমে গায়ের চাদর নিয়ে কী করবে?

ছক বলবো। আর বুঝবে। হ্যারি বলল।

হ্যারি উঠে দাঁড়াল। পা বাঁধা। থপ্ থপ্ করে লাফিয়ে লাফিয়ে প্রহরীদের কাছে গেল।

চাঁদের আলোয় হ্যারিকে দেখে একজন প্রহরী উঠে এল। বলল—কী ব্যাপার?

—বড্ড ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে। গায়ে দেবার মত মোটা কাপড় চাই। হ্যারি বলল।

প্রহরীটি হো হো করে হেসে উঠল। বলল—ঠাণ্ডা? তোমায় ঠাণ্ডা?

—আমাদের ঠাণ্ডা লাগছে। মোটা কাপড় দাও। হ্যারি বলল।

—আমরা দিতে পারবে না। রাজা বললে তবে পাবে। প্রহরী বলল।

—বেশ। রাজাকে বলবো। হ্যারি ফিরে এলো।

হ্যারি ফিরে এলে শাঙ্কো জানতে চাইল—

—কী? দেবে কাপড়?

—এরা দেবে না। রাজা কুতুবুকে বলতে হবে। কালকে বলবো?

—দেখ বলে। কিন্তু এই গরমে মোটা কাপড় চাইছো কেন?

—পালবার ছক।

—খুলে বলো তো।

হ্যারি আস্তে আস্তে ওর পালাবার ছকের কথা বলল? শাঙ্কো চাপা গলায় বলে উঠল—শাবাস হ্যারি।

—এখন সবকিছু নির্ভর করছে তোমার ওপর। ছোরা দিয়ে কত তাড়াতাড়ি হাত পায়ের বাঁধা লতা কাটতে পারো। হ্যারি বলল।

—দড়ি কাটার চেয়ে কম সময় লাগবে। শাঙ্কো বলল।

—তাহলে তো ভালোই। হ্যারি বলল।

পরের দিন দুপুরেও হ্যারিদের খেতে দেওয়া হল না।

বিকেলের দিকে রাজা কুতুবু এল। হেসে বলল— এবার তোমাদের গায়ের জোর কমবে। মেজাজ ঠাণ্ডা হবে। পালাবার কথা আর কল্পনাতেও আনবে না।

হ্যারি উঠে দাঁড়াল। বলল—মহামান্য রাজা আমার কিছু বলার ছিল। কুতুবু খুব খুশি। ওকে মহামান্যটান্য তো কেউ বলে না। হেসে বলল—বলো।

—আমরা ঠাণ্ডায় কষ্ট পাচ্ছি। হ্যারি বলল।

—তোমাদের ঠাণ্ডা লাগছে? বলো কি? রাজা বলল।

—হ্যাঁ। একবেলা খেয়ে শরীর দুর্বল হয়ে পড়েছে। ঠাণ্ডা সহ্য করতে পারছি না। আমাদের মোটা কাপড় দিন যাতে আমরা একসঙ্গে গায়ে দিতে পারি। হ্যারি বলল।

তখন মোটা কাপড় বালিয়ারিতে পাতা হয়। সেই কাপড়টা দেয়া যায় কিনা দেখি। রাজা বলল।

—মাননীয় রাজা। আর একটা অনুরোধ। হ্যারি বলল।

—বলো। রাজা বলল।

—আমি ফ্রান্সিস মানে আমাদের দলনেতা যে গাছের ডালে ঝুলছে তাকে কয়েকটা কথা বলতে চাই। হ্যারি বলল।

—বেশ। গিয়ে বল। কিন্তু ওর মুক্তি নেই। রাজা বলল।

—তা জানি। আমি বললে ও হয়তো আপনার কাছে মাফ চাইবে। হ্যারি বলল।

—তাহলে যাও। কথা বল। রাজা বলল।

রাজা কুতুবু চলে গেল। যাবার আগে ঝুলন্ত ফ্রান্সিসের দিকে একবার তাকিয়ে গেল। যাবার সময় প্রহরীদের কী বলে গেল।

একজন প্রহরী হ্যারিদের কাছে এল। বলল কথা বলতে যাবো। এসো।

হ্যারি দাঁড়িয়ে ছিল। প্রহরীর পিছু পিছু চলল।

ফ্রান্সিস ডালে ঝুলছে।

হ্যারি এসে নিচে দাঁড়াল। দেশীয় ভাষায় বলল—না —হেসো না। কোনরকম আনন্দ প্রকাশ করো না। আমার ছক বলছি। তারপর হ্যারি গরগর্ করে ওর ছক বলে গেল। ফ্রান্সিস কোন কথা বলল না।

ফেরার পথে প্রহরী বলল—কী বললে? —বললাম যে ও যেন রাজা কুতুবুর কাছে মাফ চায়। হ্যারি বলল, প্রহরী খুশির হাসি হাসল।

সন্ধ্যের সময় প্রহরীরা একটা বিরাট মোটা কাপড় নিয়ে এল। কাপড়টা হ্যারিদের সামনে রাখল।

—তাতে খাওয়ার পর সবাই গায়ের ওপর পেতে দেব। এখন থাক। হ্যারি বলল।

প্রহরীরা কাপড় রেখে চলে গেল। হ্যারি গলা নামিয়ে ডাকল—শাঙ্কো। শাঙ্কো হ্যারির কাছে এল।—সবাইকে ফিসফিস করে আমার পালাবার ছকের কথা বলে দাও। হ্যারি আস্তে বলল।

শাঙ্কো একে একে সবার কাছে গেল। হ্যারির ছকের কথা ফিসফিস করে বলে এল। শাঙ্কো সাবধান করে বলে এল—এই ছকের বাইরে কেউ যাবে না।

রাতের খাওয়া শেষ হল।

হ্যারি বলল—সবাই শুয়ে পড়। ভাইকিংরা সবাই শুয়ে পড়ল। শাঙ্কো আর বিস্কো বিরাট কাপড়টা সবার গায়ের ওপর পেতে দিল। এক বন্ধু বলল—এই গরমে গায়ে মোটা কাপড়। — আপত্তি করো না। হ্যারি বলল।

সবাই কাপড়ের নিচে শুয়ে পড়ল।

তখন মাঝ রাত।

হ্যারি চাপাস্বরে ডাকল—শাঙ্কো। চলো।

দু'জনে কাপড়ের তলা থেকে বেরিয়ে এল। তারপর ঘাসের ওপর শুয়ে পড়ল। হিঁচড়ে হিঁচড়ে চলল একটা আগাছার ঝোপের দিকে।

পৌঁছল সেখানে। বেশ কিছু আগাছা মাঠ থেকে উপড়ে তুলল। তারপর ফিরে এল। অনেকের হাতে আগাছা গুলো দিল। ওরা আগাছা গুলো মাটিতে চেপে

রাখল। আগাছাগুলি কাপড়টার এখানে-ওখানে উঁচিয়ে রইল। দূর থেকে দেখাবে যেন মানুষের মাথা। মানুষ শুয়ে আছে।

এইবার আসল কাজ। কাপড়ের তলা দিয়ে শাঙ্কো বিস্কোর কাছে এল। বিস্কোর ওর বাঁধা হাত শাঙ্কোর গলার দিক দিয়ে ঢুকিয়ে ওর পোশাকের তলা থেকে ছোরাটা বের করল। তারপর দ্রুত হাতে শাঙ্কোর হাতের লতার বাঁধন কাটতে লাগল। একটু পরেই শুকনো লতা কেটে গেল। শাঙ্কো ছোরাটা নিল। পায়ের বাঁধন কাটল। তারপর বিস্কোর হাত পায়ের বাঁধন কাল। এবার বিস্কো ছোরাটা নিল। হ্যারির হাত-পায়ের বাঁধন কাটল। আস্তে আস্তে সবার হাত পায়ের বাঁধন কাটা হল। এমন কি দু'জন কালো বন্দীর হাত পায়ের বাঁধন কাটা হল।

হ্যারি চাপা গলায় বলল—যে গাছটায় ফ্রান্সিস ঝুলছ সেই গাছের তলা দিয়ে পায়ে চলা পথ। সবাই গড়িয়ে গড়িয়ে চলে যাও। আস্তে আস্তে। শব্দ না হয়। তারপর পায়ে চলা পথ ধরে সমুদ্রেতীরে।

হ্যারি যখন এই নির্দেশগুলো দিচ্ছে শাঙ্কো ফ্রান্সিসের ঝুলে থাকা গাছটার নিচে চলে এসেছে।

শাঙ্কো কোন শব্দ না করে দ্রুত গাছটায় উঠল। ফ্রান্সিসদের হাতের বাঁধন কেটে দিল। ফ্রান্সিস সোজা এক ঝোপের ওপর পড়ল। যাতে শব্দ না হয় তার জন্যে সোজা হয়েই নেমেছিল। তবু শব্দ হল। দুজনেই চুপ করে যে যার জায়গায় রইল। একটু পরে বোঝা গেল শব্দটা প্রহরীদের কানে যায়নি।

ওদিকে হ্যারিরা দ্রুত ছুটছে সমুদ্রতীরের দিকে।

শাঙ্কো নিচু হয়ে ফ্রান্সিসের পায়ে বাঁধা দড়ি কেটে দিল। এবার দু'জনে পায়ে চলা পথটা ধরে ছুটল সমুদ্রতীরের দিকে। সবাই সমুদ্রতীরে পৌঁছল। ওদের জাহাজের কাছে এসে দাঁড়াল। কম বেশি সবাই হাঁপাচ্ছে।

জাহাজ থেকে পাটাতন পাতা নেই। চাঁদের আলোয় চারদিকে মোটামুটি স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

—শাঙ্কো—পাটাতন। ফ্রান্সিস বলল। শাঙ্কো জলে নামল। ডুব দিল। ডুব সাঁতার দিয়ে ওদের জাহাজের গায়ে গিয়ে উঠল। দড়ির মই ঝোলানো নেই। ডেকও তোলা। হালের কাছে ঝুলন্ত দড়িদড়া ধরে শাঙ্কো ডেক-এ উঠে এল। মাস্তুলের আড়াল থেকে দেখল কেউ নেই। ও আস্তে আস্তে পাটাতনটা বের করে নিয়ে এল। কোন শব্দ না করে পাটাতনটা পেতে দিল। তারপর ছুটল অস্ত্র ঘরের দিকে। আট-দশটা তরোয়াল বগলদাবা করে নিয়ে এল। ডেক থেকে তরোয়ালগুলো একটা একটা করে বালির ওপর ছুঁড়ে ফেলতে লাগল। বালির ওপর তরোয়ালগুলো পড়ায় কোন শব্দ হল না। প্রথম তরোয়ালটা ফ্রান্সিস তুলে নিল। অন্য বন্ধুরাও এবার তরোয়াল তুলে নিল।

ফ্রান্সিস ভাবল জাহাজে নিশ্চয়ই সেই যুবকরা আছে। তার মানে সামনেই লড়াই।

আস্তে আস্তে তরোয়াল হাতে সবাই জাহাজের ডেক-এ উঠে এল। এত মানুষের জাহাজে ওঠা মৃদুস্বরে কথাবার্তা। কেবিন ঘরের এক যুবকের ঘুম ভেঙ্গে গেল। সে তরোয়াল হাতে ডেক-এ উঠে এল। চাঁদের আলোয় ফ্রান্সিসদের দেখে সে অবাক।

—তরোয়াল ফেলে দাও। লড়তে এলে মরবে। ফ্রান্সিস একটু গলা চড়িয়েই বলল। যুবকটি বুঝল লড়তে গেলে ওর জীবন বিপন্ন হবে। ও ডেক-এর ওপর তরোয়াল ফেলে দিল। তাতে ঝনাৎ করে শব্দ হল। কেবিন ঘরে ঘুমন্ত যুবকদের ঘুম ভেঙে গেল। তখন ভোর হয়ে এসেছে।

যুবকরা দল বেঁধে তরোয়াল হাতে ওপরে ডেক-এ উঠে এল। খোলা তরোয়াল হাতে ফ্রান্সিসদের দেখে ওরা থমকে দাঁড়াল। ফ্রান্সিস তরোয়াল ঘুরিয়ে দাঁত চাপাস্বরে বলল—তোমরা যদি লড়াই চাও আমরা লড়াই করবো। কিন্তু আমরা সংখ্যায় বেশি। প্রত্যেকের হাতেই তরোয়াল রয়েছে। ভুলে যেও না ভয় পাই না। লড়াই হলে তোমরা কেউ বাঁচবে না।

যুবকরা মৃদুস্বরে নিজেদের মধ্যে কথা বলতে লাগল। ওদিকে একটি যুবক মারিয়ার কেবিন ঘরে ঢুকল। মারিয়ারও ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। মারিয়া ডেক-এ আমার জন্যে বিছানা ছেড়ে উঠল। দেখল দরজায় তরোয়াল হাতে একটি যুবক দাঁড়িয়ে আছে। যুবকটি ছুটে এসে হাতের তরোয়ালের ডগাটা মারিয়ার গলায় চেপে ধরে গম্ভীরগলায় বলল—ওপরে চলো। নিরুপায় মারিয়া দরজার দিকে চলল। ডেক-এ উঠে এল।

ফ্রান্সিস অবাক। মারিয়া এই জাহাজে এলো কী করে? বোধহয় ওদের খোঁজেই মারিয়া এই জাহাজে এসেছিল। তারপর বন্দী হয়েছে।

ফ্রান্সিসরা দেখল যুবকটি মারিয়ার গলায় তরোয়াল চেপে আছে।

এখানে তো মারিয়ার জীবন বিপন্ন।

যুবকটি গলা চাপাস্বরে বলল—সবাই জাহাজ থেকে নেমে যাও। তারপর রাজা কুতুবুর যোদ্ধাদের হাতে ধরা দাও। নইলে তোমাদের এই সঙ্গিনীকে মেরে ফেলবো।

কেউ কিছু বোঝার আগেই শাঙ্কো দ্রুত গলার দিক দিয়ে হাত ঢুকিয়ে ওর ছোরাটা বের করল। তারপর এক মুহূর্ত দেরি না করে যুবকটির বুক লক্ষ্য করে ছুঁড়ল। শাঙ্কোর নিশানা নিখুঁত। ছোরাটা যুবকটির বুকে বিঁধে গেল। ও চিৎ হয়ে পড়ে গেল। হাত থেকে তরোয়াল ছিটকে গেল। ও এপাশ ওপাশ করল। তারপর স্থির হয়ে গেল।

ফ্রান্সিস বুঝল আবার মারিয়াকে হত্যার চেষ্টা হবে। এক মুহূর্তে দেরি না করে ও তরোয়াল হাতে যুবকদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। বন্ধুরা ধ্বনি তুলল—ও হো হো। তারপর ওরাও যুবকদের ঠোকাঠুকির ধাতব শব্দ। সুযোগ বুঝে মারিয়া ছুটে এসে ফ্রান্সিসদের পেছনে দাঁড়াল।

ফ্রান্সিস প্রথম সুযোগেই একজন যুবকের বুকে তরোয়াল ঢুকিয়ে দিল। ও চিৎ হয়ে ডেক-এর ওপর পড়ে গেল। লড়াই চলল। অল্পক্ষণের মধ্যেই সংখ্যায় বেশি

ভাইকিংদের কাছে যুবকরা হার স্বীকার করতে লাগল। কেউ কেউ আহত হয়ে ডেক-এ পড়ে গেল। দুজন যুবক তরোয়াল ফেলে সমুদ্রের জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। সাঁতরে তীরে উঠল। তারপর ছুটল রাজবাড়ির দিকে।

আহত যুবকরা জাহাজ থেকে নেমে গেল।

তখনই ভোরের আলোয় দেখা গেল রাজা কুতুবের প্রহরীরা খোলা তরোয়াল হাতে ছুটে আসছে।

ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে বলল—আর লড়াই না। পাল খোল। দাঁড় ঘরে যাও। নোঙর তোল। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব জাহাজ চালাও।

ততক্ষণে পাল খোলা হয়ে গেছে। দাঁড়াটানতেও ভাইকিং বন্ধুরা চলে গেছে। ফ্রেজার হুইলে দাঁড়াল। নোঙর তোলা হয়ে গেছে।

জাহাজ চলল। অল্পক্ষণের মধ্যেই জাহাজ গতি পেল। রাজা কুতুবুর প্রহরীরা ভাঙা জাহাজে উঠল। ফ্রান্সিসদের জাহাজ ধরবার জন্যে ওরাও ভাঙা জাহাজ চালাল। কিন্তু তাদের জাহাজ তেমন গতি পেল না। ফ্রান্সিসদের জাহাজের সঙ্গে তাদের জাহাজের দূরত্ব বেড়েই চলল।

প্রহরীরা হাল ছেড়ে দিল। ওদের জাহাজ থেমে গেল।

ফ্রান্সিসদের জাহাজ চলল।

ভাগ্য ভালো। ওদের ঝড়ের মুখে পড়তে হল না।

একদিন পরে। জাহাজে জলাভাব দেখা দিল।

চারটে পীপের মধ্যে মাত্র একটা পীপেয় অর্ধেক জল আছে। তিনটি পীপেই ফাঁকা।

হ্যারি ফ্রান্সিসদের কাছে এল। বলল—ফ্রান্সিস কী করবে?

—পেড়োকে বলো—ভালো ভাবে নজর রাখতে। কোন দ্বীপটীপ দেখা যায় কিনা।

জাহাজ চলল। নজরদার পেড্রো মাস্তুলের ওপর থেকে নজর রেখে চলেছে।

পরদিন দুপুরের দিকে পেড্রো মাস্তুলের ওপর থেকে চেঁচিয়ে বলে উঠল — ডাঙা দেখা যাচ্ছে ডাঙা। বিস্কো ফ্রান্সিসকে ডেকে নিয়ে এল।

ফ্রান্সিস ফ্রেজারের কাছে গেল। বলল

—একটা দ্বীপমত দেখা যাচ্ছে। কত বড় দ্বীপ বা এই দ্বীপে মানুষ আছে কি না বোঝা যাচ্ছে না। দ্বীপের কাছে যাও। জাহাজ ভেড়াও। জল নিতে হবে।

দ্বীপটা বেশি বড় নয়। তবে বেলাভূমি বিস্তৃত। ফ্রান্সিস আরসিনাকে জল আনতে যেতে বলল। দুজনে কিছু আগেই দুপুরের খাবার খেয়ে নিল। জাহাজ থেকে পাটাতন ফেলা হল।

শাঙ্কো এগিয়ে এল। বলল—ফ্রান্সিস আমি গেলে ভালো হত না। —না-না। জল আনবো। এইজন্যে তোমার মাস্তুলের দরকার নেই। ফ্রান্সিস বলল

বিস্কো আর সিনেত্রা দুটো খালি পীপে নিয়ে জাহাজ থেকে নেমে এল। বালিয়াড়ি পার হয়ে চলল। কিছু দূরেই কয়েকটা ঘরবাড়ি দেখল।
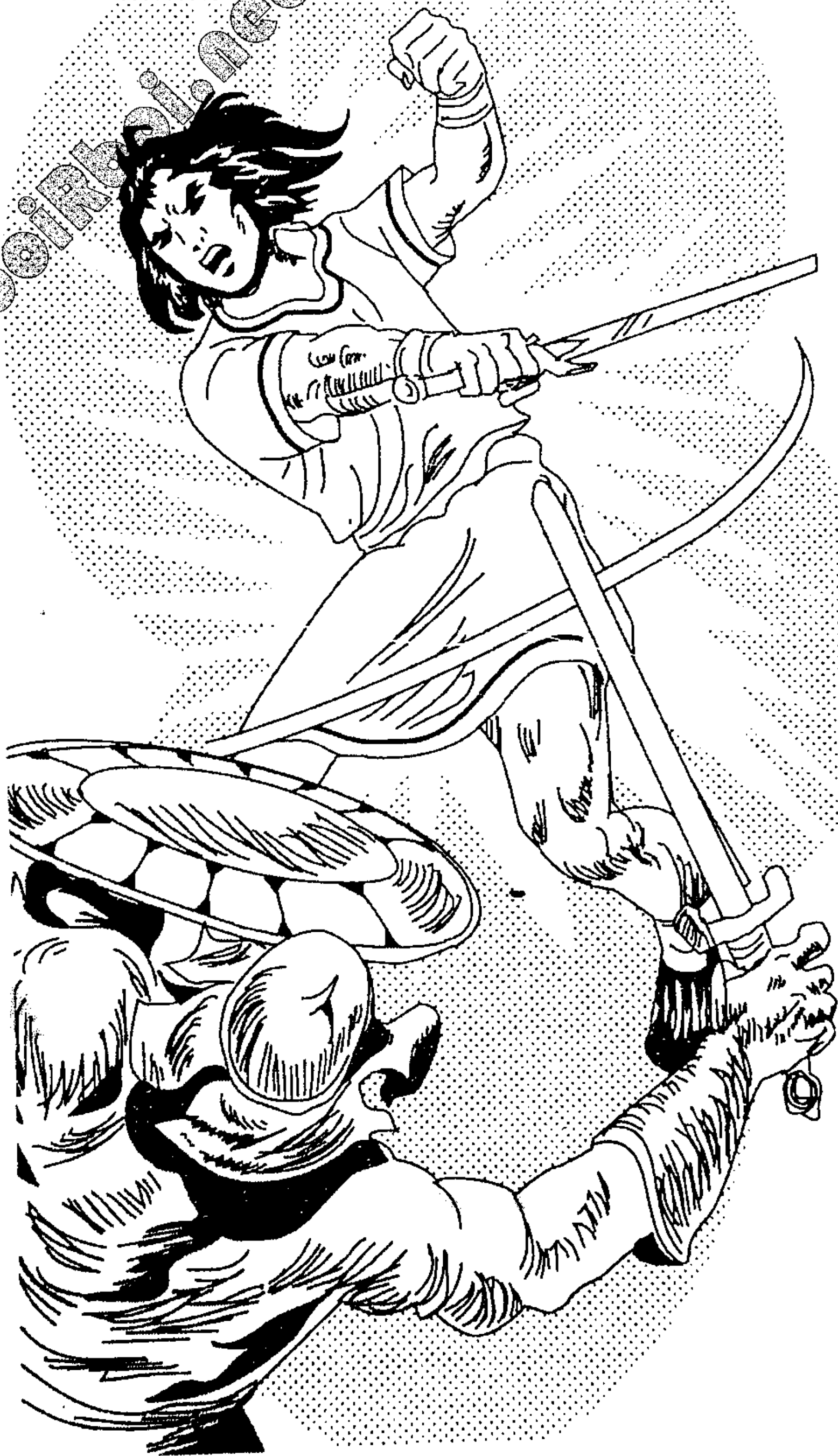
—চলো। ওখানকার লোকদের কাছে জলের খোঁজ করি। বিস্কো বলল।

—চলো। সিনেত্রা মাথা নেড়ে বলল।

বাড়িগুলোর কাছাকাছি এসে দেখল। সব কালো নারীপুরুষ বাচ্চা-ছেলেমেয়ে। বোঝা গেল এখানে কালো লোক য়জনেরই বাস।

বর্শা হাতে এক যুবক ওদের দিকে এগিয়ে এল। বলল—তোমরা কে?

—আমরা বিদেশি—ভাইকিং। বিস্কো বলল।

—এখানে কেন এসেছো? যোদ্ধাটি জিজ্ঞেস করল।

—আমরা জাহাজে চড়ে এখানে এসেছি। জাহাজে খাবার জল ফুরিয়ে এসেছে। তাই খাবার জল নিতে এসেছি। বিস্কো বলল।

—তোমরা জানো আমাদের সর্দার অনুমতি না দিলে এখান থেকে এক ফোঁটাও জল নিয়ে যেতে পারবে না। যোদ্ধাটি বলল।

—না। আমরা জানি না। সিনেত্রা বলল।

—সর্দারের কাছে চলো। এই বলে যুবকটি একটা বড় বাড়ির দিকে হেঁটে চলল। বিস্কোরাও পীপের হাতে পেছনে পেছনে চলল।

যেতে যেতে সিনেত্রা বলল—বোধহয় বিপদে পড়লাম।

—না-না। সর্দারের কাছে অনুমতি নেব। জল নিয়ে চলে যাবো। বিস্কো বলল।

যোদ্ধা যুবকটি বাড়ির সামনে ঘরটার কাছে এল। বলল—ঘরে ঢোক।

দুজনে ঘরে ঢুকল। প্রায় অন্ধকার ঘর। অন্ধকারটা চোখে সয়ে আসতে দেখল ঘরে একটা নারকোল গাছ কেটে পায়াওয়ালা একটা কাঠের তক্তপোষ একটি কালো মতো বয়স্ক লোক বসে আছে। গায়ে বেশ দামি কাপড়ের জামা। পরনে রঙিন পায়জামা।

যোদ্ধা যুবকটি বলল—আমাদের সর্দার। মাথা নোয়াও। দুজ'নে মাথা একটা নোয়াল। যোদ্ধাটি বলল—এরা বিদেশি। কী যেন কিং-এর জাত। এখানে খালি পীপে হাতে জল নিতে এসেছে.

—চালাকি—চালাকি। এরা চোর। আমার রত্নভাণ্ডার চুরি করতে এসেছো। বেশ গলা চড়িয়ে সর্দার বলল।

—আমাদের মিথ্যে দোষ দিচ্ছেন। আমরা চোর নই। বিস্কো বলল।

—উঁহু। তোমরা জল খোঁজার নাম করে রাত পর্যন্ত এখানে থাকবে। তারপর রাত বেশি হলে আমার রত্নভাণ্ডার চুরি করে পালাবে।—এই মতলব তোমাদের। সর্দার বলল।

—আমরা এই দ্বীপে এই প্রথম এসেছি। আমরা জানিই না যে আপনার রত্নভাণ্ডার আছে। সিনেত্রা বলল।

—সব জানো তোমরা। আমার রত্নভাণ্ডারের খোঁজে এসেছো তোমরা। সর্দার বলল। তারপর চেঁচিয়ে বলল—দুটোকেই কয়েদ ঘরে ঢোকা। আরো দুটো চোর বোধহয় আছে ওখানে।

—হ্যাঁ। যোদ্ধাটি মাথা ঝাঁকিয়ে বলল।

দুজনে কী বলবে বুঝে উঠতে পারল না। সিনেত্রা বলবার চেষ্টা করল—

—শুধু সন্দেহের বশে আমাদের—

—চোপ্—সর্দার ধমকে উঠল!

যোদ্ধাটি ওদের ঘরের বাইরে নিয়ে এল। তখনও দুজনের হাতে পীপে।

বাইরে এসে দেখল প্রায় আট-দশখানা যোদ্ধা বর্শা হাতে দাঁড়িয়ে আছে। যোদ্ধাটি এগিয়ে গিয়ে ওদের কী বলল। দু'জন যোদ্ধা এগিয়ে এল। ওর পেছনে পেছনে আসতে ইঙ্গিত করল।

দু'জনে পিপে হাতে চলল।

একটা বড় গাছের নিচে ছোটঘর। গাছের ডাল দিয়ে তৈরি দেয়াল। মাটি লেপা। ঘরটার সামনে দু'জন প্রহরী দাঁড়িয়ে। দুজনে যেতেই একজন প্রহরী কোমরের ফেটি থেকে চাবি খুলল। দরজার তালা খুলে ঢুকতে বলল। দু'জনে ঢুকে যাবে একজন প্রহরী পীপেটা নেবে বলে হাত বাড়াল। সিনেত্রা পীপে সরিয়ে নিয়ে বলল—না পীপে দুটো আমাদের কাছেই থাকবে। প্রহরীটি আপত্তি করল না।

ঘর অন্ধাকর। জানালা বলে কিছু নেই। মাথার ওপরে বেশ উঁচুতে বেলে মাটি আর শুকনো ঘাসের ছাঁউনি।

. মেঝেয় নারকেল পাতায় ছড়ানো। তার ওপরেই দুজনে বসল। প্রহরী এসে নারকেলের দড়ি দিয়ে দুজনের হাত বেঁধে দিয়ে গেল।

অন্ধকার চোখে সয়ে আসতে দেখল আরো দুজন বন্দী রয়েছে। দুজনেই কালো। একজন বিস্কোর কাছে এগিয়ে এল। বলল—তোমার তো বিদেশি। তোমাদের আটকালো কেন?

—আমরা নাকি চোর। সর্দারের রত্নাভাণ্ডার চুরি করতে এসেছি। সিনেত্রা বলল।

—আমরা পাকুই দ্বীপের বাসিন্দা। বেকার। এখানে এসেছিলাম কাজের খোঁজে। আমাদেরও চোর বলে আটকে রেখেছে। কালো লোকটা বলল।

—সর্দারের এটা একটা চালাকি। চোর অপবাদ দিয়ে এইভাবে আটকে রাখা। বিস্কো বলল। কালো লোকটা আর কোন কথা বলল না। অন্য লোকটি এগিয়ে এল। ফিস ফিস করে বলল—এখান থেকে পালানো যায় না?

—কী করে পালাব? দরজায় দুজন প্রহরী বর্শা হাতে দাঁড়িয়ে থাকে। পালাতে গেলে মরতে হবে। বিস্কো বলল।

—একটা উপায় বের করতে হবে। লোকটা বলল।

—দেখি কয়েকটা দিন। সিনেত্রা বলল।

সেদিন কাটল।

ওদিকে ফ্রান্সিসরা চিন্তায় পড়ল। বিস্কো সিনেত্রা জল আনতে গিয়ে সারা রাতেও ফিরল না।

পরদিন সকালে শাঙ্কো বলল—আমি একা যাচ্ছি। জাহাজে জলভাব। জল তো আনতে হবে।

—বেশ যাও। তবে বিপদ দেখলে পালিয়ে এসো। কোনরকমে ওদের দুজনের খোঁজ নিয়ে এসো। তেমন অবস্থা দেখলে আমরা সবাই যাবো। আর তরোয়াল নিয়ে যেও না। ফ্রান্সিস বলল।

শাঙ্কো জাহাজ থেকে নেমে এল। চলল। বাড়িঘরগুলোর দিকে।

বাড়িঘরগুলোর কাছে আসতে দু'জন বর্শাধারী যোদ্ধা ছুটে এলো। শাঙ্কো সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে দাঁড়াল। বালিয়ারির মধ্যে দিয়ে জাহাজের দিকে ছুটল। কিন্তু পালাতে পারল না। বালির ওপর দিয়ে দৌড়ানো যায় না। পা আটকে আছে। যোদ্ধারা বালির ওপর দিয়ে দৌড়াতে অভ্যস্থ। সহজেই শাঙ্কোকে ধরে ফেলল। বর্শা উঁচিয়ে বলল—আমাদের সঙ্গে চলো।

—কোথায় শাঙ্কো জানতে চাইল।

সর্দারের কাছে। যোদ্ধাটি বলল।

—বেশ। চলো। শাঙ্কো বলল।

শাঙ্কো সর্দারের কাছে এসে দাঁড়াল। সর্দার পাতায় মোড়া তামাক টানছিল। একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলল—

এই দ্বীপে কেন এসেছো?

—জল নিতে। শাঙ্কো বলল।

—কীসে করে জল নেবে? সর্দার বলল।

—বন্ধুদের কাছে পীপে আছে। শাঙ্কো বলল।

—ও। তাহলে যে দুটোকে কয়েদ ঘরে আটকে রেখেছি তারা তোমার।

—হ্যাঁ। শাঙ্কো মাথা ওঠানামা করল।

—তোমরা সবাই চোর। আমার রত্নভাণ্ডার চুরি করতে এসেছো। সর্দার বলল।

—আপনার রত্নভাণ্ডারের নামও আমরা শুনিনি। শাঙ্কো বলল।

—এসব চালাকির কথা। তুমিও বন্ধুদের কাছে যাও। সর্দার বলল।

—তার মানে আমিও—শাঙ্কো কথাটা শেষ করতে পারল না।

—হ্যাঁ। বিদেশিদের আমি বিশ্বাস করি না। সর্দার চেঁচিয়ে বলল।

সর্দার কার নাম ধরে ডাকল। একজন যোদ্ধা ঘরে ঢুকল।

—যা। এটাকেও কয়েদঘরে ঢোকা। সর্দার বলল।

যোদ্ধাটি ইঙ্গিতে শাঙ্কোকে বাইরে আনতে বলল। শাঙ্কো সর্দারের ঘরের বাইরে এলো।

আরও একজন যোদ্ধা এগিয়ে এল। দুজনে শাঙ্কোকে নিয়ে চলল কয়েদঘরের দিকে।

শাঙ্কোকে কয়েদ ঘরের সামনে এনে শাঙ্কোর দু'হাত দড়ি দিয়ে বাঁধল। তারপর দরজা খুলে শাঙ্কোকে ঢুকিয়ে দিল।

অন্ধকার ঘরে শাঙ্কো বিস্কোদের ভালো করে দেখতে পেল না।

—শাঙ্কো—তুমিও আটকা পড়লে? বিস্কোরা বলে উঠল।

—পালাতে পারলাম না। অবশ্য আমি ধরা দিতে চেয়েছিলাম যাতে তোমাদের কী হল জানতে পারি শাঙ্কো বলল।

শাঙ্কো নারকোল পাতার ওপরে বসে পড়ল। তারপর শুয়ে পড়ল।

—তাহলে এখান থেকে পালানো যাবে না। সিনেত্রা বলল।

—যাবে। পালানোর ছক কষে ফেলেছি। এখন কাজে লাগানো। শাঙ্কো বলল।

তারপর শাঙ্কো শুয়ে শুয়েই ওর পালাবার ছকের কথা চাপা গলায় বলল। বিস্কো ও সিনেত্রা বলে উঠল—সাবাস শাঙ্কো।

—পীপে দুটো কোথায়? শাঙ্কো জানতে চাইল।

—ঐদিকে কোথায় রেখে দিয়েছি। বিস্কো বলল।

—জল নিয়ে যাওয়া যাবে না। যে অর্ধেক পীপে জল আছে তাই দিয়ে চালাতে হবে হিচকক দ্বীপে পৌঁছোবার আগে পর্যন্ত। শাঙ্কো বলল।

—কখন পালাবে? বিস্কো জানতে চাইল।

—রাতে যখন খাবার দিতে আসবে। শাঙ্কো বলল।

সঙ্কোচ হল। শাঙ্কো উঠে বসল। মাথা নিচু করে বলল—বিস্কো—আমার জামার তলায় ছোরা আছে। বের কর। বিস্কো দড়িবাঁধা হাত শাঙ্কোর জামার নিচে ঢোকাল। আস্তে আস্তে ছোরাটা বের করে আনল। তারপর শাঙ্কোর হাত বাঁধা বিস্কো আর সিনেত্রার হাত বাঁধা দড়ি কেটে দিল। তারপর দুজন কালো মানুষ অবাক চোখে এই কাণ্ড দেখছিল। শাঙ্কো গিয়ে ওদের হাতের দড়িও কেটে দিল। মৃদুস্বরে বলল—রাজাকুতুবু বন্দী মাঠে আমাদের হাত পা বাঁধা ছিল। সেখান থেকে আমরা অতগুলো মানুষ পালাতে পেরেছি। আর এ তো শুধু হাত বাঁধা।

একটু রাত হল।

দুজন প্রহরী খাবার দিতে এল।

দরজা খোলা হল।

একজন প্রহরী খাবার নিয়ে ঘরে ঢুকল।

শাঙ্কো একটা পীপে তুলে নিয়ে তৈরিই ছিল। পীপেটা ছুড়ল প্রহরীটির মুখের দিকে। প্রহরীটি দরজার ওপর পড়ল। হাতে আনা খাবারও ছিটকে গেল। দরজার দুটো পাটাই খুলে গেল।

সবাই ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে এল। সামনেই অন্য প্রহরীটিও অবাক। পরক্ষণেই বর্শা তুলল। শাঙ্কো তৈরি ছিল। ছোরাটা ছুড়ল প্রহরীটির বুকে লক্ষ্য করে। কিন্তু ছোরাটা গেঁথে গেল প্রহরীটির ডান হাতে। বর্শা ফেলে ও মাটিতে বসে পড়ল। শাঙ্কো এক লাফে সামনে গিয়ে ছোরাটা খুলে নিয়ে চাপাস্বরে বলল—ছোটো — প্রাণপণে—জাহাজের দিকে। আহত প্রহরীটি আর্তনাদ করে উঠল।

তিনজনে ছুটল সমুদ্রতীরের দিকে। কালো লোক দুজনও ওদের পিছু পিছু

ছুটল। আহত প্রহরীটির আর্তনাদ শুনেই বোধহয় ঘুমন্ত যোদ্ধাদের কারো কারো ঘুমে ভেঙে গেল। তারা বর্শা হাতে ছুটে বাইরে এল।

চাঁদের আলো ম্লান। তবু শাঙ্কোদের ছুটতে দেখা গেল।

যোদ্ধারা পিছু ধাওয়া করল। শেষে কাছাকাছিও এসে গেল। একজন বর্শা ছুঁড়ল। কালো মানুষের একজনের পিঠে বর্শা ঢুকে গেল। সে গড়িয়ে বালিয়াড়ির ওপর পড়ে গেল।

শাঙ্কোরা ছুটছে। আবার একজন যোদ্ধা বর্শা ছুঁড়ল। কারো গায়েই লাগল না। অন্যজন ছুঁড়ল। শাঙ্কোর বাঁ কাঁধ কেটে বর্শাটা বালির ওপর পড়ল। কাঁধ থেকে রক্ত পড়তে লাগল। কিন্তু শাঙ্কো দাঁড়িয়ে পড়ল না। সমানে ছুটে চলল।

ফ্রান্সিস তখনও ঘুমোয় নি। জাহাজের ডেক-এ দাঁড়িয়ে তীর ভূমির দিকে তাকিয়ে ছিল। বন্ধুরা ফিরল না। এই নিয়ে দুশ্চিন্তা ছিল ওর।

হঠাৎ দেখল কারা ছুটে আসছে। চাঁদের ম্লান আলোয় চিনল শাঙ্কোরা। পিছনে উদ্ধত বর্শা হাতে ছুটে আসছে যোদ্ধারা। ফ্রান্সিস চিৎকার করে বলল—ভাইসব। তরোয়াল নিয়ে চলে এসো। তখনও সবাই ঘুমোয় নি।

অল্পক্ষণের মধ্যে তরোয়াল হাতে অনেক বন্ধু ডেক-এ উঠে এল। যোদ্ধারা তখনও বর্শা ছুঁড়ছে। কিন্তু আর কারো গায়ে বর্শা লাগল না।

শাঙ্কোরা তখন জাহাজের পাতা কাঠের তক্তার কাছে এসে গেছে।

তরোয়াল উঁচিয়ে ভাইকিংরা পাতা তক্তা দিয়ে নেমে আসতে লাগল।

শাঙ্কোদের পিছু ধাওয়া করা যোদ্ধারা থমকে দাঁড়াল। শাঙ্কোরা জাহাজে উঠে এল। যোদ্ধারা নিজেদের মধ্যে কী বলাবলি করতে করতে চলে গেল। শাঙ্কো জাহাজের ডেক-এর ওপর শুয়ে পড়ল। ফ্রান্সিস ছুটে এল হাঁপাতে হাঁপাতে। দেখল শাঙ্কোর বাঁ কাঁধের ক্ষত থেকে রক্ত পড়ছে। ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে ডাকল—শিগগির ভেনকে আসতে বল। বেশি রক্ত বেরুলে শাঙ্কো একেবারে দুর্বল হয়ে পড়বে।

হ্যারি ছুটল ভেনকে ডাকতে। একটু পরে ভেন ওর পোঁটলা-পুঁটলি নিয়ে এল। শঙ্কো পাশে বসল। একটা বোতল থেকে সমুদ্রের নোনা জল, কয়েকটা শুকনো পাতা বের করল। পাতাগুলো হাতের তালুতে ডলে গুড়ো করল। গুঁড়োটা ক্ষতস্থানে ছড়িয়ে দিল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে রক্তপড়া বন্ধ হয়ে গেল। এবার বোয়াম থেকে কালো আঠার মত ওষুধ বের করল। ক্ষতস্থানে আস্তে আস্তে লাগিয়ে দিল। শাঙ্কো একটু নড়ে উঠে স্থির হল। ভেন পোঁটলা-পুটলি গোছাতে লাগল। বিড় বিড় করে বলল—কিছু না। কয়েকদিন ওষুধ পড়লেই সেরে যাবে। সব গুছিয়ে নিয়ে বলল—ফ্রান্সিস এখন কোথায় যাবে?

—সোজা হিচকক দ্বীপে। ফ্রান্সিস বলল।

—ওখানে কটা ছোট টিলা দেখেছি। চারপাশে জঙ্গল। আমার ওষুধের জন্যে কিছু গাছপাতা শেকড় খুঁজে বের করতে হবে। আমি দেখব খুঁজতে যাবো। ভেন বলল।

—তা যেও। ওখানে তো আমরা লড়াই করতে যাচ্ছি না। কাজেই শান্তিতেই তোমার কাজ করতে পারবে। ফ্রান্সিস বলল।

এবার ফ্রান্সিস কালো লোকটিকে দেখল। বিস্কো সিনেত্রার সঙ্গে সেও ডেক-এ বসে আছে। ফ্রান্সিস বলল—শাঙ্কো—ওকে?

—আমাদের সঙ্গে বন্দী ছিল। আমাদের সঙ্গেই পালিয়ে এসেছে। পাতুই দ্বীপের বাসিন্দা। এই দ্বীপে কাজের খোঁজে এসেছিল। সর্দার চোর অপবাদ দিয়ে কয়েদ ঘরে ঢুকিয়ে দিয়েছিল। চলুক আমাদের সঙ্গে হিচকক দ্বীপে। সেখানে না হয় কাজ জোগাড় করে নেবে। শাঙ্কো বলল।

—হুঁ। ফ্রান্সিস মুখে শব্দ করল। বলল—তোমার নাম কী?

—তুতুম্বা। যুবকটি কালো মুখে সাদা দাঁত বের করে হাসল।

—ঠিক আছে। চলো আমাদের সঙ্গে। ফ্রান্সিস বলল।

—ফ্রান্সিস। শাঙ্কো একটু দুর্বলকেই ডাকল।

—বলো।

—রাতের খাওয়া হয় নি। বড্ড খিদে। শাঙ্কো বলল।

—চলো। তোমাকে খাবার ঘরে নিয়ে যাচ্ছি। ফ্রান্সিস বলল।

ফ্রান্সিস শাঙ্কোর বাঁ বগলটা ধরে শাঙ্কোকে দাঁড় করাল। শাঙ্কো ডান হাত দিয়ে ফ্রান্সিসের গলা জড়িয়ে ধরল। দুজনে সিঁড়ি ঘরের দিকে চলল।

যেতে যেতে শাঙ্কো বলল—জল আনতে পারলাম না।

—ঠিক আছে। পীপের অর্ধেক জল অল্প অল্প করে খেয়ে চালিয়ে দেব। হিচকক দ্বীপ বেশি দূরে নয়। ফ্রান্সিস বলল।

সিঁড়ি ঘরের গোড়ায় দাঁড়িয়ে ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে বলল—জাহাজ ছেড়ে দাও। দাঁড় টানো, আমাদের যত দ্রুত সম্ভব হিচকক দ্বীপে পৌঁছতে হবে। যতটুকু জল না খেলে নয় ততটুকু জল খাবে।

ফ্রান্সিসদের জাহাজ তীরভূমি ছাড়ল। হাওয়ার বেশ তেজ। পালগুলো ফুলে উঠল। ওদের জাহাজ বেশ দ্রুতই চলল।

একদিন পরে ফ্রান্সিসদের জাহাজ হিচকক দ্বীপের জাহাজ ঘাটে এসে নোঙর করল।

এবার সোনার ঘর খোঁজার পালা।

একদিন পর ফ্রান্সিস শাঙ্কোকে বলল—সোনার ঘরের খোঁজের আগে আর একটা কাজ। শুনলাম এই দেশবাসী একজনের মুখে এই হিচককের দক্ষিণে এক সমুদ্র আছে। তারপরেই এক দ্বীপ ক্রীট। হিচকক দ্বীপের সঙ্গে চির বিরোধ। ঐ যে মাঝখানের সমুদ্রের ফালি বললাম ঐ ফালিতে প্রচুর ঝিনুক। মুক্তোও পাওয়া যায়। কিন্তু দুই দ্বীপের কেউ ঐ সমুদ্রের ফালিতে ঝিনুক তুলতে নামে না। দুদেশের প্রহরীরাই বর্শা ছুঁড়ে মারে।

—তা তুমি কী স্থির করেছো? শাঙ্কো বলল।

—ঐ একফালি সমুদ্রে মুক্তো শিকার করবো। ফ্রান্সিস বলল।

—পাগল হয়েছো? ঐ প্রহরীদের বর্শার কথা ভাবছো না। শাঙ্কো বলল।

—সেসব ভাবতে গেলে কোন কাজই করা হয় না। মনে আছে আর তো আমার সেই মুক্তোর সমুদ্রে ডুব দিয়ে মুক্তো তোলা। ফ্রান্সিস বলল।

—হ্যাঁ। তুমি তো মুক্তো শিকারীদের দলে ভিড়ে কী করে বেশিক্ষণ দম রাখতে দ্রুত ঝিনুক তুলতে হয় এসব শিখেছিলে। শাঙ্কো বলল।

—এবার সেটা কাজে লাগানো। ফ্রান্সিস বলল।

—কবে যাবে? শাঙ্কো বলল।

—পূর্ণিমার রাতে। তুমি তো জানো না পূর্ণিমার রাত কবে? ফ্রান্সিস বলল।

—না। ভেন এসব জানে। শাঙ্কো বলল।

—ভেন-এর কাছে চলো। ফ্রান্সিস বলল।

দুজনে ভেনএর কাছে এল। ভেন হিসেব করে বলল—পরশুদিন পূর্ণিমা।

ফ্রান্সিস সেই দিনটাই স্থির করল।

কিন্তু ফ্রান্সিসের দুর্ভাগ্য। দক্ষিণের দ্বীপে ক্রীট সেই রাতেই হিচকক দ্বীপ আক্রমণ করে বসল।

উজ্জ্বল চাঁদের আলোয় ফ্রান্সিস আর শাঙ্কো—ফালি সমুদ্রের তীরে এল। সারি সারি নারকেল গাছের পেছন দিয়ে আড়ালে আড়ালে ওরা ফালি সমুদ্রের জলে নামল। হিচকক দ্বীপের প্রহরী তখন দূরে পাহারারত। ফ্রান্সিসরা বেশ কায়দা করে ওদের চোখকে ফাঁকি দিল।

দুজনে জলে নামল। কিছুটা ডুব সাঁতার দিয়ে গেল। মাথা তুলল।

আজই ক্রীট দ্বীপের দিকে হৈ হৈ চিৎকার শোনা গেল। ফ্রান্সিসরা দেখল একটি দ্বীপের সৈন্যরা চিৎকার করতে করতে ছুটতে ছুটতে আসছে। হাতে খোলা তরোয়াল। হিচকক দ্বীপের পাহারাদাররা পড়ি মরি ছুটল রাজবাড়ির দিকে। ক্রীট এর সৈন্যরা আক্রমন করেছে। লড়াই।

ওদিকে ক্রীটের সৈন্যরা জলে নেমে পড়েছে। সাঁতরে আসতে শুরু করেছে। হিচকক দ্বীপের সৈন্যদের মধ্যেও সাজো সাজো রব পড়ে গেল। তারাও তরোয়াল হাতে ছুটে এল। জলের মধ্যেই লড়াই শুরু হয়ে গেল। চিৎকার আর্তনাদ গোঙানি শোনা যেতে লাগল।

ফ্রান্সিস আর শাঙ্কো জল পার হয়ে ক্রীট দ্বীপের দিকে চলে এল।

লড়াই তখনও চলছে। লড়াইয়ের চিৎকার তরোয়ালের ঝনঝনানি চলল।

হিচককের সৈন্যরা সংখ্যায় বেড়ে গেল। ক্রীটের সৈন্যরা সংখ্যায় বেশ কমে গেল। ওরা লড়াই চালাল। তবে বোঝা গেল ক্রীটের সৈন্যরা পারবে না। হেরে যাবে।

হলও তাই। ক্রীটের সৈন্যরা আস্তে আস্তে পিছিয়ে আসতে লাগল। একসময় সবাই পিছিয়ে এল। ফ্রান্সিস আর শাঙ্কো একটা নারকেল গাছের নিচে দাঁড়িয়ে ছিল। ক্রীটের সৈন্যদের এক দলনেতা হঠাৎ ফ্রান্সিসের হাত ধরে ফেলল। অন্য হাতে ধরল শাঙ্কোর

হাত। চিৎকার করে উঠল—এরা বিদেশী গুপ্তচর। হিচককের সৈন্যরা এত তাড়াতাড়ি আমাদের আক্রমনের কথা জানল কী করে? নিশ্চয়ই এরা আগেভাগেই খবর দিয়েছে।

—আপনি অন্যায় কথা বলছেন। ফ্রান্সিস বলল আপনাদের এই লড়াইয়ের সঙ্গে আমাদের কোন যোগ নেই। আপনাদের সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। ফ্রান্সিস বলল।

—না। তোমরা গুপ্তচর। দলনেতা গলা চড়িয়ে বলল—এ্যই এই দুজনকে বাঁধ। দুজন সৈন্য দড়ি হাতে এগিয়ে এল। ফ্রান্সিস রেগে গেল। বলল—দুটো তরোয়াল দিন তারপর আমাদের হার স্বীকার করুন।

—না। তোমাদের লড়তে দেওয়া হবে না। দুজনকে কয়েদ ঘরে ঢোকাও। দলনেতা বলল। শাঙ্কো মৃদুস্বরে বলল—ফ্রান্সিস শান্ত হও।

আরো কিছু হিচকক দ্বীপের সৈন্যকেও বন্দী করা হল। সবাইকে কয়েদ ঘরে ঢোকানো হল।

ঘরে একটা মাত্র মশাল জ্বলছে। তাতেই যা অন্ধকার দূর হয়েছে। মেঝেয় ঘাসপাতা বিছোনো। ফ্রান্সিস প্রথমে বসল। তারপর শুয়ে পড়ল। ও ভাবল—বোকার মত ধরা পড়লাম। পালাতে পারতাম। যা হবার হয়েছে। এখন এই বন্দী দশা থেকে পালাবো। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।

আরো কিছু হিচকক দ্বীপের সৈন্যও বন্দী ছিল।

একটু রাত হল। ফ্রান্সিস বলল—শাঙ্কো দলনেতাকে আসতে বলো তো।

শাঙ্কো লোহার দরজার কাছে গেল। দরজায় ধাক্কা দিল। একজন প্রহরী এল। বলল—কী ব্যাপার?

—তোমাদের দলনেতাকে আসতে বল। ফ্রান্সিস বলল।

—তোমরা কী এমন রাজা এলে যে তোমরা ডাকলেই দলনেতা আসবে। প্রহরী বলল।

—বাজে কথা ছাড়ো। ডেকে আনো। ফ্রান্সিস বলল।

—না। প্রহরী মাথা নাড়ল।

ফ্রান্সিস উঠে এল। আস্তে আস্তে বলল—ভাই—আমরা কোন অপরাধ করি নি অথচ কয়েদ খাটা। আমাদের গুপ্তচর বলে মিথ্যে অপবাদ দেওয়া হয়েছে। দলনেতাকে এই বিষয়ে কিছু জিজ্ঞেস করবো। আজ বন্দি হয়েই এই অন্যায় আমাদের মেনে নিতে হচ্ছে।

—হুঁ। দেখছি।

কিছু পরে দলনেতা এল। বলল—কী বলবে তোমরা?

—একটা কথাই বলবো। গুপ্তচরবৃত্তির দায়ে আমাদের অন্যায়ভাবে বন্দী করা হয়েছে। আমরা নির্দোষ। ফ্রান্সিস বলল।

—না। তোমাদের কথা রাজাকে বলা হয়েছে। রাজা তোমাদের মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে। দলনেতা বলল।

—মৃত্যুদণ্ড? ফ্রান্সিস চমকে উঠল। বলল ঠিক আছে আমরা রাজার সঙ্গে কথা বলবো।

—রাজা কথা বলতে রাজি নাও হতে পারেন। দলনেতা বলল।

—তবু একবার বলে দেখুন। ফ্রান্সিস বলল।

—দেখি।

বেশ কিছুক্ষণ পরে রাজা এলেন। ফ্রান্সিস বলল—মাননীয় রাজা আমাদের অন্যায়ভাবে বন্দী করা হয়েছে। আমরা নির্দোষ।

—তোমরা বিদেশী। রাজা বলল।

—হ্যাঁ আমরা ভাইকিং। ফ্রান্সিস বলল।

—জলদস্যুর জাত। রাজা বলল। ফ্রান্সিস রেগে আগুন হয়ে গেল। অনেক কষ্টে নিজেকে সংযত করল। বলল—আমরা বিদেশী। আপনাদের এই দেশের যুদ্ধবিগ্রহের সঙ্গে আমাদের কী যোগ বলুন। ফ্রান্সিস বলল।

—তোমরা হিচকক দ্বীপের সৈন্যদের কাছে আমাদের সৈন্যসঙ্ঘার খবর পৌঁছে দিয়েছো নইলে ওরা অত দ্রুত আমাদের আক্রমণ প্রতিহত করল কী করে? রাজা বলল।

—আমরা সর্বক্ষণ সমুদ্রের জলেই ছিলাম। হিচকক দ্বীপের সৈন্যদের খবর দেব কী করে? ফ্রান্সিস বলল।

—ওসব বুঝি না। তোমাদের জন্যই আমরা লড়াইয়ে হেরে গেছি। রাজা বলল।

—'না আমাদের কোন দোষ নেই' ফ্রান্সিস বলল।

—ওসব বলে লাভ নেই। তোমাদের কয়েদঘরে থাকতে হবে। মুক্তি নেই। মুক্তি আছে একবারে মৃত্যুতে। রাজা বলল।

—তার মানে আপনি আমাদের হত্যা করবেন? ফ্রান্সিস বলল।

—নিশ্চয়ই। রাজা বলল।

—কী অন্যায় বিচার। শাঙ্কো বলল।

—এটাই তোমাদের প্রাপ্য শাস্তি। রাজা বলল।

ফ্রান্সিস বুঝল রাজা কোন যুক্তি মানবে না। ওদের হত্যা করবেই।

কয়েকদিন কাটল। ফ্রান্সিস শাঙ্কো চুপচাপ শুয়ে বসে থাকে। ভাবে ভবিষ্যৎ কী? এখান থেকে পালাতে হবে। কিন্তু কি ভাবে? যা থেকে সব এখানকার নিয়মটিয়ম দেখতে বুঝতে হবে। তারপর উপায়।

কদিন পর গভীর রাত্রে হঠাৎ প্রচণ্ড ঝড় শুরু হল। কালো আকাশ যেন ছিঁড়ে বিদ্যুৎ চমকাতে লাগল। সেইসঙ্গে প্রবল বাতাস।

প্রচণ্ড জোর শব্দে একটা বাজ পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে কয়েদ ঘরের একটা কোনা ভেঙে পড়ল। ফ্রান্সিস লাফিয়ে উঠল। যাক প্রকৃতিই বাঁচার পথ করে দিল। ফ্রান্সিস বলল—শাঙ্কো—আর বসে থেকো না। রাস্তা খোলা, পালাও।

দু'জনে এক লাফে ভাঙা কয়েদ ঘর থেকে বেরিয়ে এল। পেছনে অন্য বন্দীরাও। দুজনে ছুটল দক্ষিণের সমুদ্রের দিকে।

ততক্ষণে বৃষ্টি কমে গেছে। হাওয়ার গতিও কমের দিকে। ছুটতে ছুটতে শাঙ্কো বলল—দক্ষিণ সমুদ্রের দিকে গিয়ে কী হবে?

—ওখানে নৌকো পাবো। নৌকায় চড়ে পালাবো। ফ্রান্সিস বলল।

—চলো। দেখা যাক। শাঙ্কো বলল।

দুজনে দক্ষিণ সমুদ্রতীরে পৌঁছল। এবার নৌকো জোগাড় করা। সমুদ্রতীর থেকে বেশ কিছু দূরে লোকজনের বাড়ি-ঘর। সেই বাড়িঘরটরের কাছে বালিতে নৌকো রাখা। নৌকোর ভেতরে দাঁড়। তখন ভোর হয়ে গেছে। ফ্রান্সিসরা নৌকা খুঁজতে লাগল।

ফ্রান্সিসরা যেখানে এল। স্থানীয় বাসিন্দারা ওদের দেখল কিন্তু ওরা যে কয়েদঘর থেকে পালিয়েছে তা তো ওরা জানে না। ফ্রান্সিসরা নিশ্চিন্তমনেই ঘুরে বেড়াতে লাগল। নজর নৌকার দিকে।

দেখল একটা নৌকা একটা ঝোপের কাছে রাখা। ধারে কাছে কোন বাড়িঘর নেই।

শাঙ্কো আস্তে আস্তে নৌকোটার কাছে গেল। তারপর দাঁড় দুটো ফ্রান্সিসের হাতে দিয়ে এক হ্যাঁচকা টানে নৌকাটা মাথার ওপর তুলে ফেলল। তারপর সমুদ্রের দিকে ছুটল। পেছনে ফ্রান্সিস।

দুজনে সমুদ্রের ধারে এল তখনই দেখল নৌকার মালিক লাঠি হাতে ছুটে আসছে। ওরা দুজনে লাফিয়ে নৌকায় উঠে গেল। তারপর দাঁড় বাইতে শুরু করল। নৌকার মালিক লাফিয়ে জলে নৌকার দিকে সাঁতার কাটতে শুরু করল। ফ্রান্সিসরা নৌকার গতি বাড়িয়ে দিল।

মালিক মুখ হাঁ করে শ্বাস নিতে লাগল। হাত-পা টেনে মালিক হাল ছেড়ে দিল। সমুদ্রতীরের দিকে ফিরে চলল। তীরে উঠে গেল।

সমুদ্রের ঢেউ তখনও শান্ত হয় নি। উঁচু উঁচু ঢেউ তার মাঝখান দিয়েই ফ্রান্সিস নিপুন হাতে দাঁড় বেয়ে চলেছে। মাঝে মাঝে কাত হওয়া নৌকায় ছিটকে জল উঠছে। শুধু হাতেই শাঙ্কো করুন জল ছেঁচে ফেলছে।

নৌকো চলেছে। কোথায় চলেছে ওরা জানে না। ফ্রান্সিস বলল—মোটকথা ক্রীট দ্বীপ থেকে পালাতে হবে। তারপর সেখানে গিয়ে পৌঁছোই।

বিকেলের দিকে দূরে একটা দ্বীপমত মনে হল। শাঙ্কো চেঁচিয়ে বলল—ফ্রান্সিস—একটা দ্বীপ। ঐ দিকেই নৌকো চালাচ্ছি তখন শাঙ্কো নৌকো বাইছিল।

সূর্য অস্ত গেল। অন্ধকার নেমে এল। সেই আলো অন্ধকারে ফ্রান্সিসদের নৌকো দ্বীপটার তীরে ভিড়ল।

দুজনে নামল। সামনেই কিছু বাড়িঘরদোর। বাড়িগুলোয় মশাল জ্বলছে। ফ্রান্সিস বলল—শাঙ্কো কী করবে।

—চলো। এসেছি যখন। দেখা যাক কেমন মানুষ এরা। শাঙ্কো বলল।

দরজায় জানালায় উৎসুক মুখের ভিড়। ফ্রান্সিস সামনের বাড়িটায় এল। বোধহয় বাড়ির মালিক দোরগোড়ায় দাঁড়িয়েছিল। ফ্রান্সিস বলল—জায়গাটা কি দ্বীপ?

—হ্যাঁ। পিলকে দ্বীপ।

—আপনাদের পেশা কী?

—এই দ্বীপের মাঝখানে রয়েছে একটা বিরাট হ্রদ। মিষ্টি জলের হ্রদ। এই হ্রদই আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছে। এই হ্রদেই আমরা মাছ ধরি। মাছ চাষ করি। সেই মাছ বিক্রির অর্থেই আমরা সংসার চালাই। ওটাই আমাদের রোজগার। বাইরের দ্বীপ থেকেও মানুষ আসে মাছ কিনতে। নিজেরাও চালান দিই। খাড়ির মালিক বলল। আবার বলল আপনারা বোধহয় বিদেশী।

—হ্যাঁ সারা পৃথিবী আমরা ঘুরে বেড়াই। এতেই আমরা আনন্দ পাই। হিচ্‌কক দ্বীপে আমাদের জাহাজ রয়েছে। মাঝখানে ক্রীট দ্বীপে আমরা বন্দী হয়ে রইলাম। সেখান থেকে পালিয়ে এসেছি। এখন এখান থেকে আমাদের জাহাজ ফিরবে।

—ততদিন কি এখানে থাকবেন? গৃহকর্তা জিজ্ঞাসা করল।

—কিছু ঠিক করি নি তবে দু'চারদিন তো থাকবোই। যাক গে—সারা দিন না খেয়ে আছি। কিছু খেতে দিন। শাঙ্কো বলল।

—নিশ্চয়ই। আসুন। গৃহকর্তা বলল।

দুজনে ঘরের মধ্যে ঢুকল। কাঠ ও মাটির তৈরী বাড়ি। ছাউনি শুকনো ঘাসপাতার। ঘরে তিমি মাছের তেলের প্রদীপ জ্বলছে। অন্ধকার মোটামুটি দূর হয়েছে।

মালিক তার স্ত্রীর সঙ্গে কী কথাবার্তা বলল। তারপর ফ্রান্সিসদের দিকে তাকিয়ে বলল দুপুরের বাসি খাবার তো বেশি নেই। আমাদের পেট ভরবে না। তার চেয়ে রাতের রান্নার তো সময় হয়ে গেল। একটু অপেক্ষা করুন। আপনাদের টাটকা খাবার দেওয়া হবে।

ঘাস দিয়ে বোনা একটা আচ্ছাদন মাটিতে পাতা। তার ওপরেই বসল দুজনে।

তারপর কথাবার্তা চলল। বাড়ির মালিক বলল—আমাদের কোথায় আর শোবেন। খেয়েদেয়ে এখানেই শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ুন। পাশের ছোট ঘরটায় আমরা থাকবো।

ফ্রান্সিস শাঙ্কো বেশ পেট ভরেই খেলো। ঘুমও পেল তাড়াতাড়ি। দুজনে বেশ তাড়াতাড়িই ঘুমিয়ে পড়ল।

সকালে তিনখানা রুটি আর শাকপাতার ঝোল দিয়ে খেল। তারপর হ্রদ দেখতে গেল। সত্যিই বিরাট হ্রদ। পরিষ্কার ঝকঝকে জল। মাছ ধরা চলছে নৌকায়। পাত্র ভরে খাবার জল তুলে নিয়ে যাচ্ছে। চারদিক লোকজনের সাড়াশব্দ।

কিছুক্ষণ ঘুরে ঘুরে ফ্রান্সিসরা গৃহকর্তার বাড়িতে ফিরে এল। যাত্রীরা ওদের ছাড়ল না। বলল গৃহকর্তা।

—যে কদিন এখানে থাকবেন আমাদের বাড়িতেই থাকুন। আপনাদের কোন অসুবিধে হবে না।

—না-না—আপনি যত্নে আমাদের রেখেছেন। ঠিক আছে কটা দিন এখানেই থাকবো। ফ্রান্সিস বলল।

বিকেলে ফ্রান্সিসরা ঘুরে ফিরে আসার জন্য বেরুবে তখন ভদ্রলোক বললেন—

এখানে তো সবই ভালো। কিন্তু বিপদ হল উত্তরের-আগ্নেয়গিরিটা। ওটা জীবন্ত আগ্নেয়গিরি। মাঝে মাঝেই মাটি কাঁপে। তবে অগ্নুদগার হয়েছিল বেশ কয়েক বছর আগে। আবার কবে অগ্নুদগার হয় সেই ভয়ে থাকি আমরা।

—আগ্নেয়গিরিটা কোথায়? ফ্রাঙ্কো জিজ্ঞেস করল।

—হ্রদের উত্তর কোণায়। যান—দেখে আসুন। গৃহকর্তা বলল।

—শাঙ্ক। চলো দেখে আসি। ফ্রান্সিস বলল।

দু'জনে হ্রদের ধারে এল। উত্তর দিকে চলল। জঙ্গল এখানে। তার মধ্য দিয়ে দু'জনে হেঁটে চলল। জঙ্গল খুব ঘন নয়।

হাঁটতে হাঁটতে একসময় আগ্নেয়গিরিটা দেখল। কালো পাহাড়। ওরা পাহাড়ের নিচে এসে পৌঁছাল। বিকেলের নরম রোদে পাহাড়টা মাথা উঁচিয়ে আছে।

দুজনে পাহাড়টায় উঠতে লাগল। জমাট গলা পাথিরা মাঝে মাঝে ছাইয়ের মত কিছু ছড়ানো।

ফ্রান্সিস বলল—কী মাথায় উঠবে?

—এতদূর এলাম। একটু আগ্নেগিরির মুখটা দেখে আসব না? শাঙ্কো বলল।

—না শাঙ্কো। যদি হঠাৎ জেগে ওঠে আমরা পুড়ে ছাই হয়ে যাবো। অত ঝুঁকি নেওয়া উচিত হবে না। এখান থেকে যা দেখা যায় তাই দেখে ফিরে চলো। ফ্রান্সিস বলল।

দুজনে ওখানেই দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল। জ্বালামুখ থেকে পাতলা কুয়াশার মত নিলচে ধোঁয়া বেরুচ্ছে। এটাই জীবন্ত আগ্নেয়গিরির প্রমাণ।

কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল দুজনে। হঠাৎই দেখল ধোঁয়াটা ঘন হতে শুরু করেছে। অল্পক্ষণের মধ্যেই জ্বালামুখ দিয়ে ঘন ধোঁয়া আকাশে উঠতে লাগল। মাটিতে খুব মৃদু কম্পন অনুভব করল দুজনে। ফ্রান্সিস বলল—শাঙ্কো লক্ষণ সুবিধের নয়। ফিরে চলো।

দুজনে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যতটা দ্রুত সম্ভব ফিরে চলল।

যখন গৃহকর্তার কাছে ফিরল তখন সন্ধে হয়ে গেছে।

বসতি এলাকার মানুষের মধ্যে তখন উৎকণ্ঠা ছড়িয়েছে। লোকজন বাড়ির বাইরে বেরিয়ে এসেছে। ফ্রান্সিস বলল—শাঙ্কো বোধহয় অগ্নুদগার হবে। এরা অভিজ্ঞ। জানে কখন কী অবস্থায় আগ্নেয়গিরি জাগে।

—কী করবে? শাঙ্কো বলল?

—আর এখানে থাকা নিরাপদ নয়। চলো পালাই। ফ্রান্সিস বলল।

—ঐ নৌকোয় চড়ে পালাতে হবে। শাঙ্কো বলল।

—পারবো? ফ্রান্সিস বলল।

—পারতেই হবে। এখানে থাকলে মারা পড়বো। চলো।

গৃহকর্তা ওদের দেখে এগিয়ে এল। বলল—আগ্নেগিরি জেগেছে। তবে এরকম মাঝেমাঝে হয়। ঘণ্টা কয়েক গলিত লাভা ছাই ছিটকে বেরোয়। তারপর সব বন্ধ

হয়ে যায়। আগ্নেয়গিরি ঘুমিয়ে পড়ে। ভয় পাবার কিছু নেই। এই আগ্নেয়গিরি আমাদের কাছে দেবতার মত। আমরা বছর বছর ফুল পাতা দিয়ে পূজা করি। আমরা রক্ষা পাই।

ফ্রান্সিস বলল—এটা সবসময় হয় না। আগুনে পাথর লাভাস্রোত শুরু হলে রেহাই নেই। আমরা চলে যাচ্ছি।

—ঐ ছোট নৌকোয় চড়ে? ফ্রাসিস বলল।

—হ্যাঁ। শাঙ্কো মাথা ঝাঁকাল।

—দাঁড়ান আপনাদের একটা বড় নৌকো দিচ্ছি। গৃহকর্তা কোথায় চলে গেলেন। একটু পরে ফিরে এল। ওদের সমুদ্রের ধারে নিয়ে গেল। দেখা গেল একটা বেশ বড় নৌকো। মাথা ঢাকা নৌকোর কাছে গিয়ে ওরা দেখল নৌকায় দাঁড় হাল রাখা।

ফ্রান্সিসরা দেরি করলো না। নৌকায় উঠে বসল। নৌকা ছেড়ে দিল। দূর থেকে দেখল সত্যিই আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ থেকে আগুনের ধোঁয়া বেরুনো অনেকটা কমে গেছে। কিন্তু ফ্রান্সিসরা তীরে নেমে এল না। নৌকা ভাসাল।

যতটা জেগেছে আগ্নেয়গিরি তাতেই সমুদ্রের জল ফুলে ফেঁপে উঠছে। ফ্রান্সিসরা দক্ষ হাতে হাল ধরে রইল। শাঙ্কো দাঁড় বাইতে লাগল। আগ্নেয়গিরির মাথার আকাশটা আস্তে আস্তে স্বাভাবিক হল। আগুনের আভা নিভে এল। গৃহকর্তা ঠিকই বলেছিল ওরা আগ্নেয়গিরিকে দেবতার মত শ্রদ্ধা করে ফুলপাতা দিয়ে পূজো করে। আগ্নেয়গিরিটিও ওদের বাঁচিয়ে রাখে।

ফ্রান্সিসরা নৌকো বেয়ে চলল। মাঝে মাঝে ঢেউয়ের ধাক্কায় ওরা নৌকো থেকে ছিটকে জলে পড়তে লাগল। আবার সাঁতরে নৌকোয় উঠতে লাগল।

রাত কাটল। ওর মধ্যেই জলে দাঁড়বন্ধ করে ওরা কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নিল। জল ফুলে ফেঁপে ওঠা বন্ধ হয়েছে অনেকক্ষণ।

পরদিন দুপুরে দূর থেকে একটা দ্বীপ দেখল। দূর থেকে ঠিক বুঝল না কতদূর। তবু ঐ দ্বীপ লক্ষ্য করেই ওরা নৌকো চালাল।

সন্ধ্যের অন্ধকারে সেই দ্বীপে পৌঁছল। তীরে বেশ কয়েকপা যেতেই ফ্রান্সিস বলে উঠল—সর্বনাশ।

—কী হল? শাঙ্কো জানতে চাইল।

—আমরা সেই ক্রীট দ্বীপেই ফিরে এসেছি। ফ্রান্সিস বলল।

—বলো কি। শাঙ্কো বলল।

—হ্যাঁ। ফ্রান্সিস বলল।

—কী করে বুঝলে? শাঙ্কো বলল।

—ফ্রান্সিস আঙুল তুলে একটা বাজ পড়া নারকেল গাছ দেখাল।

—আবার কয়েদ ঘর? শাঙ্কো বলল?

—অগত্যা উপায় কি। এখন উপায়।

ওরা কয়েকটা ঝোপের আড়ালে বসে রইল।

রাত বাড়ল। খিদেয় পেট জ্বলছে। ফ্রান্সিস বলল—চলো খাবার চুরি করবে। ভীষণ খিদে।

দুজনে এবাড়ি ওবাড়ির গা ঘেঁষে ঘুরতে লাগল। একটা ফাঁকা এলাকায় একটা বাড়ি পেল। ফ্রান্সিস বলল—এই বাড়িটার ধারে কাছে বাড়ি নেই। এটাতেই চেষ্টা করি।

দু'জনে জানলা দিয়ে তাকাল। দেখল মেঝেয় দুটো বিছানো পাতায় খাবার সাজানো। গাছের ডালে তৈরি বিছানায় একজন পুরুষ শুয়ে আছে। একজন স্ত্রীলোক। মেঝেয় বসেছিল। এবার পাশের ঘরে গেল। বোধহয় জল অথবা নুন আনতে।

ফ্রান্সিস কাঁপা গলায় বলল—জলদী। দুজনে গোল দরজা দিয়ে ঘরটায় ঢুকে পড়ল। স্ত্রীলোকটি ফেরার আগেই দুটো পাতাভর্তি খাবার নিয়ে ছুটে বেরিয়ে এল। পুরুষটি হৈ হৈ করে উঠল। ফ্রান্সিসরা তার আগেই একটা বড় ঝোপে ঢুকে পড়ল।

দুজনে হাঁপাচ্ছে তখন ওরা একটুক্ষণ অপেক্ষা করল। তারপর অল্প অন্ধকারে গোগ্রাসে খাবার গিলতে লাগল।

খাওয়া শেষ। কোথায় আর হাত মুখ ধুতে যাবে। জংলি গাছের পাতা ছিঁড়ে হাত মুছল। জামার হাতায় মুখ মুছল।

রাত বেড়ে চলল। রাতের মত খাওয়া হয়েছে।

নিশ্চিন্ত মনে দুজনে গাছের ডাল ভেঙে মাটিতে পাতল। তারপর ওখানেই শুয়ে পড়ল।

—এবার কী করবে? শাঙ্কো বলল।

—ধরা দেব। ফ্রান্সিস বলল।

—বলো কি। আবার কয়েদ ঘর? শাঙ্কো বলল।

—উপায় নেই। এখানে লুকিয়ে লুকিয়ে থেকে লাভ নেই যদি না পালাতে পারি। কয়েদ ঘর থাকলে দুটো খাওয়া ও নিশ্চিন্তে থাকা যায়। তারপর পালানো। ফ্রান্সিস বলল।

—বড় বেশি ঝুঁকি নেওয়া হবে। শাঙ্কো বলল।

—ঝুঁকি তো থাকবেই। কালকে সোজা কয়েদ ঘরে গিয়ে হাজির হবে। প্রহরীদের কাছে আমরা যথেষ্ট পরিচিত। ওরাই আমাদের কয়েদঘরে পাঠাবে। রাজা বা দলনেতার দরকার নেই। ফ্রান্সিস বলল।

—এভাবে ধরা দেওয়া। শাঙ্কো বলল।

—দাঁড়াও। দুচারটে দিন বিশ্রাম নিই। খেয়েদেয়ে ঘুমিয়ে টুমিয়ে শরীরে কিছু জোর করি। তারপর পালানো। ফ্রান্সিস বলল।

সকাল হল। ফ্রান্সিস আর শাঙ্কোর ঘুম ভাঙল। কাছেই পুকুর থেকে হাত মুখ ধুয়ে এল।

—এখন যাবে কয়েদখানায়? শাঙ্কো জানতে চাইল।

—হ্যাঁ। সকালের খাবারটাও জুটবে। চলো। ফ্রান্সিস বলল।

দুজনে কয়েদঘরের সামনে এল। প্রহরীরা হাঁ। কয়েদী নিজেরাই হাজির। প্রহরীরা লাফিয়ে এগিয়ে এল।

ওরা দুজনকে ঘিরে ধরল।

একজন প্রহরী দলনেতাকে নিয়ে এল। দলনেতা হেসে বলল—তাহলে নিজেরাই এসে ধরা দিলি। আমাদের খাটুনি কমিয়ে দিলে।

—সকালের খাবার খেতে দাও। ফ্রান্সিস বলল।

—আগে কয়েদঘরে ঢোকো। দলনেতা বলল। প্রহরীরা দুজনকে কয়েদঘরে ঢোকাল। দুজনে ঘরে ঢুকেই বসে পড়ল। একটু পরেই সকালের খাবার এল। দুজনে পেটপুরে খেল।

এখন তো শুধু শুয়ে বসে সময় কাটানো।

পরদিন রাজা কয়েদ ঘরে এল। ফ্রান্সিসদের দিকে তাকিয়ে বলল শুনলাম তোমরা নিজেরাই ধরা দিয়েছ।

—হ্যাঁ। খিদে পেয়েছিল। ফ্রান্সিস বলল?

—ঠিক আছে। থাকো। দেখি তোমাদের কী শাস্তি দেওয়া যায়। রাজা বলল।

—কী আর শাস্তি দেবেন। এই নরককুণ্ডে আছি এটাই তো যথেষ্ট শাস্তি। শাঙ্কো বলল।

—উঁহু, অন্য কোন শাস্তি। রাজা বলল।

—দোহাই প্রাণে মারবেন না। ফ্রান্সিস বলল।

—দেখি ভেবে। রাজা গম্ভীর গলায় বলল। তারপর চলে গেল।

রাতে শাঙ্কো বলল—ফ্রান্সিস পালানোর একটা জব্বর উপায় ভেবে বের করেছি। রাজার পেটে ছোরা ঢুকিয়ে দুজনে পালাবো। পরদিন বিকেলে ফ্রান্সিস প্রহরীদের একজনকে বলল—রাজাকে খবর দাও। তিনি যেন এখানে আসেন।

—ডাকলেই রাজা আসেন না। প্রহরী বলল।

তখনই দলনেতা এসে হাজির। প্রহরীটি তাকে ফ্রান্সিসের কথা বলল। দলনেতা বলল—রাজাকে কী দরকার?

—রাজার সঙ্গে কথা আছে। খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা। ফ্রান্সিস বলল।

—আমাকে বল তাহলেই হবে। দলনেতা বলল।

—আপনাদের বলে লাভ নেই। রাজাকে বলবো। ফ্রাসিস বলল।

—ঠিক আছে। কী এমন গুরুত্বপূর্ণ কথা। দলনেতা বলল।

—কী আর করি। আপনাকেই বলি। দক্ষিণে যে মিঠে জলের ছোট-পুকুরটা আছে তাতে গুপ্তধন আছে। ফ্রান্সিস ফিস ফিস করে বলল।

দলনেতা চমকে উঠল। বলল—সত্যি?

—হ্যাঁ অতীতের কোন এক রাজা গোপনে রেখে গেছেন হীরে মুক্তো মনি মাণিক্য। একটা দ্বীপের মধ্যে। ফ্রান্সিস বলল।

—তোমরা এতদুর জানো? দলনেতা বলল।

—হ্যাঁ। আরো জানি কী করে সেটা উদ্ধার করতে হবে। ফ্রান্সিস বলল।

—তাহলে তো—দলনেতা বেশ অস্থির হয়ে পড়ল।

মনিমুক্তো বোঝাই পিপে ও ছুটল রাজাকে খবর দিতে। ফ্রান্সিস প্রহরীদের কাছে কাগজ কলম চাইল। প্রহরীরা হাসল। এখানে কাগজ কলম কোথায়? একটু পরেই রাজা এল। মুখ চোখ লাল। জোরে শ্বাস ফেলছে। বোঝা গেল ছুটে এসেছে। বলল—কী ব্যাপার গুপ্তধনের ব্যাপারে তোমরা কী জানো?

—সব বলছি। তার আগে একটু কাগজ আর কলমখানির ব্যবস্থা করুন। রাজা দলনেতাকে হুকুম দিল কাগজ কলম আনার জন্য। দলনেতা কাগজ কলম নিয়ে এল। ফ্রান্সিস কাগজ কলম মেঝেয় পেতে রাজাকে বলল এসে দেখুন। রাজা সোৎসাহে গিয়ে মেঝেয় বসল। ফ্রান্সিস কাগজে নকশা আঁকতে আঁকতে ডাকল—শাঙ্কো। শাঙ্কো সঙ্গে সঙ্গে গলাবুক দিয়ে হাত ঢুকিয়ে ওর ছোরাটা বের করল। তারপর রাজার পিঠে ঠেকিয়ে বলল—উঠে আসুন। রাজার প্রহরীরা অবাক। এরকম একটা কিছু ঘটবে ওরা কল্পনাও করতে পারে নি। শাঙ্কো প্রহরীদের দিকে তাকিয়ে বলল—কেউ চেঁচালে রাজাকে খতম করে দেব। আমরা ফালি সমুদ্রের দিকে যাবো চলো।

ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়াল। বলল রাজামশাই আমাদের সঙ্গে চলুন।

রাজা আর কী করে। আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল।

রাজাকে সামনে রেখে পিঠে ছোরা ঠেকিয়ে শাঙ্কো বলল—কয়েদঘরের বাইরে চলুন।

প্রহরীরা কী করবে কিছুই বুঝে উঠতে পারল না? ভাইকিংটা যে কোন মুহূর্তে রাজার পিঠে ছোরা বসিয়ে দিতে পারে। তাহলেই রাজার দফা শেষ।

প্রহরীরা, রাজা, ফ্রান্সিসরা চলল ফালি সমুদ্রের দিকে।

সূর্য অস্ত গেল। অন্ধকার হয়ে এল চারদিক। ফালি সমুদ্রের সামনে এল সবাই।

ফ্রান্সিস ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল—সবাই দূরে যাও। প্রহরীরা কিছু দুরে সরে গেল। রাজার মুখ শুকনো। হঠাৎ যদি ছোরাটা ঢুকিয়ে দেয় পিঠে দফারফা।

হঠাৎ ফ্রান্সিস আর শাঙ্কো জলে ঝাঁপ দিল। কেউ কিছু বোঝার আগেই। অন্ধকারও হয়ে গেছে। ফ্রান্সিসদের ভালো করে দেখাও যাচ্ছে না।

অন্ধকারে সাঁতরে চলল ফ্রান্সিস আর শাঙ্কো। পেছন থেকে প্রহরীরা বর্শা ছুড়ল। কিন্তু কোনটাই ফ্রান্সিসদের গায়ে লাগল না।

কিছু পরে ফ্রান্সিসরা হিচ্‌কক দ্বীপের তীরে উঠল। মুক্তি!

দুজনে আস্তে আস্তে হেঁটে চলল রাজবাড়ির দিকে। রাজবাড়ির কাছে যখন পৌঁছল তখন অন্ধকার ঘন হয়েছে। রাজবাড়ির প্রধান প্রবেশ পথে এখানে ওখানে মশাল জ্বলছে।

ওরা সমুদ্রতীরের দিকে চলল।

একটু রাতেই ওরা ওদের জাহাজের কাছে এল। দু হাতের চেটো গোল করে শাঙ্কো ডাকল—হ্যারি—আমরা এসেছি।

বারকয়েক ডাকতে হ্যারি ডেকএ উঠে এল। অন্ধকারে আন্দাজে ফ্রান্সিস শাঙ্কোকে দেখল। চেঁচিয়ে বলল—নৌকো নামাও। ফ্রান্সিসরা এসেছে।

একটা নৌকা জলে নামানো হল। নৌকোর বিস্কো জানিয়ে পারে নিয়ে এল। ফ্রান্সিস শাঙ্কো নৌকোয় উঠে বসল। কিছুক্ষণের মধ্যেই ফ্রান্সিসরা জাহাজে উঠে এল।

বন্ধুরা ওদের ঘিরে ধরল। শাঙ্কো আস্তে আস্তে সব ঘটনা বলতে লাগল। মারিয়া এসে দাঁড়াল। ফ্রান্সিস বলল—কিচ্ছু ভেবোনা আমরা অক্ষত। ভালোভাবেই ফিরেছি। বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে বলল—সবার আগে আমাদের খেতে দাও। আমরা ভীষণ ক্ষুধার্ত।

পরদিন ফ্রান্সিস হ্যারিকে বলল—এখানকার সমুদ্রে মুক্ত পাওয়া যায়। চেষ্টা করবো নাকি?

—পারবে?

—মুক্তোর সমুদ্র থেকে মুক্তো তুলেছি। মুক্তো শিকারীদের দলে ভিড়ে নানা কৌশল শিখেছি। ঠিক পারবো। তবে ঝিনুক না ভেঙে তো বলা যাবে না। দেখি কয়েকটা ঝিনুক তুলে।

দুপুরে খাওয়া-দাওয়া সেরে ফ্রান্সিস দড়ি ধরে ধরে জাহাজ থেকে জলে নামল। সঙ্গে নিল ঝিনুক-তোলার ছোট জাল।

কিছুক্ষশ পরে জাল ভর্ত্তি ঝিনকু এনে বিস্কোকে দিল। বিস্কো সব ঝিনুক ডেকএ ঢালল। বন্ধুরা ছুরি হাতে বসে পড়ল। ঝিনুকের মুখ ছুরি দিয়ে চাপ দিয়ে খুলতে লাগল।

ফ্রান্সিস আর এক দফা ঝিনুক আনল। তারপর ভেজা জামাকাপড় ছেড়ে এল। সবাই ভিড় করে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সেই ভিড়ে মারিয়াও আছে।

আজ ঝিনুক প্রায় সব তোলা হয়ে গেল। মুক্তো পাওয়া গেল না।

হঠাৎ বিস্কো একটা মুখখোলা ঝিনুক হাতে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল। ভাঙ্গা ঝিনুকে একটা মুক্তা। সবাই ধ্বনি তুলল—ও-দো-দো। ফ্রান্সিস হেসে বলল—সবে একটা মুক্তা পাওয়া গেল। ফ্রান্সিস মুক্তটা হাতের চেটোয় রাখল। সবাইকে দেখাতে লাগল। স্থির হল মুক্তোটা মারিয়ার গহনার বাক্সে থাকবে। সবাই খুশি।

ফ্রান্সিস বলল—এবার সোনার ঘর খুঁজে বের কর।

—কী মনে হয়? পারবে? হ্যারি বলল।

—কিছু সূত্র জানা নেই। যেমন পাঁচরিন্দেয় মাপকাঠিটা। দরজা জানালাহীন ঘরগুলো। ওখান থেকেই হদিস বার করতে হবে। ফ্রান্সিস বলল।

সেদিন সন্ধেবেলা হ্যারি জাহাজে এসে ফ্রান্সিসের কাছে এল।

—কী ব্যাপার? তোমাকে বেশ চিন্তাগ্রস্ত দেখছি। ফ্রান্সিস বলল।

—চিন্তারই কথা ফ্রান্সিস আবার হিচ্‌কক আর ক্রীটের লড়াই। ক্রীটের রাজা বিদেশ থেকে বহু সৈন্য ভাড়া করে এনেছে। কয়েকদিনের মধ্যেই হিচ্‌কক আক্রমণ করবে। হিচ্‌কক দ্বীপ জয় করবে।

—পারবে কী? ফ্রান্সিস বলল।

—এবার মনে হয় পারবো। শাঙ্কো বলল।

—দেখা যাক। ফ্রান্সিস বলল।

দুদিন পরে গভীর রাতে ক্রীটের রাজা হিচকক দ্বীপ আক্রমণ করল। হাজার হাজার সৈন্য নিঃশব্দে ফালি সমুদ্র পার হয়ে আক্রমণ করল।

হিচ্‌ককের সৈন্যরাও ঘুম ভেঙে ছুটল লড়াই করতে। লড়াই চলল। ক্রীটের সৈন্যরা সংখ্যায় অনেক বেশি। তারা হিচককের সৈন্যদের ঘিরে ফেলল।

হিচ্‌ককের রাজা মামুন শয়নঘরে পায়চারি করছিলেন। মাঝে মাঝে দূতেরা এসে খবর দিয়ে যাচ্ছে। সেসব খবর সুখবর নয়। তিনি বুঝতে পারলেন—লড়াইয়ে জিতবেন না। স্থির করলেন বন্দী হবেন না। আত্মগোপন করবেন।

একজন দূতকে ডাকলেন। বললেন—সমুদ্রতীরে যাও। দেখবে কিছু বিদেশী জাহাজ দাঁড়িয়ে আছে। সেই জাহাজের ক্যাপ্টেনদের সঙ্গে কথা বলা চলল রাজা মানুন রানি ও পুত্রকন্যাসহ আশ্রয় চান। তারা আশ্রয় নিতে পারবেন কিনা।

দূত রাজপ্রাসাদের পেছনের গোপন দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল। দেরি করার উপায় নেই। প্রায় ছুটে চলল সমুদ্রতীরের দিকে। প্রথমেই ফ্রান্সিসদের জাহাজটা পেল। জাহাজের সামনে এসে চিৎকার করে বলল—আপনাদের সঙ্গে কথা ছিল। আমি জাহাজে উঠলে কথা বলবো।

ওদিকে লড়াই চলছে। তার চিৎকার হৈ হুল্লায় ভাইকিংদের ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। ওরা অনেকেই জাহাজের বানিং ধরে দাঁড়িয়ে ছিল। ওরা দূতের কথা শুনল। ফ্রান্সিসকে ডাকল। ফ্রান্সিস রেলিং ধরে উঁচু হয়ে গলা চড়িয়ে বলল—

—বিশেষ কোন কথা আছে?

—হ্যাঁ। আমাকে জাহাজে উঠতে দিন। দূত বলল।

—বেশ। ফ্রান্সিস বলল। তারপর বিস্কোকে বলল—লোকটি কী বলতে চায় জানি না। ওকে জাহাজে নিয়ে এসো।

বিস্কো হালের কাছে এল। দড়ি বেয়ে বেয়ে নৌকোয় নামল। সেটিকে ধরে তীরে নিয়ে এল। দূতটি দ্রুত উঠল। বলল—একটু তাড়াতাড়ি চলুন। বিস্কো একটু দ্রুতই ** বেয়ে দূতকে জাহাজে নিয়ে এল।

দূত জাহাজে উঠে বলল—আপনাদের ক্যাপ্টেন কে?

ফ্রান্সিস এগিয়ে এল। বলল—বলো কী ব্যাপার?

—আমাদের রাজা আমুন খুবই বিপদগ্রস্ত। আমরা ক্রীটদের সঙ্গে লড়াইয়ে হেরে যাচ্ছি। কিছুক্ষণের মধ্যেই ওরা প্রাসাদ দখল করবে। রাজা আমুন আমাকে সমুদ্রতীরে পাঠিয়েছেন কোন বিদেশী জাহাজে উনি আশ্রয় নেবেন। বিদেশী জাহাজেই ঠিক আশ্রয় পাওয়া যাবে।

ফ্রান্সিস একটু ভাবল। তারপর বলল—ভাই তোমাদের এই লড়াইয়ের সঙ্গে আমাদের তো কোন সম্পর্ক নেই। আমরা এর মধ্যে জড়াবো কেন?

—এটা মানবিকতার প্রশ্ন। স্ত্রী সন্তান সহ রাজাকে বন্দী করা হবে। বন্দীর জীবন কী কষ্টের হয় সে তো আপানদের জানা আছে। এটা একটা বিনীত আবেদন। দূত বলল।

ফ্রান্সিস হ্যারির দিকে তাকালো। বলল—হ্যারি কী করবে?

—দেখ রাজা মানমুনের জীবন সংশয়। যদি আমরা আমাদের জাহাজে আশ্রয় দিই তাহলে হয়তো বেঁচে যাবেন। হ্যারি বলল।

—কিন্তু ক্রীটদের রাজা কি চুপ করে বসে থাকবে? সব জাহাজে তল্লাশী চালাবে। রাজা মামুনকে খুঁজে বের করবে। শাঙ্কো বলল সেটা হতে পারে। আমরা জাহাজ নিয়ে দূরে গিয়ে নোঙর করবো। ক্রীটের দলনেতা এতদূর গিয়ে তল্লাশী নাও করতে পারে। ফ্রান্সিস বলল।

—হ্যাঁ তা হতে পারে—ফ্রান্সিস বলল—ঠিক আছে রাজা মামুনকে আমরা আশ্রয় দেব। দূত বলল—আপনাকে কী বলে কৃতজ্ঞতা জানাবো। রাজা মামুনের জীবন বাঁচালেন আপনি।

—তুমি বেশি দেরি কর না। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রাজা রানি আর পুত্রকন্যাকে নিয়ে এসো। ফ্রান্সিস বলল।

দূত দ্রুত হালের দিকে ছুটল। দড়ি বেয়ে বেয়ে নৌকোয় বেয়ে নেমে এল। বিস্কোও এল। নৌকো চালিয়ে তীরে ভেড়াল। দ্রুত তীরে নেমে রাজপ্রাসাদের দিকে ছুটল?

বিস্কো নৌকায় বসে রইল।

ওদিকে যুদ্ধক্ষেত্রের চিৎকার চ্যাঁচামেচির শব্দ অনেক কমে গেছে।

কিছুক্ষণ পরে গায়ে দামি কাপড়ের চাদর জড়িয়ে রাজা ও রানি এলেন। দূত পথ দেখিয়ে নিয়ে এল।

তখন ভোর হয়ে এসেছে। সূর্য ওঠে নি। দূত রাজা রানি ও পুত্রকন্যাকে নৌকোয় তুলে দিয়ে নিজে উঠল। বিস্কো দ্রুত নৌকো বেয়ে এনে জাহাজের হালের কাছে লাগাল।

শাঙ্কো ওপর থেকে দড়ির মই ফেলে দিল। বিস্কো রাজপুত্র রাজকুমারীকে ধরে ধরে মইয়ের থাকে তুলে দিল। দুজনে মই বেয়ে বেয়ে উঠে পড়ল। তারপর রানি উঠতে লাগলেন। মইটা পাক খেল। রানি প্রায় পড়ে যাচ্ছিলেন। বিস্কো দুহাত দিয়ে রানির কোমর ধরল। রানি টাল সামলালেন। আস্তে আস্তে উঠে পড়লেন।

ফ্রান্সিস নিজেদের কেবিন ঘর রাজা রানিদের ছেড়ে দিল। মারিয়া আগেই যা কিছু ভালো বিছানার জিনিস আছে সব পেতে দিল।

রাজা রানি বিছানায় বসলে। রাজকুমার রাজকুমারীকে শাঙ্কো জাহাজের সবকিছু দেখাতে নিয়ে গেল।

রাজা শুকনো মুখে বসে রইলেন। রানিও চুপ করে বসে রইলেন।

একসময় রাজা বললেন—আপনাদের ক্যাপ্টেন কে? ফ্রান্সিস একটু এগিয়ে এসে মাথা নুইয়ে বলল—আমি। আমরা জাহাজে চড়ে দেশ বিদেশে ঘুরে বেড়াই। কোথাও কোন গুপ্তধনের সংবাদ পেলে সেই গুপ্তধন উদ্ধার করি।

—যখন আমার পূর্বপুরুষ জারা সুমালার সোনার ঘরও আপনারা খুজে দেখতে পারেন। হঠাৎ থেমে বললেন— কী বা বলছি। আমি তো আর হিচ্‌ককের রাজা নই।

—আপনার দুর্ভাগ্য কাটুক আপনি আবার রাজ্য ফিরে পান। আমি আপ্রান চেষ্টা

করবো রাজা সুমার গুপ্ত সোনার ঘর খুঁজে বের করতে—আপনাকে আমি ফ্রান্সিস এই কথা দিলাম। ফ্রান্সিস বলল।

রাজা কিছু বললেন না। এই দুঃখের দিনেও একজন বিদেশী তাঁকে সম্মান জানাচ্ছে দেখে রাজার দুচোখ জলে ভরে উঠল। রানি তাঁর মাথা ঢাকা দামি পাতলা কাপড়ের কানা দিয়ে রাজার চোখের জল মুছিয়ে দিলেন।

রাজরানির জন্য ফ্রান্সিস শাঙ্কোকে কাছিমের মাংস দুধের মিষ্টি এসব আনতে পাঠাল। শাঙ্কো দেখেশুনে ভালো ভালো জিনিস আনলো।

রাজারানির কাছে এসব খুবই সাধারণ খাবার।

রাজা রানির ছেলেমেয়েরা সেই খাবারই খেল। ছেলেমেয়ের ক্ষেত্রে বোঝা গেল ওদের খুব অসুবিধে হচ্ছে। রাজরানি কিন্তু কোনরকম মুখভঙ্গী না করেই খেয়ে নিলেন।

পরদিন সকালে শাঙ্কো নৌকোয় চড়ে তীরভূমিতে গেল। ক্রীটের রাজা কী করছে সেটা জানতে।

রাজপ্রাসাদের কাছে এসে দেখল ক্রীটের সৈন্যরা রাজপ্রাসাদ ঘিরে ফেলেছে। লোকের বাড়ি বাড়ি রাজারানির খোঁজে তল্লাশী চলছে।

তাহলে ক্রীটের সৈন্যরা এখনও জাহাজ তল্লাসী শুরু করে নি।

শাঙ্কো ফিরে এল। ফ্রান্সিসকে বলল সব। হ্যারি বলল—ওরা ছাড়বে না। আমাদের জাহাজেও তল্লাসী চালাবে।

সারা দুপুর ক্রীটের সৈন্যরা জাহাজগুলোও তল্লাশী চালান। রাজরানিকে পেল না।

সন্ধ্যের সময় ফ্রান্সিসদের জাহাজ ওদের নজরে পড়ল। ওরা একটা বড় নৌকোয় চড়ে দশ পনেরজন সৈন্য নিয়ে দলনেতা ফ্রান্সিসদের জাহাজের দিকে আসতে লাগল।

ফ্রান্সিস বুঝল বিপদ। কিন্তু কী করবে বুঝে উঠতে পারল না। হ্যারিকে বলল—এখন কী করবে?

—চলো রাজার সঙ্গে কথা বলি। হ্যারি বলল।

দুজনে রাজার কেবিনঘরে এল। রাজা পায়চারি করছিলেন। ফ্রান্সিসদের দেখে দাঁড়িয়ে পড়লেন। হ্যরি বলল মাননীয় রাজা কয়েকটা কথা বলছিলাম।

—বলো। রাজা বলল।

—ক্রীটের সৈন্যরা সংখ্যায় দশ পনেরজন হবে একটা বড় নৌকায় চড়ে আমাদের জাহাজ তল্লাশী করতে আসছে। হ্যারি বলল।

—জানতাম আত্মগোপন করলেও ধরা পড়তে হবে। রাজা বেশ দুঃখের সঙ্গে বললেন—দেখুন আমরা ওদের হারিয়ে দিতে পারি। ওরা খালি হাতে ফিরে যেতে বাধ্য হবে। আমাদের সঙ্গে লড়াই হবে। ওদের কয়েকজন মরবে। আমাদেরও আহত হবে। কিন্তু এদিকে গেলেও আরো নৌকো আরো সৈন্য ক্রীটের রাজা পাঠাবে। তখন পুরোদস্তুর লড়াইয়ে নামতে হবে। আমরা তা চাইছি না। ফ্রান্সিস বলল।

—না-না। তোমরা এর মধ্যে জড়াবে কেন। আমি ধরা দেব। রাজা বললেন।

—কিন্তু আপনার প্রাণসংশয় হবে। হ্যারি বলল।

—তা জানি। কিন্তু আমি নিরুপায়। রাজা বললেন।

ক্রীটের দলনেতার নৌকো ফ্রান্সিসদের জাহাজের গায়ে এসে লাগল। দলনেতা গলা চড়িয়ে বলল—এই জাহাজে রাজা মামুন আছেন?

—এসে দেখ। বিস্কো বলল।

ওরা নৌকার হালের দিকে নিয়ে গেল। ঝুলন্ত দড়ি ধরে ধীরে ধীরে দশজনের মত সৈন্য ডেকে উঠে এল।

রাজা মামুন রানি আর রাজকুমার রাজকুমারীকে নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে ডেকে উঠে এলেন। দলনেতা ছুটে গিয়ে নৌকোটা দড়ি মইয়ের নিচে আনতে বলল। নৌকো আনা হল। রাজা ও রানি ফ্রান্সিসদের দিকে তাকিয়ে বললেন অনেক ধন্যবাদ তোমাদের।

রাজারানি ছেলেমেয়েদের নিয়ে দড়িমইয়ের সাহায্যে দলনেতার নৌকায় নামলেন।

ওদিকে রাজা মামুনের সেনাপতি ধরা পড়তে পড়তেও ক্রীট সৈন্যদের হাতে ধরা পড়েনি। হিচ্‌ককদ্বীপের মানুষের কাছে সেনাপতি খুবই জনপ্রিয়। সেনাপতি এ বাড়িতে সে বাড়িতে আশ্রয় নিয়ে ধরা পড়ার হাত থেকে বাঁচল। এবার সেনাপতির চিন্তা হল কী ভাবে ক্রীটের রাজার সৈন্যদের এখান থেকে তাড়ানো যায়। এজন্য অনেক সৈন্য প্রয়োজন। এইজন্য অন্য দ্বীপে যেতে হবে। প্রচুর সৈন্য এনে ক্রীট সৈন্যদের আক্রমণ করতে হবে। বেশি সৈন্যের চাপে ওদের হারিয়ে দেওয়া সহজ হবে।

কিন্তু অত সৈন্যকে ভাড়া করে আনতে গেলে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। এত অর্থ দেবে কে? রাজা এখন ফ্রান্সিসদের জাহাজে।

সেনাপতি দূতের কাছে খোঁজ নিয়ে ফ্রান্সিসদের জাহাজে এসে উঠল। বলল—রাজা মামুনের সঙ্গে কথা আছে।

—যান।

সেনাপতি রাজার ঘরে ঢুকল। রাজা রানিকে মাথা নুইয়ে শ্রদ্ধা জানিয়ে বলল—একটা বিশেষ প্রয়োজনে এসেছি।

—বলুন সেটা কী। রাজা বললেন।

—এই ক্রীটদ্বীপের সৈন্যদের হারাতে হলে আমাদের আরো অনেক ভাড়াটে সৈন্য চাই। তারজন্যে সোনার চাকতি অর্থ চাই। বেশ কিছু পরিমান ভাড়া করা সৈন্য আনতে হবে। সেনাপতি বলল।

—সোনার চাকতি অত অর্থ পাবেন কোথায়? রাজা বললেন।

এবার রানি বললেন—দেখুন—রানিমাতার অনেক অর্থ আছে। সোনার চাকতিও আছে। এসব নিয়ে সেনাপতিমশাই অনেক সৈন্য আনতে পারবেন।

—কিন্তু রানিমাতা আমাকে এত অর্থ স্বর্ণ দেবেন কেন? সেনাপতি বলল।

—রানিমাতা আপনাকে চেনেন। রানি বললেন।

—তার একটা চিহ্ন ছিল।

রাজা ভাবলেন। তারপর মধ্যমা আঙুল থেকে একটা আংটি বের করে সেনাপতিকে

দিলেন। বললেন—এই আংটিটাই চিহ্ন। আমাকে তৈরি করিয়ে দিয়েছিলেন, এটা দেখলেই রাজমাতা চিনবেন।

সেনাপতি চলে গেল। ফ্রান্সিস রাজাকে বলল—সেনাপতি সঠিক পথ ধরেছেন। এই উপায় ছাড়া ওদের তাড়ানো যাবে না।

সেনাপতি বলল—মাননীয় রাজা—আপনি ক্রীটের রাজার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করবেন।

—ক্রীটের রাজা কি আমাদের ফাঁসি দেবে? রাজা বললেন।

—হ্যাঁ ওর মনোভাব তাই। তবে বলছিলাম ক্রীটের রাজার সঙ্গে কোন তর্কবিতর্কে যাবেন না। যা বলে মেনে নেবেন। মোট কথা আপনাকে অন্ততঃ পাঁচদিন বেঁচে থাকতে হবে। তার মধ্যেই আমি সৈন্য নিয়ে ফিরে আসবো। আমরা একবার আসতে পারলে আর কোন ভয় নেই।

সেদিনই গভীর রাতে সেনাপতি প্রাসাদের পেছনের দরজা দিয়ে ঢুকল। এ ঘর ওঘর করতে করতে রানীমাতার ঘরে এল।

রানীমাতা ঘুমিয়ে আছে। রানিমাতা যাতে বেশি চমকেনা ওঠে তার জন্য সেনাপতি রানিমাতার কপালে হাত। একটু পরেই রানীমাতা নড়লেন। আবছা আলোয় সেনাপতির মুখের দিকে তাকালো। বলল—তুমি সেনাপতি।

—আজও আমি ওই দেশের সেনাপতি। সেনাপতি বলল।

—কী করে বিশ্বাস করবো। রানিমাতা বললেন।

সেনাপতি আংটিটা বের করে রানিমাতার হাতে দিল। বলল—এই আংটি আপনি রাজা মামুনকে দিয়েছেন। উনি চিহ্ন হিসেবে ওটা আমায় দিয়েছেন যাতে আপনি আমাকে বিশ্বাস করেন।

—আমার কাছে যখন এসেছো তখন নিশ্চয়ই আমার কাছে কিছু চাও? কী চাও?

—তাহলে সব বল। ক্রীটের রাজা প্রচুর সৈন্য নিয়ে আমাদের আক্রমণ করে আমাদের হারিয়ে দিয়েছে। এখন ওদের হারাতে হলে আমাদেরও সৈন্য ভাড়া করতে হবে বিভিন্ন দেশ থেকে। তারপর লড়াই।

—বেশ তবে সৈন্য সংগ্রহ করে লড়াই করো।

কিন্তু মাননীয় রাজমাতা—সোনার চাকতির বিনিময়ে সৈন্য দের ভাড়া করতে হবে। তার জন্যে বেশি পরিমান সোনার চাকতি চাই।

—তার মানে সোনার চাকতি আমাকে দিতে হবে। রানিমাতা বললেন।

—হাঁ নইলে কোথায় পাবো? সেনাপতি বলল।

—বেশ। রানিমাতা মাথা নাড়লেন।

রানিমাতা বিছানা থেকে নামলেন। সেনাপতির **** বাড়িয়ে দিলেন। তারপর একটা করে কাজ করা কালো বাক্সের সামনে এলেন। তালা খুলে বাক্স খুললেন। সেনাপতি কোমরের ফেট্টিটা খুলে ফেলল। সোনার চাকতিও থোলেতে ভরতে লাগল। বাক্সের প্রায় অর্দ্ধেক সোনার চাকতি সেনাপতি বেঁধে নিল।

তারপর বলল—ঠিক আছে। এতেই হবে।

সেনাপতি সোনার চাকতির বস্তাটা কাঁধে ঝুলিয়ে এক বন্ধুর বাড়ি এল। বন্ধু বলল—ক্রীট সৈন্যরা তোমাদের খুব খুঁজছে।

—খুঁজুক। আমার নাগাল পাবে না। সেনাপতি বলল।

সেনাপতি বিকেলের আলো আঁধারিতে চাদরে মুখ ঢেকে সমুদ্রতীরে এল। বিদেশি জাহাজ খুঁজতে লাগল। দুটো বিদেশী জাহাজ পেল। একটাতে উঠল। ক্যাপ্টেন দাড়িওয়ালা। মোটা। এগিয়ে এল। বলল কী ব্যাপার?

—আপনারা কোন দেশের? সেনাপতি জানতে চাইল।

—এখানে কেন? ক্যাপ্টেন বলল।

—আপনারা এরমধ্যে জাহাজ ছাড়ছেন? সেনাপতি বলল।

—না আমাদের দেশে যেতে এখনও দিন দশেক লাগবে। ক্যাপ্টেন বলল।

সেনপাতি অন্য জাহাজটায় এল। সোজা ক্যাপ্টেনের ঘরে গেল। বলল—আপনারা কোন দেশের।

—আপনারা কি এর মধ্যে দেশে ফিরছেন? সেনাপতি জানতে চাইল।

—হ্যাঁ। আজ শেষ রাতে আমরা পোর্তুগালের দিকে জাহাজ চালাবো। ক্যাপ্টেন বলল।

—আমার একটা বিনীত অনুরোধ ছিল। যদি আপনাদের জাহাজে আমাকে নিয়ে যান তাহলে আমার বড়ই উপকার হয়। সেনাপতি বলল।

—আপনার পরিচয়? ক্যাপ্টেন জানতে চাইল।

—আমি এই হিচ্‌ককদ্বীপের সেনাপতি। সেনাপতি বলল।

—ভাড়া তো লাগবে। ক্যাপ্টেন বলল।

সেনাপতি কোমরের ফেট্টি থেকে দুটো সোনার চাকতি বের করে দিল। ক্যাপ্টেন খুব খুশি। ভাড়া হিসেবে অনেক পাওয়া গেল।

—তাহলে শেষ রাতে আমি আসছি। সেনাপতি বলল। তারপর জাহাজ থেকে পাটাতন দিয়ে হেঁটে নেমে এল।

শেষরাতে সেনাপতি তৈরি হল। একটা মোটা কাপড়ের বস্তা নিল। পোশাকটোশাকের সঙ্গে একটা থলেতে সোনার চাকতিগুলো নিল। ঠিক করল এটাই হবে ওর বালিশ।

ঠিক সময়েই জাহাজে পৌঁছল সেনাপতি।

শেষ রাতে জাহাজ ছাড়ল।

কয়েকদিন পরে জাহাজটা একটা দ্বীপে পৌঁছল। সেনাপতি নেমে গেল। দ্বীপের বন্দরটা মোটামুটি বড়ই। সেনাপতি দ্বীপের রাজার সভায় গেল। শ্রদ্ধা জানিয়ে রাজাকে বলল—আমি হিচ্‌কক দ্বীপের সেনাপতি। শত্রুরা আমাদের দেশ দেখল করেছে। আমরা তাদের জানিয়ে দিতে চাই। তার জন্য সৈন্য চাই। আপনি যদি আমাকে কিছু সৈন্য ধার দেন তাহলে তাদের নিয়ে লড়াই চালাতে পারি।

—সৈন্য ভাড়া করবেন তার মূল্য তো দিতে হবে। রাজা বলল। সেনাপতি কোমরের ফেট্টি থেকে চারটে স্বর্ণমুদ্রা বের করে রাজাকে দিল। রাজা খুশি হলেন। নিজের সেনাপতিকে হুকুম দিলেন সৈন্য ভাড়া দেওয়ার জন্য।

এক দল সৈন্য পাওয়া গেল। এবার সৈন্যদের নিয়ে সেনাপতি জাহাজঘাটায় এল। দরদস্তুর করে একটা জাহাজ কিনে ফেলল। সৈন্যদের নতুন কেনা জাহাজে তুলে দিল। এবার কিছু অভিজ্ঞ জাহাজী জোগাড় করল। তারা জাহাজে উঠে কাজে লাগল। পালটাল খাটানো। সন্ধ্যের মধ্যেই জাহাজ রওনা হবার জন্যে তৈরি হয়ে গেল।

ভোরবেলা জাহাজ ছাড়া হল। আবার এক দ্বীপে গেল জাহাজ। এইভাবে সেনাপতি সৈন্য যোগাড় করল। আর একটা জাহাজ মিলল। দ্বীপদেশ থেকে সৈন্য জোগাড়ও করল।

এবার দেশে ফেরা।

সৈন্যবোঝাই দুই জাহাজ নিয়ে সেনাপতি ফিরে চলল।

ওদিকে ক্রীটের রাজা মামুনের ফাঁসির ব্যবস্থা করে ফেলেছে।

বাজারের কাছে ফাঁসিকাঠ তৈরি হয়েছে। দেশের লোক রাজার ফাঁসি হবে দেখে দুঃখে ভেঙে পড়ল।

সেদিন একটু বেলায় রাজা মামুনের ফাঁসির ব্যবস্থা হল। বাজারে অনেক লোক জড় হল। সকলেই দুঃখে কাতর। একটু ক্ষ্যাপাটে হলেও রাজা মামুনকে ওরা ভালোবাসে।

সেদিনই সেনাপতির জাহাজ জাহাজঘাটায় ভিড়ল।

সেনাপতি তীরে নামল। তখনই নৌকোর আড়াল থেকে দুজন দেশবাসী সেনাপতির কাছে ছুটে এল। বলল—মাননীয় সেনাপতি ক্রীটের রাজা রাজামশাইকে ফাঁসি দেবার সব ব্যবস্থা করেছে। বাজারের কাছে।

সেনাপতি একদৃষ্টে নিজের জাহাজে গিয়ে উঠল। গলা চড়িয়ে বলল—সৈন্যভাইয়েরা আমরা এখনই আক্রমণ করবো। তোমরা তৈরি হয়ে নেমে এসো।

সৈন্যরা খোলা তরোয়াল উঁচিয়ে জাহাজ থেকে নেমে আসতে লাগল।

তখন রাজা মামুনকে ফাঁসির মঞ্চে তোলা হয়েছে। ফাঁসুড়েও হাজির। কিন্তু ক্রীটের রাজা হুকুম দেবার আগেই সেনাপতির সৈন্যরা ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

ফাঁসি বন্ধ হয়ে গেল। লড়াই শুরু হল। সেনাপতির সৈন্যরা অভিজ্ঞ যোদ্ধা-রণকুশলী। রাজা ক্রীটের সৈন্যরা কচুকাটা হতে লাগল। বাকিরা দক্ষিণমুখো নিজেদের দ্বীপের দিকে পালাতে লাগল।

রাজা মামুনের প্রাসাদ শত্রুমুক্ত হল। দ্বীপবাসীরা রাজার জয়ধ্বনি তুলল। হিংকক দ্বীপ শত্রু মুক্ত হল। দ্বীপে আনন্দ উৎসব চলল।

ক্রীটের রাজা পরাজয় স্বীকার করল। সৈন্যবাহিনী নিয়ে ক্রীটে পালিয়ে গেল।

এবার ফ্রান্সিস সোনারঘরের খোঁজ শুরু করল। ও একটা জিনিস বুঝল সোনার ঘর প্রাসাদের বাইরে নয়। প্রাসাদের মধ্যেই আছে। রাজা সুমালা যে খেলাঘরগুলো তৈরি করেছিল ওখানেই আছে সোনার ঘর।

ফ্রান্সিস মাপকাঠিটা নিয়ে বসল। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল। কিন্তু কিছুই বুঝে উঠতে পারল না পাঁচ হাত লম্বা মাপকাঠিটা। পেতলের মাপকাঠিটা যেখানে থেকে শুরু হয়েছে ওখানে একটা ইংরেজি S-এর মত চিহ্ন। ফ্রান্সিস এই চিহ্নটার অর্থ বুঝল না।

ফ্রান্সিস খুব বুদ্ধিমান ও চিন্তাশীল ব্যক্তি হিসেবে মন্ত্রীর কাছে শুনেছে।

সেদিন মন্ত্রীমশাইয়ের বাড়িতে গিয়ে হাজির হল। প্রহরীরা বলল—বল গে ভাইকিং দলনেতা সাক্ষাৎ করতে এসেছেন। বিশেষ প্রয়োজন। প্রহরী চলে গেল। একটু পরে ফিরে এল। ফ্রান্সিসের ইঙ্গিতে প্রথম ঘরটায় ঢুকতে বলল।

ফ্রান্সিস ঘরটায় ঢুকল। বেশ সাজানো গোছানো ঘরে একটা বড় গোল টেবিল। চারদিকে বসার চেয়ার। পায়াওলা বাঁকা একটা চেয়ারে বসল ফ্রান্সিস।

কিছু পরে মন্ত্রী ঢুকলেন। ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়াল। মন্ত্রী বললেন—বসে বসে ফ্রান্সিস বললেন—তোমরাই তো ভাইকিং?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। ফ্রান্সিস বলল।

—তোমরা কী কর? মন্ত্রী বললেন।

—দেশ বিদেশে ঘুরে বেড়াই। কোথাও গুপ্ত-ধনভাণ্ডারের খবর পেলে সেই ধনভাণ্ডার খুঁজে বের করি। ফ্রান্সিস বলল।

—বদলে গুপ্তধন ভাণ্ডারের অংশ নাও না? মন্ত্রী বলল।

—আজ্ঞে না। ফ্রান্সিস বলল।

—বাঃ। তোমাদের নীতিবোধের প্রশংসা করছি। কিন্তু আমি তোমাদের কী উপকার করতে পারি? মন্ত্রী বলল।

—আপনি তো সোনার ঘরের কথা জানেনই। সেই ঘরটা রাজা সুমালা কোথায় তৈরি করেছিলেন বলে আপনার মনে হয়। ফ্রান্সিস বলল।

—সেটা বের করা খুবই মুশকিল। কারণ কোন সূত্র নেই। মন্ত্রী বললেন।

—আমার কাছে একটা সূত্র আছে। অনেক হাত ঘুরে আমার হাতে এসেছে ওটা। ফ্রান্সিস মাপকাঠিটা বের করল।

—কী সেটা? মন্ত্রী বললেন।

—ফ্রান্সিস পাঁচ হাত লম্বা মাপকাঠিটা দেখালে মন্ত্রী কিছুক্ষণ হাতে নিয়ে দেখলেন তারপর বললেন—এটা কিসের মাপ?

—রাজা সুমাল যে সব খেলার জন্য ঘর বানিয়েছিলেন এই মাপকাঠিটা দিয়েই মাপা হয়েছিল সেসব। ফ্রান্সিস বলল।

—তা হতে পারে। মন্ত্রী বলল।

—মাপকাঠিই নাকি ওখানেই ইটবালি ধুলোর মধ্যে পাওয়া গিয়েছিল। ফ্রান্সিস বলল।

—এখন বল আমার কাছে এসেছো কেন?

ফ্রান্সিস আঙ্গুল দিয়ে মাপকাঠির 'S'+3 চিহ্নটা দেখিয়ে বলল—এই চিহ্নটার অর্থ কী?

মন্ত্রীমশাই বেশ কিছুক্ষণ চিহ্নটার দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর বললেন—এটা আমি বলতে পারবো না। সবচেয়ে ভালো হয় যদি জ্ঞান বৃদ্ধের কাছে যেতে পারো। উনি আমার চেয়ে অনেক বেশি বুদ্ধিমান। তা ছাড়া পুরোনো আমলের লেখা চিহ্ন এসব—নিয়ে চর্চা করেন। সহজেই চিহ্নের অর্থ বলে দিতে পারবেন।

—তাঁকে কোথায় পাবো? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—ঐ উত্তরের পাহাড়ের নিচে তাঁর আশ্রম। মন্ত্রী বললেন।

ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়াল। তখনই হ্যারি এল ফ্রান্সিসের খোঁজে। দুজনে চলল উত্তরের পাহাড়ের দিকে। পাহাড়ের নিচে এসে দেখল—একটা আশ্রম। বাড়ি ও গাছগাছালি। কয়েকটা হরিণ ঘুরে বেড়াচ্ছে। একটি অল্পবয়স্ক ছেলে হরিণগুলোর সঙ্গে খেলা করছিল। ফ্রান্সিস ছোট ছেলেটিকে ডাকল। ছেলেটি কাছে এল। ফ্রান্সিস বলল—জ্ঞানবৃদ্ধের সঙ্গে দেখা করবো। তিনি কোথায় আছেন?

—আমার সঙ্গে আসুন। ছেলেটি ফ্রান্সিসদের নিয়ে চলল। পেছন দিকে একটা ছোট ঘর। ঘাসপাতায় তৈরি। সেই ঘরের দরজায় এসে ছেলেটি দাঁড়াল। হাত দিয়ে ঘরের ভেতরটা দেখাল।

দুজনে ঘরের দরজায় গিয়ে দাঁড়ালো। দেখল—এক বৃদ্ধ একটা হরিনের চামড়ার আসনে বসে আছেন। হ্যারি বলল—একটা বিশেষ প্রয়োজনে আপনার কাছে এসেছিলাম।

—ঠিক আছে। ভেতরে এসে বসো।

ফ্রান্সিস আর হ্যারি একটা পাতা কম্বলে গিয়ে বসল। ফ্রান্সিস মাপকাঠিটা জ্ঞানবৃদ্ধকে দিল। বলল—একটা S+3 চিহ্ন আছে মাপকাঠিটায়। এটার অর্থ কী?

জ্ঞানবৃদ্ধ কিছুক্ষণ মনোযোগ দিয়ে দেখলেন। তারপরে বললেন—এটার অর্থ গুণ। মাপকাঠিটা দিয়ে কিছু একটা মাপতে হবে তারপর গুণ করতে হবে। মহন্ত বললেন।

—তাহলে তো তিন পাঁচে পনেরো দাঁড়ায়। ফ্রান্সিস বলল।

—হ্যাঁ। মহন্ত বৃদ্ধ মাথা নাড়লেন।

—ঠিক আছে। এইটাই আমার জানার দরকার ছিল। ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়াল। হ্যারিও উঠল।

—কিন্তু তোমরা এই মাপামাপি করছো কেন? জ্ঞানবৃদ্ধ বলল।

—আপনি তো জানেন রাজা সুমালা একটা সেনার ঘর তৈরি করিয়েছিলেন। আমার সেই সোনার ঘরটা খুঁজছি। ফ্রান্সিস বলল।

—বেশ কঠিন কাজ। দেখ পাও কিনা। জ্ঞানবৃদ্ধ বললেন।

দুজনে আশ্রম থেকে বেরিয়ে এল। ফ্রান্সিস বলল—হ্যারি। সোনার ঘর বের করতে পারবে।

—মাপকাঠির মাপটাপ সমাধান করেছো? হ্যারি বলল।

হ্যারি, এবার রাজা মামুনকে খেলাঘরগুলির জায়গায় নিয়ে এসো। ফ্রান্সিস বলল।

দুজনে রাজপ্রাসাদে এল। একটু পরে রাজা মামুন মন্ত্রী দুজনেই এলেন খেলাঘরের এলাকাটায় রাজা সুমালা দেয়াল তুলে ঘিরে দিয়েছিল। তার যে ঢোকার দরজাটা ছিল ফ্রান্সিস সেই দরজার ঠিক মাঝখান থেকে মাপকাঠি দিয়ে মেপে চলল। একটা ঘরের সামনে এসে পনেরো হাত শেষ হল। ফ্রান্সিস বলল—কুড়ুল চাই। ঘরটা ভাঙতে হবে।

ততক্ষণে সেখানে অনেক লোক জড়ো হয়েছে। সোনার ঘর দেখা যাবে—সোজা কথা নয়। রাজা মামুন এলেন। তিনিও উত্তেজিত। সোনার ঘর আবিষ্কৃত হবে। তাঁর আনন্দের শেষ নেই।

হ্যারি একজন সৈন্যকে একটা কুড়ুল আনতে বলল। অল্পক্ষণের মধ্যেই কুড়ুল আনা হল।

ফ্রান্সিস ঘরটায় কুড়ুল চালাতে লাগল। ইটের টুকরো ধুলোবালি ছিটকে বেরুতে লাগল। প্রায় অর্দ্ধেক ভাঙা হয়ে গেল। সোনার ঘরের দেখা নেই।

আরো ভাঙা হল। কিছুই পাওয়া গেল না। ফ্রান্সিস মাথা নিচু করে রইল। রগচটা রাজা মামুন বিরক্তির সঙ্গে বলল—কী সব কাণ্ড। সোনার ঘর বের করা অত সহজ কাজ নয়। আমি যাচ্ছি। রাজা মামুন চলে গেলেন। মন্ত্রী বললেন—আরো ভালোভাবে খোঁজ কর। পাওয়া যাবে ঠিকই।

বেশ লোকজন জড়ো হয়েছিল। তারাও চলে যেতে লাগল। তখনই শাঙ্কো বিস্কোরা এল।

হ্যারি ফ্রান্সিসের কাছে এল। বলল—কী ব্যাপার ফ্রান্সিস।

—ঠিক বুঝতে পারছি না। ফ্রান্সিস বলল।

—আর একবার মাপজোক কর। হ্যারি বলল।

—দেখি। ফ্রান্সিস পেতলের মাপকাঠিটা নিল। হাত বুলিয়ে দেখতে লাগল। হঠাৎই দেখল একটা হাতার কোনায় একটা ছোট কড়া। ফ্রান্সিস চমকে উঠল তাহলে তো এখানেও একটা এক হাতের সমান পিতলের কাঠি ছিল যার মাপ অন্যগুলির মতই এক হাত।

—তুমি কি এ বিষয়ে নিশ্চিত? হ্যারি।

—নিশ্চিত। এখন কাজ। বিস্কোকে ডাকল।

—বলো। বিস্কো বলল।

—জাহাজে যাও তোমার কাঠের কাজে হাত ভালো। মাপকাঠিটা নিয়ে যাও। এই কাঠির সমান একটা টুকরো কর তারপর সেটাকে একটা কড়া দিয়ে পেতলের কড়ার সঙ্গে আটকে দাও। মাপকাঠিটা ছয় হাতই ছিল। পরে একটা হাতা ভেঙে হারিয়ে যায়। বিস্কো পেতলের মাপকাঠিটা নিয়ে চলে গেল। ভাইকিং বন্ধুরাও সেখানে এল।

ফ্রান্সিসরা অপেক্ষা করতে লাগল। কিছু পরে বিস্কো ফিরে এল। সঙ্গে মাপকাঠিটা। কাঠের হাতা লাগানোয় দৃঢ় হাত হল।

এবার ফ্রান্সিস দৃঢ় হাত মাপের মাপকাঠিটা নিয়ে মাপতে লাগল। একেবারে সদর

দরজা থেকে মাপতে লাগল। মেপে মেপে আঠারো হাত পরে থামল। ৭ এর সঙ্গে ছিল তিন। তাই তিন দিয়ে পূর্ণ করল ফ্রান্সিস।
ফ্রান্সিস কুড়ুল চালিয়ে আঠারো নম্বর ঘরটা ভাঙতে লাগল। কিন্তু কোথায় সোনা? পাথর ধূলো বালি ছিটকোচ্ছে।
ফ্রান্সিস মাথা নিচু করে ভাবতে লাগল। ওর গণনায় কোন ভুল নেই। সোনার ঘর এখানেই আছে। এই আঠারো নম্বর ঘরের নিচে আছে।
উৎসাহে ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে বলল—শাঙ্কো বিস্কো কুড়ুল জোগাড় করে আনো। এই ভিতের নিচে খুঁড়তে হবে।
শাঙ্কো বিস্কো কুড়ুল জোগাড় করে নিয়ে এল। তিনজনে ঘরের ভিত ভাঙতে লাগল। কুড়ুলের ঘায়ে গর্ত হতে লাগল। হঠাৎ একটা সোনার টুকরো ছিটকে পড়ল। ফ্রান্সিস সোনার টুকরোটা হাতে নিয়ে তুলে ধরল। লোকের ভিড়ে চাঞ্চল্য জাগল। সবাই অবাক। তাহলে এখানেই আছে সোনার ঘর?
ফ্রান্সিসরা তিনজনে বসে পড়ল। হাঁপাতে লাগল। সেনাপতি এগিয়ে এল। বলল— তোমরা নিঃস্বার্থ ভাবে আমাদের দেশের সম্পদ উদ্ধার করছো। তোমরা বিশ্রাম কর। বাকি খোঁড়ার কাজ আমরা করবো। সেনাপতি কয়েকজন সৈন্যকে বলল—খুঁড়ে ফেল ভিতটা।
সৈন্যরা কুড়ুল চালাতে লাগল। কিছুক্ষণের মধ্যেই সোনার স্তর দেখা গেল। আস্তে আস্তে সবটা খোঁড়া হল। সোনার ঘর দেখা গেল। নিরেট সোনার ঘরের মত। জমাট সোনা। রোদের আভা পড়ে চক্‌চক্ করছে। সবাই হাঁ করে তাকিয়ে রইল।
হ্যারি ফ্রান্সিসের কাছে এল। বলল—ফ্রান্সিস একটা কাজ করতে হবে যে।
—কী কাজ? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।
—শাঙ্কোর কাছে সোনার চাকতি প্রায় ফুরিয়ে এসেছে। রাজা মামুনকে বল আমাকে হাজার পাঁচেক স্বর্ণমুদ্রা দিতে।
—বেশ বলছি। ফ্রান্সিস রাজা মামুনের কাছে গেল। বলল—মাননীয় রাজা দেশ বিদেশ ঘুরে বেড়াই। অর্থের খুবই প্রয়োজন। এখন সেই অর্থ আমাদের কমে এসেছে। আপনি যদি আমাদের পাঁচ হাজার স্বর্ণমুদ্রা দেন তাহলে বড়ই উপকার হয়।
—নিশ্চয়ই দেব। আমার সঙ্গে কেউ আসুন। রাজা বললেন।
ফ্রান্সিস হ্যারিকে যেতে বলল। হ্যারি রাজার সঙ্গে গেল।
কিছুক্ষণ ফ্রান্সিসরা অপেক্ষা করল। হ্যারি কোমরের মধ্যেও সোনার চাকতি ভরে নিয়ে এল। জাহাজঘাট নয় জাহাজের কাছে আসতেই জাহাজ থেকে বন্ধুরা ধ্বনি তুলল—হো -হো-রে। ফ্রান্সিস মারিয়াকে দেখে বলল—মারিয়া এবার কিছু স্বর্ণমুদ্রা এনেছি। কাল সকালে আমরা কাপড়ের দোকানে যাব। সবাই পোশাক তৈরি করাবো। বিছানাপত্রের কাপড় চোপড়ও কিনবো। আমরা দরিদ্র নই। জলদস্যু আমাদের ভিখিরি বলেছিল।

রাজা আলফ্রেডের স্বর্ণখনি

স্বদেশে ফেরার জন্য ভাইকিংদের আগ্রহ তুঙ্গে উঠল। এখন ওরা কোন কথা শুনতেই রাজি নয়। স্বদেশে ফিরবেই। কিন্তু ফ্রান্সিস? তাকে বোঝাবে কী করে? হ্যারি ব্যাপারটা আঁচ করতে পারল। কিন্তু ফ্রান্সিসকে কিছু বলল না। ও দেখবার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল বন্ধুরা কী করে।

ভাইকিং বন্ধুরা হ্যারিকে বলল—তুমিই ফ্রান্সিসকে বুঝিয়ে-সুজিয়ে দেশে ফেরার জন্য রাজি করাও।

হ্যারি বলল—ফ্রান্সিস আমার কথা শুনবে না।

—তুমি ওর প্রাণের বন্ধু। তোমার কথা শুনবে না।

—না। ও যা মনস্থির করে তাই করে। কারো মতামত গ্রাহ্য করে না। হ্যারি বলল।

—তাহলে উপায়? বন্ধুরা বলল।

—আমার অবশ্য বলা উচিত না তবু বলছি একমাত্র রাজকুমারীই পারে ফ্রান্সিসকে রাজি করাতে। হ্যারি বলল।

—ঠিক বলেছো। আমরা রাজকুমারীকে বলবো। বন্ধুরা বলল।

মারিয়া প্রতিদিন সূর্যাস্ত দেখতে জাহাজের রেলিং ধরে দাঁড়ায়। সেদিনও এসেছে।

তখন সূর্য অস্ত যাচ্ছে। সূর্য নেমে আসছে সমুদ্রের ঢেউয়ের মাথায়। আস্তে আস্তে উঁচু উঁচু ঢেউয়ের মধ্যে সূর্য ডুবে গেল। একটু অন্ধকার হয়ে এল চারদিক।

শাঙ্কো বিস্কোরা রাজকুমারীর কাছে এল। এভাবে ভাইকিংরা কখনো রাজকুমারীর কাছে আসে না। সেদিন এল। রাজকুমারী একটু অবাক হয়েই ওদের দিকে তাকাল।

—রাজকুমারী। শাঙ্কো ডাকল।

—কী ব্যাপার বলো তো। তোমরা আমাকে কিছু বলবে? মারিয়া বলল।

—হ্যাঁ। শাঙ্কো বলল।

—বলো। মারিয়া বলল।

—আমরা আর ঘুরে বেড়াতে রাজি নই। এবার আমরা দেশে ফিরে যেতে চাই। বিস্কো বলল।

—সে তো আমিও চাই। কতদিন বাবা-মাকে দেখি না।

—আপনি ফ্রান্সিসকে বলুন যাতে ও দেশে ফিরে যেতে রাজি হয়। বিস্কো বলল।

—আমি বললেই কি ও রাজি হবে? তবু তোমরা বলছো। দেখি বলে। রাজকুমারী বলল।

শাঙ্কোরা চলে গেল। মারিয়া কেবিনঘরে এল। দেখল ফ্রান্সিস চুপ করে চোখ বুঁজে শুয়ে আছে।

রাজকুমারী বিছানার পাশে বসল। আস্তে আস্তে বলল—একটা কথা বলছিলাম।

—কী কথা? ফ্রান্সিস চোখ খুলে বলল।

—এবার দেশে ফিরে চলো। রাজকুমারী বলল।

—আমরা তো এ দেশ ঐ দ্বীপ এসব জায়গায় থেমে থেমে ফিরবো। যদি কোন গুপ্ত ধনভাণ্ডারের খবর না পাই—ফিরে যাবো। ফ্রান্সিস বলল।

—যদি কোন গোপন ধনভাণ্ডারের খোঁজ পাও? মারিয়া জিজ্ঞেস করল।

—তাহলে তো উদ্ধারের কাজে নামবো। ফ্রান্সিস বলল।

—তার মানে তো আরো বেশ কিছুদিন নষ্ট হওয়া। মারিয়া বলল।

—নষ্ট বলবো কেন? সময়টা তো আমরা কাজে লাগাবো।

—না না। আর বিলম্ব নয়। এখন সোজা দেশে চলো। মারিয়া বলল।

—আমি সে কথা দিতে পারছি না। ফ্রান্সিস মাথা নেড়ে বলল।

—না। আর কোথাও থামা চলবে না। মারিয়া বলল।

—তা হয় না মারিয়া। গোপন ধনভাণ্ডারের খবর পেয়ে আমাকে আবার লাগতে হবে। ফ্রান্সিস বলল। এটাই আমি চাইছি না।

গোপন ধনভাণ্ডারের খবর পেলেও তুমি এড়িয়ে যাও। জাহাজে দেশের দিকে চলুক। মারিয়া বলল।

—দেখি। তবে কথা দিতে পারছি না। ফ্রান্সিস বলল।

—না। তোমাকে কথা দিতে হবে। মারিয়া গলায় জোর দিয়ে বলল।

—না মারিয়া। পারবো না। তবে তোমরা যদি চলে যেতে চাও যেতে পারো। যেসব বন্ধুরা আমার সঙ্গে থাকতে চাইবে তাদের নিয়ে আমি জাহাজ কিনে আমার কাজ করে যাবো। ফ্রান্সিস বলল।

—তুমি ভালো করেই জানো তোমাদের কয়েকজনকে একা ফেলে আমরা কখনই যাবো না। মারিয়া বলল।

—আমিও সেটাই চাই। ফ্রান্সিস বলল।

যদি কোন গোপন ধনভাণ্ডারের খবর না পাও তাহলে দেশে ফিরে যাবে তো? মারিয়া জানতে চাইল।

—হঠাৎ সেক্ষেত্রে আমার তো কিছু করার নেই। দেশের দিকেই থাকে।

ফ্রান্সিস বলল—
—তাহলে ওকথাই রইল। মারিয়া বলল।
—বেশ। ফ্রান্সিস মাথা নেড়ে বলল।
মারিয়া ডেক-এ উঠে এল। শাঙ্কোরা কয়েকজন রাজকুমারীর জন্যে অপেক্ষা করছিল। রাজকুমারী ওদের কাছে এল। শাঙ্কোরা এগিয়ে এল। রাজকুমারীর ফ্রান্সিসের সঙ্গে যা যা কথা হয়েছে বলল। তারপর বলল—কোন গোপন ধন ভাণ্ডারের খবর না পেলে ফ্রান্সিস দেশে ফিরতে রাজি হবে।
—তাহলে দেখা যাক—কী ঘটে। শাঙ্কো বলল।
ফ্রান্সিসদের জাহাজ চলেছে।
সেদিন দুপুরে মাস্তুলের ওপর থেকে নজরদার পেড্রো চেঁচিয়ে বলল—ডাঙা দেখা যাচ্ছে—ডাঙা। সিঁড়িঘরের কাঠের দেওয়ালে পিঠ দিয়ে বিস্কো বসেছিল। পেড্রোর কথাটা ও শুনল। ও ছুটল ফ্রান্সিসকে খবর দিতে।
একটু পরে ফ্রান্সিস মারিয়া হ্যারি ডেক-এ উঠে এল। ফ্রান্সিস ভালো করে দেখেটেখে বলল—একটা ছোট বন্দর। চলো—খোঁজ নেওয়া যাক। জাহাজ বন্দরে ভেড়াতে বল।
জাহাজ চালক ফ্লেজার বন্দরে জাহাজ ভেড়াল।
বিকেলে কিছু বন্ধু ফ্রান্সিসের কাছে এল। বলল—বরাবর তুমিই খোঁজখবর করতে যাও। আজকে আমরা যাবো।
—বেশ তোমরাই খোঁজ নিয়ে এসো। কিন্তু কোন লড়াইয়ে জড়িয়ে পড়ো না। ফ্রান্সিস বলল।
দশ বারোজন বন্ধু দল বেঁধে নেমে গেল।
শাঙ্কো হ্যারি বিস্কো আর কয়েকজন বন্ধু গেল না। জাহাজেই রইল।
অন্ধকার হয়ে এল। বন্ধুরা ফিরল না।
হ্যারি ফ্রান্সিসের কেবিনঘরে এল। বলল—ফ্রান্সিস বন্ধুরা এখনও ফিরল না। খুবই বিপদের কথা।
—মাটিতে নামার সুযোগ তো ওরা পায় না। আজকে পেয়েছে। ঘুরেফিরে বেড়াচ্ছে। ফ্রান্সিস বলল।
মারিয়া হেসে বলল—জাহাজের বাধাবদ্ধ জীবন। একটু বৈচিত্র্য সবাই চায়। বিশেষ করে ডাঙায় উঠে।
—তা ঠিক। তবু এটা আমাদের কাছে বিদেশ। ওদিকে অন্ধকারও হয়ে আসছে। বন্ধুরা কোন বিপদে পড়ল কিনা কে জানে। হ্যারি বলল।
বন্দরটার নাম রেজিল। ফ্রান্সিসের বন্ধুরা হৈ হৈ করে বন্দরে ঘুরে বেড়াতে লাগল। এই দলের মধ্যে ছিল সিনাত্রা। সিনাত্রা বেশ বুদ্ধিমান। বন্ধুরাও ওকে খুব ভালোবাসে।
ওরা বাজার এলাকায় ঘুরে বেড়াচ্ছে তখনই এক একজন কালো মানুষ

ওদের দিকে এগিয়ে এল। বলল—তোমরা বিদেশি?

—হ্যাঁ। আমরা ভাইকিং। সিনাত্রা বলল।

—বন্দরে তোমাদের জাহাজ দেখলাম। লোকটি বলল।

—হ্যাঁ। আমরা দুপুরে এখানে এসেছি। একজন ভাইকিং বলল।

—তোমরা ঘুরে বেড়াচ্ছো নিশ্চয়ই তোমাদের খিদে পেয়েছে। আমার সঙ্গে এসো। খেতে দেব। কালো লোকটি বলল।

—খুব ভালো কথা—সিনাত্রা বলল—চলো ভাইসব নিমন্ত্রণ রক্ষা করা যাক।

লোকটার পেছন পেছন ওরা চলল।

একটা বেশ বড় বাড়ির সামনে এল ওরা।

লোকটি বলল—বাড়ির ভেতরে চলো।

ওরা বাইরের ঘরে ঢুকল। বেশ সাজানো গোছানো ঘর। বোঝাই যাচ্ছে গৃহকর্তা ধনী। ওরা এদিক-ওদিকে রাখা চেয়ারে বসল। সবাইয়ের জায়গা হল না। কয়েকজন মেঝেয় বসল।

লোকটি বাড়ির ভেতরে চলে গেল।

কিছু পরে একজন বেশ শক্তসমর্থ চেহারার মধ্যবয়স্ক পুরুষ ঘরে ঢুকল। সামনের ফাঁকা চেয়ারটায় বসল। বলল—শুনলাম তোমরা বিদেশি।

—হ্যাঁ। আমরা ভাইকিং। সিনাত্রা বলল।

—তোমরা বোধহয় লক্ষ্য করোনি আমার বাড়ির পেছনে বিরাট তুলোর ক্ষেত। মধ্যবয়স্ক ব্যক্তি বলল।

—না। অন্ধকার হয়ে এসেছে তো। সিনাত্রা বলল।

কথা হচ্ছে তখনই আট দশজন বলিষ্ঠদেহী নিগ্রো দরজার কাছে এসে দাঁড়ালো। সিনাত্রা বিপদ আঁচ করলো। কিন্তু কিছু বলল না। লোকটি বলল—আমার বাড়ির পেছনে বন্দীশালা। আমার তুলার ক্ষেতে কাজ করার জন্যে যাদের ধরে আনি তারা প্রথমে ঐ বন্দীশালায় থাকে। তারপর ক্ষেতে পাঠাই। দশবারোজন পাহারাদার থাকে ক্ষেতগুলোর চারপাশে।

এবার সিনাত্রা উঠে দাঁড়াল। বলল—এসব আমাদের বলছেন কেন?

—কারণ তোমরা এখন বন্দী। তবে যে তোমাদের তুম্বা মানে যে তোমাদের নিয়ে এসেছে সে বোধহয় বলেনি তোমাদের—আমি প্রচুর অর্থ দেব।

সিনাত্রা গলা চড়িয়ে বলল—কিন্তু আমাদের কেন বন্দী করা হবে?

—কারণ তোমরাই আমার তুলোর ক্ষেত চাষ করবে। তুলো ফলাবে। তুলোর গাঁটরি কাঁধে করে জাহাজে চালান দেবার জন্য জাহাজে তুলে দেবে।

—তার মানে আপনি আমাদের ক্রীতদাস করে রাখবেন। সিনাত্রা বলল।

—হ্যাঁ। পালাবার চেষ্টা করে লাভ নেই। কারণ দরজায় দেখতেই পাচ্ছো আমাদের সব বাছাই করা যোদ্ধারা রয়েছে। ওদের সঙ্গে লড়াই করে পালাতে

গেলে তোমরা অর্দ্ধেকও বাঁচবে না। কাজেই আমার ক্ষেতের চাষি হও তোমরা। প্রচুর অর্থ পাবে।

সিনাত্রা বুঝল এখন ঐ নিগ্রো যোদ্ধাদের সঙ্গে লড়তে যাওয়া বোকামি। ওরা গুরুতর আহত হবে। কয়েকজন মরবেও। তার চেয়ে এই লোকটি যা বলছে মেনে নেওয়াই ভালো। ভবিষ্যতে সুযোগ বুঝে পালানো যাবে।

তুম্বা তখনই ঘরে ঢুকল। বলল—তোমরা যদি এখন পালিয়েও যাও তোমাদের জাহাজে উঠতে পারবে না। তোমাদের জাহাজ এখন প্রায় মাঝ সমুদ্রে।

সিনাত্রা ও বন্ধুরা ভীষণভাবে চমকে উঠল। সিনাত্রা বলল—আপনি দেখেছেন?

—না। আমি যখন দেখেছি তখন জলদস্যুরা সবেমাত্র তোমাদের জাহাজে উঠেছে। তারপর কী ঘটতে পারে ভেবে নাও। তুম্বা বলল। সিনাত্রাদের মন খারাপ হয়ে গেল। নিজেরা তো একটু পরেই বন্দীশালায় বন্দী হবে। ফ্রান্সিসরাও বন্দী হল?

সূর্যাস্ত দেখে মারিয়া কেবিনঘরে নেমে এল।

ফ্রান্সিস আর হ্যারি দুজনেই বন্ধুদের জন্যে ভাবছে। হ্যারি ফ্রান্সিসের বিছানায় বসে আছে। মারিয়া মোমবাতির আলোয় সূঁচসুতোর কাজ করছে।

হঠাৎ ওপরের ডেক-এ অনেক পায়ের শব্দ। হ্যারি বলল—সিনাত্রারা বোধহয় ফিরে এল।

ফ্রান্সিসের কেবিনঘরের বন্ধ দরজায় টোকা দেওয়ার শব্দ। হ্যারি দরজা খুলতে গেল। বন্ধুরা এসেছে। হ্যারি দরজা খুলে দিল।

কালো দাড়ি গোঁফওয়ালা জলদস্যু ক্যাপ্টেন। সঙ্গে খোলা তরোয়াল হাতে কয়েকজন জলদস্যু।

জলদস্যু ক্যাপ্টেন দাঁত বের করে হাসল। বলল—তোমাদের জাহাজের সঙ্গে আমাদের জাহাজ বাঁধা হয়ে গেছে। এখন আমাদের ক্যারাভেল জাহাজ তোমাদের জাহাজকে টেনে নিয়ে চলেছে। মাঝ সমুদ্রে।

ততক্ষণ ফ্রান্সিসদের জাহাজ দুলতে শুরু করেছে। বড় বড় ঢেউ ভেঙে পড়ছে জাহাজের গায়ে।

—নাও। দেরি করো না। ওপরের ডেক-এ উঠে এসো। ক্যাপ্টেন বলল।

ফ্রান্সিস আর হ্যারি উঠে দাঁড়াল। হ্যারি দেশীয় ভাষায় বলল—কয়েদঘর থেকে আমাদের মুক্তি নেই।

—তাই দেখছি। এখন কতদিন বন্দীদশা চলবে মা মেরিই জানে। ফ্রান্সিস বলল।

ফ্রান্সিস হ্যারি মারিয়া ওপরে ডেক-এ উঠে এল। দেখল শাঙ্কো বিস্কো আর কয়েকজন বন্ধু ডেক এর একপাশে বসে আছে। পাহারা দিচ্ছে খোলা তরোয়াল হাতে কয়েকজন জলদস্যু।

গেলে তোমরা অর্দ্ধেকও বাঁচবে না। কাজেই আমার ক্ষেতের চাষি হও তোমরা। প্রচুর অর্থ পাবে।

সিনাত্রা বুঝল এখন ঐ নিগ্রো যোদ্ধাদের সঙ্গে লড়তে যাওয়া বোকামি। ওরা গুরুতর আহত হবে। কয়েকজন মরবেও। তার চেয়ে এই লোকটি যা বলছে মেনে নেওয়াই ভালো। ভবিষ্যতে সুযোগ বুঝে পালানো যাবে।

তুম্বা তখনই ঘরে ঢুকল। বলল—তোমরা যদি এখন পালিয়েও যাও তোমাদের জাহাজে উঠতে পারবে না। তোমাদের জাহাজ এখন প্রায় মাঝ সমুদ্রে।

সিনাত্রা ও বন্ধুরা ভীষণভাবে চমকে উঠল। সিনাত্রা বলল—আপনি দেখেছেন?

—না। আমি যখন দেখেছি তখন জলদস্যুরা সবেমাত্র তোমাদের জাহাজে উঠেছে। তারপর কী ঘটতে পারে ভেবে নাও। তুম্বা বলল। সিনাত্রাদের মন খারাপ হয়ে গেল। নিজেরা তো একটু পরেই বন্দীশালায় বন্দী হবে। ফ্রান্সিসরাও বন্দী হল?

সূর্যাস্ত দেখে মারিয়া কেবিনঘরে নেমে এল।

ফ্রান্সিস আর হ্যারি দুজনেই বন্ধুদের জন্যে ভাবছে। হ্যারি ফ্রান্সিসের বিছানায় বসে আছে। মারিয়া মোমবাতির আলোয় সূঁচসুতোর কাজ করছে।

হঠাৎ ওপরের ডেক-এ অনেক পায়ের শব্দ। হ্যারি বলল—সিনাত্রারা বোধহয় ফিরে এল।

ফ্রান্সিসের কেবিনঘরের বন্ধ দরজায় টোকা দেওয়ার শব্দ। হ্যারি দরজা খুলতে গেল। বন্ধুরা এসেছে। হ্যারি দরজা খুলে দিল।

কালো দাড়ি গোঁফওয়ালা জলদস্যু ক্যাপ্টেন। সঙ্গে খোলা তরোয়াল হাতে কয়েকজন জলদস্যু।

জলদস্যু ক্যাপ্টেন দাঁত বের করে হাসল। বলল—তোমাদের জাহাজের সঙ্গে আমাদের জাহাজ বাঁধা হয়ে গেছে। এখন আমাদের ক্যারাভেল জাহাজ তোমাদের জাহাজকে টেনে নিয়ে চলেছে। মাঝ সমুদ্রে।

ততক্ষণ ফ্রান্সিসদের জাহাজ দুলতে শুরু করেছে। বড় বড় ঢেউ ভেঙে পড়ছে জাহাজের গায়ে।

—নাও। দেরি করো না। ওপরের ডেক-এ উঠে এসো। ক্যাপ্টেন বলল।

ফ্রান্সিস আর হ্যারি উঠে দাঁড়াল। হ্যারি দেশীয় ভাষায় বলল—কয়েদঘর থেকে আমাদের মুক্তি নেই।

—তাই দেখছি। এখন কতদিন বন্দীদশা চলবে মা মেরিই জানে। ফ্রান্সিস বলল।

ফ্রান্সিস হ্যারি মারিয়া ওপরে ডেক-এ উঠে এল। দেখল শাঙ্কো বিস্কো আর কয়েকজন বন্ধু ডেক এর একপাশে বসে আছে। পাহারা দিচ্ছে খোলা তরোয়াল হাতে কয়েকজন জলদস্যু।

পাহারাদার জলদস্যুরা ফ্রান্সিসদের শাঙ্কোদের পাশে বসিয়ে দিল। শাঙ্কো বলল—আমরা ছক্কা-পাঞ্জা খেলছিলাম। ডেক-এ কেউ ছিল না। আমরা বুঝতেই পারিনি কী ঘটে গেছে।

—যা ঘটে গেছে, গেছে। এখন আমাদের বন্দী জীবনই মেনে নিতে হবে। হ্যারি বলল।

কিছুক্ষণ পরে জলদস্যু ক্যাপ্টেন ফ্রান্সিসদের কাছে এল। হেসে বলল—এবার বেশ তরতাজা ইউরোপীয় যুবক পাওয়া গেছে। ভালো দাম পাওয়া যাবে। ফ্রান্সিস বলল—ওদের ক্রীতদাসের হাটে বিক্রি করা হবে। ক্যাপ্টেন গলা চড়িয়ে বলল—এগুলোকে কয়েদঘরে ঢোকা। তিনচারজন জলদস্যু খোলা তরোয়াল হাতে এগিয়ে এল। ফ্রান্সিসদের কাছে এসে বলল—চলো সব। ফ্রান্সিসরা উঠে দাঁড়াল। ফ্রান্সিস ক্যাপ্টেনকে বলল—একটা কথা ছিল?

—কী? ক্যাপ্টেন বলল।

—আমাদের সঙ্গে রয়েছেন আমাদের দেশের রাজকুমারী। তাঁকে আমাদের সঙ্গে কয়েদঘরে রাখবেন না। তাঁকে আমাদের জাহাজেই রাখুন। ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে বলল। জলদস্যু ক্যাপ্টেন একটু ভাবল। তারপর বলল—রাজকুমারী? তা বেশ। তবে সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে পালাতে গেলে মরবে।

—সেটা উনি ভালোভাবেই জানেন। বোকার মত উনি তা করতে যাবেন না। ফ্রান্সিস বলল।

—তা হলেই ভালো। তোমাদের রাজকুমারীকে বিক্রি করতে গেলে ভালো দাম পাবো। ক্যাপ্টেন বলল।

তিন চারজন জলদস্যুর পেছনে পেছনে ফ্রান্সিসরা চলল। নিজেদের জাহাজ থেকে জলদস্যুদের জাহাজে গিয়ে উঠল। সিঁড়ি দিয়ে একেবারে নিচের কয়েদঘরে নিয়ে আসা হল ফ্রান্সিসদের।

প্রহরীদের একজন কোমর থেকে চাবির গোছা বের করল। চাবি বেছে নিয়ে ঢং-ঢাং শব্দে লোহার দরজা খুলল।

ফ্রান্সিসরা আস্তে আস্তে কয়েদঘরে ঢুকল। দুধারের দুই মশালের আলোয় ফ্রান্সিসরা দেখল কিছু কৃষ্ণকায় মানুষও বন্দী রয়েছে। বোঝাই যাচ্ছে—ক্রীতদাস কেনাবেচার হাটে এদেরও বিক্রি করা হবে।

ফ্রান্সিসরা মেঝেয় বসল। হ্যারি ফ্রান্সিসের কাছে এল। বলল—এবার আমাদের খুবই দুর্ভাগ্য। শাঙ্কো ফিরলো না আমরাও বন্দী হলাম। সব কেমন তছ্নছ্ হয়ে গেল।

—বুঝতে পারছি না কীভাবে মুক্তির চেষ্টা করবো। একবার মুক্তি পেলে বন্ধুদের খোঁজে রোজিল বন্দরে যাবো। মনে তো হয়—ওরা ভালো আছে। ফ্রান্সিস বলল।

—মনে হয় না। হয়তো ওদেরও কোন বিপদ হয়েছে। হ্যারি বলল।

—বিপদ হলে ওদেরই মোকাবিলা করতে হবে। আমরা তো অসহায় এখন। ফ্রান্সিস বলল।

—মুক্তির ব্যাপারটা গভীরভাবে ভাবো। হ্যারি বলল।

—তা তো ভাবতে হবেই। ফ্রান্সিস বলল।

একজন বলিষ্ঠ কৃষ্ণকায় বন্দী যুবক ফ্রান্সিসদের কাছে এল। বলল—'আপনাদের দলনেতা কে?

হ্যারি নিঃশব্দে আঙুল তুলে ফ্রান্সিসকে দেখল। যুবকটি ফ্রান্সিসদের পাশে এসে বসল।

—তোমার নাম? যুবকটি জানতে চাইল।

—ফ্রান্সিস। ফ্রান্সিস বলল।

—আমার নাম কোলা। যুবকটি বলল।

—ও। তুমি কিছু বলবে? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—হ্যাঁ। অনেক ভেবেচিন্তে এখান থেকে পালাবার উপায় বের করতে হবে। কোলা বলল।

—কোন উপায় নেই। জলদস্যুরা আমাদের নিয়ে যা করতে চাইবে তাই করবে। ফ্রান্সিস বলল।

—তার মানে ক্রীতদাসের জীবনই আমাদের ভাগ্য। কোলা বলল।

—তাই তো মনে হচ্ছে। ফ্রান্সিস বলল।

—আমরা পালাতে পারি। কোলা বলল।

—কীভাবে? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—যখন এরা খেতে দিতে আসে তখন লোহার দরজা খোলা থাকে। তখন খোলা দরজা দিয়ে পালালো। কোলা বলল।

—দরজার দুপাশে খোলা তরোয়াল হাতে প্রহরী থাকে। সেটা লক্ষ্য করেছো। ফ্রান্সিস মৃদু হেসে বলল।

—ওদের কাবু করে? কোলা বলল।

—অসম্ভব। ওরা অভিজ্ঞ তরোয়াল যুদ্ধে। খালি হাতে ওদের কাবু করা যাবে না। ফ্রান্সিস বলল।

—তাহলে তো আমাদের মুক্তির কোন আশাই নেই। কোলা বলল।

—না নেই। ফ্রান্সিস বলল।

কোলা কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। পরে বলল—তোমরা আমাদের চেয়ে অনেক বুদ্ধিমান। তোমরাই যখন পালাবার উপায় বের করতে পারছো না তখন আমরা আর কী করবো। তবে তোমরা যদি লড়াই করে পালাতে চাও আমরা তোমাদের সঙ্গে আছি।

—না। লড়াই করে পালাবার কথা এখন ভাবছি না। সেটা করতে গেলে বেশ কয়েকজন বন্ধুকে হারাতে হবে। আমি তা চাই না। ফ্রান্সিস বলল।

—লড়তে গেলে বাঁচামরা তো আছেই। কোলা বলল।

—তা ঠিক। তবে জেনেশুনে কেন মরতে যাবো? ফ্রান্সিস একটু থেমে বলল—বেশ কয়েকজন বন্ধুকে রেজিল বন্দরে ফেলে এসেছি। জানি না ওরা বেঁচে আছে কি না। তারপর আমরা যে কয়েকজন মাত্র আছি এদের মধ্যেও আবার কয়েকজনকে হারালে আমাদের দুঃখের শেষ থাকবে না।

—তুমি বন্ধুদের খুব ভালোবাসো? কোলা জিজ্ঞেস করল।

—প্রাণের চেয়ে বেশি। একটু থেমে ফ্রান্সিস বলতে লাগল—যখন অভিযানে বের হয়েছিলাম তখন বন্ধুদের বলেছিলাম তোমাদের রক্ষা করার জন্যে আমি প্রাণ দিতে প্রস্তুত। আজকে সব জেনেশুনে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিই কী করে?

—তাহলে ক্রীতদাসের হাটেই আমরা বিক্রি হয়ে যাবো, এটাই আমাদের ভাগ্য। কোলা বলল।

—তাই তো দেখছি। ফ্রান্সিস বলল।

কোলা উঠে দাঁড়াল। বলল—পালাবার ফন্দী আমিও আঁটছি। দেখি শেষ পর্যন্ত কী করতে পারি।

কোলা নিজের জায়গায় চলে গেল। ফ্রান্সিসের সঙ্গে যা কথাবার্তা হল বন্ধুদের বলতে লাগল।

শাঙ্কো বলল—ফ্রান্সিস যে লোহার ডান্ডাটা দিয়ে খাবার দেবার আগে লোহার দরজায় শব্দ করে সেই ডাণ্ডাটা হাতের কাছেই থাকে। ওটা দিয়ে অন্তত দুটো প্রহরীর মাথা ফাটিয়ে দেওয়া যায়।

—শাঙ্কো ঐ পাগলামি করতে যেও না। যাই কর আমাকে না জানিয়ে কিছু করো না। ফ্রান্সিস বলল।

হ্যারি মৃদুস্বরে বলল—ফ্রান্সিস, শেষ পর্যন্ত আমাদের ক্রীতদাসের জীবনই কাটাতে হবে। কেউ আমাদের বাঁচাতে পারবে না।

—এবার আমারও তাই মনে হচ্ছে। এই জলদস্যুরা পশুর মতো। হিংস্র হ্যারি আর কোন কথা বলল না।

জলদস্যুদের জাহাজ চলল। পেছনে ফ্রান্সিসদের জাহাজ বাঁধা। সেই জাহাজের কেবিনঘরে রাজকুমারী মারিয়া দুশ্চিন্তায় দিন কাটায়। ফ্রান্সিসদের দুর্বিষহ কষ্টের কথা ভেবে মারিয়া মাঝে মাঝে কাঁদে।

হঠাৎই জাহাজ দুটো ঝড়ের মুখে পড়ল। জাহাজের সজোরে এপাশ-ওপাশ দুলুনিতে ফ্রান্সিসরা কয়েদঘরের মেঝেয় এধার-ওধার গড়াতে লাগল। বিরাট বিরাট ঢেউয়ের ফাটলে জাহাজ পড়ছে উঠছে। সাংঘাতিক ঝাঁকুনিতে ফ্রান্সিসরা ছিটকে পড়ছে। বিদ্যুতের তীব্র আলো যেন আকাশ চিরে ফেলতে লাগল। সেইসঙ্গে গুরুগম্ভীর মেঘগর্জন আর প্রচণ্ড ঝড়ো হাওয়া। বহুকষ্টে ফ্রান্সিসরা ঝড়ের দুলুনি সহ্য করতে লাগল।

ঝড় আধঘণ্টার বেশি স্থায়ী হয়নি। তাতেই জলদস্যুদের প্রাণান্তকর অবস্থা। ঝড় থামলে দেখা গেল জলদস্যুরা ডেক-এর ওপর জড়াজড়ি করে পড়ে আছে। অসাড় নিস্পন্দ।

অল্পক্ষণের মধ্যেই জলদুস্যরা উঠে দাঁড়াতে লাগল। পালের মাস্তুলের হালের ছেঁড়া দড়িটড়ি বাঁধতে লাগল।

ততক্ষণে ফ্রান্সিসরা কেউ কেউ উঠে বসেছে। কেউ কেউ উঠে দাঁড়িয়েছে কেউ কেউ পায়চারি শুরু করেছে। ঝড়ের ধাক্কায় ফ্রান্সিসদের অবস্থা কাহিল।

জলদস্যুদের ক্যাপ্টেন তেমেলো একবার এসে ফ্রান্সিসদের অবস্থা দেখে গেল। হেসে বলে গেল—ঝড়ে এরকম অবস্থাই হয়। দু-একদিনের মধ্যেই শরীর ঠিক হয়ে যাবে। পেট পুরে খাও। শরীর ঠিক রাখো। ভালো দাম উঠবে। ফ্রান্সিসরা কেউ কিছু বলল না।

জলদস্যুদের ক্যাপ্টেন তেমেলোকে মারিয়া বলল—এই ঝড়জলে আমার স্বামী ও বন্ধুরা কেমন আছে আমি দেখতে যাবো।

—বেশ। যান। ক্যাপ্টেন তেমেলো আপত্তি করল না।

ফ্রান্সিস মারিয়াকে দেখে দরজার কাছে এগিয়ে এল।

—এই ঝড়জলে তোমাদের কোন কষ্ট হয়নি তো? মারিয়া জানতে চাইল।

ফ্রান্সিস হেসে বলল—ঝড় একেবারে দলাই মালাই করে দিয়ে গেছে। তবে মারাত্মক আহত হয়নি কেউ। কয়েকদিনের মধ্যেই শরীর ঠিক হয়ে যাবে। তোমার কিছু হয়নি তো?

—না না। আমি ভালো আছি। আমার চিন্তা তোমাদের জন্যে। মারিয়া বলল।

—আমাদের জন্যে ভেবো না। এখন চিন্তা এরপরে কী হবে। ফ্রান্সিস বলল।

—ফ্রান্সিস—মনে হয় এবার আমাদের কপালে অনেক দুঃখকষ্ট আছে। মারিয়া বলল।

—দেখা যাক। তুমি মন শক্ত রেখো। আমাদের জন্যে দুশ্চিন্তা করো না। ফ্রান্সিস বলল।

—আমি কি নিশ্চিন্ত থাকতে পারি। তবু তুমি বলছো চেষ্টা করবো বেশি চিন্তা না করতে। মারিয়া বলল।

—আমি সেটাই বলছিলাম। ফ্রান্সিস বলল।

আকাশ নির্মেঘ। হাওয়ারও প্রচণ্ড বেগ। জলদস্যুদের জাহাজের আর ফ্রান্সিসদের জাহাজের পাল ফুলে উঠেছে। দুটো জাহাজই চলেছে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে।

সেদিন দুপুরে। ফ্রান্সিসদের, জলদস্যুদের দুপুরের খাওয়া হয়ে গেছে। রোদ বেশ চড়া। জলদস্যুদের জাহাজের ডেক-এ মাত্র কয়েকজন সিঁড়িঘরের ছায়ায় বসে আছে।

হঠাৎ ওরা লক্ষ্য করল জলদস্যুদের একটা জাহাজ ওদের জাহাজ লক্ষ্য করে দ্রুত আসছে। ওদের দুজন ছুটল সিঁড়িঘরের দিকে। কেবিনঘরের কাছে গিয়ে চিৎকার করতে লাগল—একটা জলদস্যুদের জাহাজ আমাদের আক্রমণ করতে আসছে। সবাই তরোয়াল নিয়ে এসো। সেই দু'জন ক্যাপ্টেন তেমেলোকেও গিয়ে বলল। তেমেলো তখন দিবানিদ্রায় ছিলো। ওদের চিৎকার চ্যাঁচামেচিতে লাফিয়ে বিছানা থেকে উঠল। ওরা জলদস্যুদের জাহাজ ওদের জাহাজ লক্ষ্য করে আসছে একথা বলল। ক্যাপ্টেন তেমেলো গলা চড়িয়ে বলল—লড়াই। সবাইকে ডেক-এ উঠে আসতে বলো।

—আমরা বলেছি। ওরা তৈরী হয়ে ওপরে উঠছে। সেই দুজন বলল।

ক্যাপ্টেন তেমেলো ডেক-এ উঠে এল। দেখল আক্রমণকারী জাহাজটা মাত্র কয়েকহাত দূরে। ঐ জাহাজের জলদস্যুরা খোলা তরোয়াল হাতে লড়াইয়ের জন্যে প্রস্তুত। দুটো জাহাজ গায়ে গায়ে লাগান। আক্রমণকারীরা জাহাজের জলদস্যুরা লাফিয়ে তেমেলোর জাহাজে উঠে এল। শুরু হল লড়াই। তরোয়ালে তরোয়ালে ঠোকাঠুকি চলল। চিৎকার আর্তনাদ গোঙানি শোনা যেতে লাগল।

ওদিকে ফ্রান্সিসরা প্রহরীদের ছুটোছুটি দেখে বুঝল কিছু একটা হয়েছে।

—হ্যারি—দেখো তো কী ব্যাপার। ফ্রান্সিস বলল। হ্যারি দরজার কাছে গেল। একজন প্রহরীকে জিজ্ঞেস করল—কী ব্যাপার বলো তো?

—এক জলদস্যুদের জাহাজ আমাদের জাহাজ আক্রমণ করেছে। ডেক-এ লড়াই চলছে। একজন প্রহরী বলল।

—লড়াইয়ে তোমরা হেরে গেলে কী হবে? হ্যারি জিজ্ঞেস করল।

—অসম্ভব। আমাদের বন্ধুরা দুর্ধর্ষ লড়িয়ে। তাদের হারানো যাবে না। লড়াই শেষ হোক দেখবে আমরা জয়ী হয়েছি। প্রহরীটি বলল।

—কিছুই বলা যায় না। উল্টোটাও হতে পারে। হ্যারি আস্তে বলল।

—হ্যাঁ। তোমরা তো আমাদের পরাজয়ই চাও। তাহলেই মুক্তি পাবে। ব্যাপারটা কিন্তু অত সহজ না। প্রহরীটি বলল। তোমরা কিন্তু মুক্তি পাবে না। আমরা হেরে গেলে আমাদের জায়গায় ওরা তোমাদের বিক্রি করবে। তোমাদের মুক্তির কোন আশা নেই।

—তা তো বুঝতেই পারছি। তোমরা জলদস্যুরা সবাই এক চরিত্রের। ভালো মানুষ কখনও জলদস্যু হয় না। হ্যারি বলল।

—কথা বাড়িও না। চুপচাপ বসে থাকো তো। প্রহরী বলল।

—তা তো বটেই। হ্যারি বলল। তারপর ফ্রান্সিসদের কাছে এসে বসল।

—হ্যারি—সব শুনলাম। একটা আশার আলো দেখছি। ক্যাপ্টেন তেমেলো যদি হেরে যায় তাহলে নতুন জলদস্যুদের পাল্লায় পড়বো আমরা। এটা ঠিক হয়তো এরা আমাদের বিক্রি নাও করতে পারে। ফ্রান্সিস বলল।

—ফ্রান্সিস—আমার কিন্তু তা মনে হয় না। অর্থের লোভ বড় সাংঘাতিক।

আমাদের বিক্রি করলে হাজার হাজার পাউণ্ড পাওয়া যাবে। সেই লোভে এরাও আমাদের বিক্রি করতে নিয়ে যাবে। সব জলদস্যুদের চরিত্রই এক। হ্যারি বলল।

—এটা ঠিক বলেছো। তবু আশা হয়তো নতুন জলদস্যুরা আমাদের মুক্তি দিতে পারে। ফ্রান্সিস বলল।

—সম্ভাবনা কম। হ্যারি বলল।

ডেক-এ তখন লড়াই প্রায় থেমে এসেছে। ক্যাপ্টেন তেমেলোর জলদস্যুরা জয়ের মুখে। তরোয়াল ঠোকাঠুকির শব্দ কমে এসেছে। চিৎকারও প্রায় থেমে এসেছে। এখন শুধু আর্তনাদ গোঙানি ও শ্বাস ফেলার শব্দ।

ক্যাপ্টেন তেমেলো জিতে গেল। আক্রমণকারী জলদস্যুরা নিজেদের জাহাজে উঠতে লাগল। ওদের ক্যাপ্টেন অসহায়ভাবে মাস্তুলে হাত রেখে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল।

ওদের জাহাজ আস্তে আস্তে সরে যেতে লাগল। অল্পক্ষণের মধ্যেই অনেকটা সরে গেল। তারপর আরো দূরে সরে যেতে লাগলো।

ক্যাপ্টেন তেমেলোর জলদস্যুরা তরোয়াল উঁচিয়ে হাত তুলে হৈ হৈ করতে লাগল লড়াই জেতার আনন্দে।

আক্রমণকারী জাহাজ অনেক দূরে চলে গেল। ক্যাপ্টেন তেমেলোর জলদস্যুরা আক্রমণকারী মৃত ও আহত জলদস্যুদের দুহাত দুপা ধরে ধরে সমুদ্রে ছুঁড়ে ফেলতে লাগল। সিঁড়িঘরের সামনে দাঁড়িয়ে ক্যাপ্টেন তেমেলো মৃদু মৃদু হাসতে লাগল।

ওদিকে ফ্রান্সিসদের কয়েদঘরের সামনে এসেই প্রহরীটি চিৎকার করে বলতে লাগল—তোমরা তো ভেবেছিলে আমরা লড়াইয়ে হেরে যাবো। দেখ—আমরা জিতেছি। লড়াইয়ে আমাদের হারানো অত সোজা নয়।

শাঙ্কো গলা বাড়িয়ে বলল—অত চেঁচিও না। আমাদের তরোয়াল দাও। আমরাই তোমাদের হারিয়ে দেব। প্রহরীটি কেমন থতমত খেয়ে গেল। বলল—তোমরা ভাইকিং। ভালো লড়িয়ে। কিন্তু আমাদের সঙ্গে পারবে না।

—সেই পরীক্ষাটা তো আর হবার উপায় নেই। তোমরা তো আর আমাদের তরোয়াল দেবে না। শাঙ্কো বলল।

—ঠিক আছে। তোমার কথাটা ক্যাপ্টেন তেমেলোকে আমি বলব। প্রহরী বলল।

—হ্যাঁ বলো। দেখ ক্যাপ্টেন তেমেলো কী বলে। শাঙ্কো বলল।

ক্যাপ্টেন তেমেলো আর ফ্রান্সিসদের জাহাজ চলেছে।

ফ্রান্সিসদের একঘেয়ে জীবন কাটতে লাগল। ওরা জানে না কোন্ বন্দরে জাহাজ দুটো ভিড়বে।

একসময় ফ্রান্সিস ডাকল—হ্যারি।

—কিছু বলবে? হ্যারি বলল।

—একটা সমস্যার কথা বলছি। যে বন্দরে তেমেলো জাহাজ ভেড়াবে সেখানে আমাদের জাহাজটা ও যদি বিক্রি করে না দেয়? হ্যারি একটুক্ষণ ভাবল। বলল—কথাটা ভাববার। তেমেলো এটা করতে পারে।

—তার আগে একটা ব্যবস্থা করতে হবে। কিন্তু কীভাবে তেমেলোকে নিবৃত্ত করবো বুঝে উঠতে পারছি না। ফ্রান্সিস বলল।

—উপায় একটা বের করতেই হবে—হ্যারি বলল—আচ্ছা ফ্রান্সিস—আমরা হিচকক দ্বীপের রাজার কাছ থেকে সোনার চাকতি নিয়েছিলাম। সেই সোনার চাকতিগুলো কোথায় আছে? হ্যারি জানতে চাইল।

—কিছু শাঙ্কোর কোমরবন্ধনীতে আর বাকি সবটাই আমার কেবিনঘরের কাঠের ফাঁকে। ফ্রান্সিস বলল।

—রাজকুমারী জানেন? হ্যারি জিজ্ঞেস করল।

—হ্যাঁ। ওই রেখেছে। ফ্রান্সিস বলল।

—যদি তেমেলো আমাদের জাহাজটা বিক্রি করতে চায় তাহলে আমরাই কিছু সোনার চাকতি দিয়ে জাহাজটা কিনে নেবো। হ্যারি বলল।

ফ্রান্সিস একটু ভেবে বলল—ঠিক বলেছো। ক্যাপ্টেন তেমেলো অর্থপিশাচ। ও সোনার চাকতি পেলে সহজেই রাজি হয়ে যাবে।

—এছাড়া তো অন্য কোন উপায় দেখছি না। আমাদের জাহাজটা হাতছাড়া করা চলবে না। হ্যারি বলল।

প্রায় একমাস পরে তেমেলো আর ফ্রান্সিসদের জাহাজ একদিন সকালে একটা বন্দরে ভিড়ল।

ফ্রান্সিসরা বুঝল যে জাহাজ কোনো বন্দরে ভিড়ল। জাহাজ চলাচলের খুঁটিনাটি ফ্রান্সিসরা সহজেই বুঝতে পারে।

শাঙ্কো একজন প্রহরীর কাছে গেল। বলল—

—জাহাজদুটো কোন্ বন্দরে ভিড়েছে?

—এই বন্দরের নাম তো শোননি।

—না শুনিনি।

—আমারগো বন্দর। ক্রীতদাস বেচাকেনার বাজার হিসেবে আমারগো বিখ্যাত। প্রহরীটি বলল।

—বিখ্যাত নয়, কুখ্যাত। হ্যারি বলল।

—সে তোমরা যা বল। প্রহরীটি বলল।

—তাহলে এখানেই আমাদের বিক্রি করা হবে। ফ্রান্সিস বলল।

—হ্যাঁ। ক্যাপ্টেন তাই এই বন্দরে জাহাজ ভিড়িয়েছে।

—বাঃ সুন্দর পরিকল্পনা। হ্যারি ঠাট্টা করে বলল।

—আমাদের ক্যাপ্টেন খুব বুদ্ধিমান। খুব ভেবেচিন্তে কাজ করে। প্রহরীটি বলল।

—মহাপুরুষ। হ্যারি আবার ঠাট্টা করল।

—ঠাট্টা করছো? প্রহরীটি বলল।

—তুমি ঠাট্টা বোঝো? হ্যারি একটু হেসে বলল।

—ঠাট্টা বুঝি বৈ কি। তুমি ক্যাপ্টেনকে ঠাট্টা করে মহাপুরুষ বলেছো এটা যদি আমি ক্যাপ্টেনকে বলি ক্যাপ্টেন তোমার মুণ্ডু নেবে। প্রহরীটি বলল।

—না ভাই। এত তাড়াতাড়ি আমি মুণ্ডু দিতে রাজি নই। তোমাদের মনমেজাজ তো বুঝি না। কাজেই কথাটা আমি ফিরিয়ে নিলাম। বলতে হলে বলো যে আমরা ক্যাপ্টেনের প্রশংসাই করি। বীর বুদ্ধিমান তরোয়াল চালনায় দক্ষ—এসব। হ্যারি বলল।

—ঠিক আছে। তোমরা প্রশংসা করেছো এটাই বলবো। প্রহরীটি বলল।

—হ্যাঁ। সেটাই বলো। তাহলে দুবেলা মাংস খেতে পাবো। হ্যারি বলল।

সেদিন হাটবার নয়। কাজেই ফ্রান্সিসদের কয়েদঘর থেকে বের করা হল না।

রাতে পরিবেশক দু'জন খাবার নিয়ে এলো। শাঙ্কো জিজ্ঞেস করল—আমাদের ক্রীতদাস বিক্রির হাটে নিয়ে যাওয়া হল না কেন?

—কাল রোববার—হাটবার? কালকে নিয়ে যাওয়া হবে। প্রহরীটি বলল। তারপর পরিবেশকটি বলল—আজকে অঢেল মাংসের ঝোল। তোমরা পেট পুরে মাংস খাও।

—খুব ভালো কথা। শাঙ্কো বলল। ফ্রান্সিসরা খেতে লাগল। খিদেও পেয়েছিল। তার ওপর চাইতেই মাংসের ঝোল পাওয়া যাচ্ছে। সবাই পেটপুরেই খেল।

ফ্রান্সিসরা তখন শুয়ে পড়েছে। কোলা ফ্রান্সিসের কাছে এল। বলল—তাহলে আমাদের বিক্রি করতে কালকে নিয়ে যাছে।

—হ্যাঁ। প্রহরী তাই বলল। ফ্রান্সিস বলল।

—আর পালানো হল না। কোলা বলল।

—তাই তো দেখছি। ফ্রান্সিস বলল।

—আমাদের যাতে একজন খরিদ্দার কেনে তার ব্যবস্থা করতে হবে। এটা ক্যাপ্টেন তেমেলোকে বলবে। কোলা বলল।

—তা কি হবে? হয়তো ভাগ ভাগ করে আমাদের বিক্রি করল। ফ্রান্সিস বলল।

—তবু চেষ্টা করতে হবে যাতে আমরা একসঙ্গে থাকি। কোলা বলল।

—দেখি বলে। ফ্রান্সিস বলল।

—এখন পালাতে পারলাম না। পরে মালিকের হাত থেকে পালাবার চেষ্টা করতে হবে। কোলা বলল।

—মালিক আমাদের নিয়ে কী করে সেটা আগে দেখি। তারপর সময় সুযোগমতো পালানো। ফ্রান্সিস বলল।

—তা কি পারবো? কোলা সংশয় প্রকাশ করল।

—অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করবো। ফ্রান্সিস বলল।

—আমরা যাতে একই মালিকের হাতে যাই তার ব্যবস্থাটা আগে করতে হবে। কোলা বলল।

—দেখি কীভাবে সেটা করা যায়। ফ্রান্সিস বলল।

কোলা আর কিছু বলল না। ঘুমুতে চলে গেল।

পরের দিন সকালের খাওয়ার পরেই তেমেলো কয়েদঘরের সামনে এল। হেসে বলল—তোমাদের ক্রীতদাস কেনাবেচার হাটে নিয়ে যাওয়া হবে। সাবধান কেউ পালাবার চেষ্টা করবে না। পালাতে গেলে মরতে হবে। ফ্রান্সিসরা কোন কথা বলল না।

—হাত বেঁধে নিয়ে চল্। প্রহরীদের দিকে তাকিয়ে ক্যাপ্টেন তেমেলো বলল।

দু'জন প্রহরী কয়েদঘরে ঢুকল। সকলের হাত বেঁধে দিল। কোলা ফ্রান্সিসের কাছে এল। মৃদুস্বরে বলল—শুনেছি মালিকরা ক্রীতদাসদের পায়ে লোহার বেড়ি পরিয়ে নিয়ে যায়।

—লোহার বেড়ি? ফ্রান্সিস চমকে উঠল।

—হ্যাঁ। এখানেই কামারশালা আছে। কামারদের কাজই হল ক্রীতদাসদের পায়ে লোহার বেড়ি পরানো। কোলা বলল।

ফ্রান্সিস চিন্তায় পড়ল। পায়ে লোহার বেড়ি পরালে তো পালাবার কোন আশাই নেই। সারা জীবনই ক্রীতদাস হয়ে থাকতে হবে।

কোলা বলল—তোমরা পাঁচজন আমরা তিনজন। মোট আটজন যাতে একই মালিকের হাতে পড়ি তার চেষ্টা করতে হবে।

—সব দেখিটেখি। তারপর। ফ্রান্সিস বলল।

ক্যাপ্টেন তেমেলো চলে গেল।

প্রহরীরা খোলা তরোয়াল হাতে ফ্রান্সিসদের পাহারা দিয়ে নিয়ে চলল। ফ্রান্সিস পিছু ফিরে দেখল তেমেলোর জাহাজের মাথায় মড়ার হাড় ও মড়ার মাথা আঁকা পতাকা নামানো। সেখানে সাদা পতাকা উড়ছে। ফ্রান্সিস তখন মারিয়ার কথা ভাবছিল। যে করেই হোক মারিয়াকে সঙ্গে রাখতে হবে। যে খরিদ্দার ওদের কিনবে তাকে বলে ব্যবস্থা করতে হবে।

ফ্রান্সিসরা সারি বেঁধে জাহাজ থেকে পাতা পাটাতনের ওপর দিয়ে নামল। জাহাজঘাটায় বেশ কয়েকটি জাহাজ নোঙর করা। তার মধ্যে একটা ছোট সুদৃশ্য জাহাজও আছে।

রোদ চড়া। ভ্যাপসা গরম। ফ্রান্সিসরা ঘামতে লাগল।

বন্দরের কাছেই একটা মাঠমত। তার মাঝখানে একটা পাথরের বেদীমতো। যাদের বিক্রি করা হবে তাদের সেই বেদীতে তোলা হচ্ছিল। তিন-চারজন

কালো পোশাক পরা লোক এই কাজ করছিল। তারা দুজন কৃষ্ণকায় যুবককে বেদীতে তুলল। বেদী ঘিরে বহু লোকের ভিড়। খরিদ্দাররা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সেই যুবকদের দেখছিল। নিলামের মতো দর হাঁকা শুরু হল। কালো পোশাকপরা লোকেরা যুবকদের ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখছিল।

দুজন যুবক বিক্রি হয়ে গেল। যে কিনল সে তাদের নিয়ে চলে গেল।

এবার ফ্রান্সিসদের বেদীতে ওঠার পালা। কালো পোশাকপরা লোকেরা এগিয়ে এল। ফ্রান্সিস বলল—আমাদের একসঙ্গে বেদীতে তোল। যাতে একজন খরিদ্দার আমাদের কেনে।

—বেশ। তোমাদের একসঙ্গেই তুলছি। তবে একজন খরিদ্দারই কিনবে এটা নাও হতে পারে। একজন কালো পোশাক পরা লোক বলল।

—ঠিক আছে। তুমি তোল তো। ফ্রান্সিস বলল।

ফ্রান্সিসদের বেদীর ওপর তোলা হল। ফ্রান্সিস একবার চারদিকে তাকাল। অনেক লোকের ভিড়। সবাই ক্রেতা নয়। কিন্তু ভিড় জমিয়েছে। দুঃখে ফ্রান্সিসের বুক ভেঙে যেতে লাগল। ও মন শান্ত করল। আমরা বিক্রি হতে চলেছি। কিছুক্ষণের মধ্যেই ক্রীতদাস হতে চলেছি। ওপরের দিকে তাকাল। সূর্যকরোজ্জ্বল আকাশ। সামুদ্রিক পাখি উড়ছে। তীক্ষ্নসুরে ডাকছে। সবাই মুক্ত। সে সারাজীবনের জন্যে বন্দী হতে যাচ্ছে।

ফ্রান্সিস দেখল ক্যাপ্টেন তেমেলো একপাশে দাঁড়িয়ে হাসছে। অনেক পাউণ্ড পাওয়া যাবে।

এবার কালো পোশাক পরা লোকটি ফ্রান্সিসদের দেখিয়ে গলা চড়িয়ে বলল—এরা চাইছে এদের কেউ একসঙ্গে কিনুন। বোধহয় সবাই বন্ধু।

দাম হাঁকা শুরু হল। ভিড়ে চারদিক থেকে ক্রেতারা দর হাঁকতে লাগল। সবচেয়ে বেশি দাম যে দিল তার দিকে ফ্রান্সিস তাকাল। মধ্যবয়স্ক এক ভদ্রলোক। মাথার চুল গোঁফ সোনালি রঙের। পরনের পোশাক বেশ দামী।

ভদ্রলোক বেদীর দিকে এগিয়ে এলেন। কালো পোশাকপরা লোকটি এগিয়ে ফ্রান্সিসদের দেখিয়ে বলল—এই আটজন আপনার ক্রীতদাস। ভদ্রলোকের সঙ্গে চার পাঁচজন সশস্ত্র দেহরক্ষী। দেহরক্ষীরা ফ্রান্সিসদের ঘিরে দাঁড়াল।

তখনই রাজকুমারী মারিয়কে বেদীতে তোলা হল। ভিড়ের মধ্যে গুঞ্জন শুরু হল। এরকম সুন্দরী মেয়ে ক্রীতদাসী হবে?

ফ্রান্সিস সঙ্গে সঙ্গে সেই ক্রেতা ভদ্রলোকের দুহাত জড়িয়ে ধরল। বলল—আমরা তো আপনার ক্রীতদাস হলাম। যে ভদ্রমহিলাকে বিক্রির জন্য তোলা হল তিনি আমাদের দেশের রাজকুমারী। আমার স্ত্রী। আমার একান্ত অনুরোধ এই রাজকুমারীকে আপনি কিনুন। তাহলে উনি আমাদের কাছাকাছি থাকতে পারবেন। বলতে বলতে ফ্রান্সিসদের চোখে জল এল। ভদ্রলোক ফ্রান্সিসদের মানসিক আবেগ বুঝতে পারলেন। একটু চুপ করে থেকে বললেন—অনেক দাম উঠছে যে।

—আপনি পারবেন কিনতে। দোহাই আমার এই বিনীত অনুরোধটা রাখুন।

—দেখছি। ততক্ষণে মারিয়ার জন্য বেশ দাম উঠেছে। ভদ্রলোক বেশি দাম হাঁকলেন। দামাদামি চলল কিছুক্ষণ। সবশেষে ঐ ভদ্রলোকই বেশি দাম হেঁকে মারিয়াকে কিনলেন।

আনন্দে ফ্রান্সিস প্রায় কেঁদে ফেলল। হ্যারি ফ্রান্সিসের কাঁধে হাত রাখল। চোখ মুছে বলল—ঈশ্বর করুণাময়। আমার পরিকল্পনা সার্থক হল।

কালো পোশাকপরা লোকেরা আরো লোক বেদীতে তুলতে লাগল। একজন কালো পোশাকপরা লোক মারিয়াকে ভদ্রলোকের কাছে নিয়ে এল। মারিয়া ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। ফ্রান্সিসের মন দমে গেল। হ্যারি ফ্রান্সিসদের কাঁধ চাপ দিয়ে বলল—আবেগপ্রাপ্ত হয়ো না। তাহলে রাজকুমারী আরো দুর্বল হয়ে পড়বেন। শান্ত হও। ফ্রান্সিস তখন আবেগে কাঁপছে। ক্রেতা ভদ্রলোক এটা লক্ষ্য করলেন। মৃদুস্বরে বললেন—তোমার স্ত্রীর যাতে বেশী কষ্ট না হয়, সেদিকটা আমি দেখবো। ভদ্রলোকের দুহাত ঝাঁকুনি দিয়ে ফ্রান্সিস ছেড়ে দিল। ভদ্রলোক বললেন—তোমার নাম কী?

—ফ্রান্সিস।

—আমার নাম পার্তাদো। আমার অনেক জমি-জিরেত আছে। সেখানে কাজ করার জন্যেই তোমাদের নিয়ে যাচ্ছি।

—তাহলে আপনি বড় জমিদার।

—হ্যাঁ, তোমরা চাষের কাজ জানো?

—না।

—তাহলে শিখে নেবে। তোমাদের কিন্তু বন্দী হয়ে থাকতে হবে। আমি কাজ চাই। সেটা ভালোভাবে পেলেই আমি সন্তুষ্ট। এবার চলো। পালাবার চেষ্টা করো না। আমার দেহরক্ষীরা রয়েছে। পালাতে গেলে মরবে। চলো। তোমাদের পায়ে লোহার বেড়ি পরাতে হবে। ভদ্রলোক বললেন।

—বেড়ি না পরালে চলে না? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—না। বেড়ি পড়াতেই হবে।

পার্তাদো হাঁটতে লাগল। ফ্রান্সিসরা পিছু পিছু চলল। সঙ্গে দেহরক্ষীরাও চলল।

কিছুদূর যাওয়ার পর বাঁ পাশে একটা কামারশালা দেখা গেল। ফ্রান্সিসদের কামারশালায় ঢোকানো হল। ফ্রান্সিসরা দেখল আগে যেসব যুবকদের ক্রেতারা কিনেছে তাদেরও সেখানে আনা হয়েছে। তাদের পায়ে লোহার বেড়ি পরানো হচ্ছে। ফ্রান্সিস বুঝল পায়ে বেড়ি পরানো হবেই।

আগের যুবকদের বেড়ি পরানো শেষ হল। এবার ফ্রান্সিসদের পালা।

কামাররা কয়েকজন ফ্রান্সিসদের পায়ে লোহার বেড়ি পরাতে লাগল। গায়ে তপ্ত লোহার আঁচ লাগছে। কিন্তু ফ্রান্সিসদের তা সহ্য করতে হল। উপায় নেই।

তবে সান্ত্বনা এটুকু পেল যে কথাবার্তায় বুঝল পার্তাদো মানুষটা খারাপ নয়। হয়তো ওদের ওপর অত্যাচারটা কমই হবে। কিন্তু তবু ক্রীতদাসের জীবন। ফ্রান্সিস খুশি হল দেখে যে মারিয়াকে বেড়ি পরানো হল না।

এবার বেড়িপরা অবস্থায় হাঁটতে গিয়ে লোহার ভারে ভালো করে হাঁটতেই পারছিল না কেউ।

জাহাজঘাটায় এল সবাই। ফ্রান্সিস দেখল জলদস্যুদের জাহাজটা নেই। বুঝল ক্যাপ্টেন জেমেলো প্রচুর অর্থ নিয়ে বেপাত্তা হয়ে গেছে।

একপাশে নোঙর করা ছিল যে সুদৃশ্য ছোট জাহাজটা, সেটার কাছে এল সবাই। বেশ কষ্ট করে হেঁটে জাহাজটায় উঠল সবাই।

পার্তাদো বলল—শোন—কেবিনঘরে জায়গা নেই। আমাদের সবাইকে ডেক-এ থাকতে হবে। শুধু ঝড়বৃষ্টির সময় তোমাদের নীচে নামানো হবে।

ফ্রান্সিস পার্তাদোর দিকে এগিয়ে গেল। বলল—

—একটা কথা ছিল।

—বলো। পার্তাদো বলল।

—এখানে আমাদের জাহাজ নোঙর করা আছে। জলদস্যুরা খুব ভাগ্যি যে আমাদের জাহাজটা নিয়ে পালিয়ে যায়নি। আমার অনুরোধ আমাদের জাহাজটা আপনি আপনার জাহাজের সঙ্গে বেঁধে নিয়ে চলুন।

—আমার ছোট জাহাজ। তোমাদের জাহাজকে টেনে নিয়ে যেতে পারবে? পার্তাদো বললেন।

—তাহলে আমি কথা বলি। ফ্রান্সিস বলল।

—বলো। পার্তাদো বললেন।

—আমাদের চারজনকে আমাদের জাহাজ চালাতে দিন। জাহাজটা আপনার জাহাজের পেছনে পেছনেই চালাবো। ফ্রান্সিস বলল।

—না। তোমাদের হাতের বাঁধন খোলা হবে না। পার্তাদো বললেন।

—হাত বাঁধা অবস্থাতেই আমরা জাহাজ চালাবো। ফ্রান্সিস বলল।

—জলে ঝাঁপ দিয়ে পালিয়ে যেতে পারো। পার্তাদো বললেন।

—আমাদের পায়ের বেড়ি যে কী ভারী আপনার তা ধারণাই নেই। এই লোহার বেড়ি পায়ে সাঁতরানো অসম্ভব। জলে নামলেই আমরা জলে তলিয়ে যাবো। হাঙরের মুখে পড়বো আমরা। কেউ বাঁচবো না। জীবনের ভয় তো আমাদের আছে। ফ্রান্সিস বলল।

পার্তাদো কিছুক্ষণ ভাবলেন। তারপর বললেন—ঠিক আছে। কিন্তু সবাই তোমাদের জাহাজে থাকবে না। মাত্র একজন—যে তোমাদের জাহাজ চালাবে।

—বেশ। তাই হবে। ফ্রান্সিস বলল।

—একটা কথা। পার্তাদো বলল।

—বলুন। ফ্রান্সিস বলল।

—এই জাহাজে তোমরা ডেক-এ থাকবে। ঝড়-বৃষ্টির সময় শুধু নীচে নামবে। ঝড়বৃষ্টি থেমে গেলে আবার ডেক-এ চলে আসবে। পার্তাদো বলল।

—ঠিক আছে। আমরা রাজি। হ্যারি বলল।

—আমাদের খুব খিদে পেয়েছে। খেতে দিন। শাঙ্কো বলল।

—পাঁচসাতজন যুবককেই আমি কিনবো ভেবেছিলাম। তাই তাদের খাওয়ার ব্যবস্থা জাহাজে আগেই করে রেখেছি। একটু পরেই খাবার দেওয়া হচ্ছে। পার্তাদো বললেন।

পার্তাদো সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে গেলেন।

ফ্রান্সিসরা ডেক-এ বসে পড়ল। পা নাড়াতে কষ্ট হচ্ছে। লোহার বেড়ি পায়ে পায়ে লেগে শব্দ তুলছে।

ফ্রান্সিস শুয়ে পড়ল। চোখ বুজল। হ্যারি ডাকল—ফ্রান্সিস। ফ্রান্সিস চোখ বন্ধ রেখেই মুখে শব্দ করল—হুঁ।

—রাজকুমারী কোথায় থাকবেন? হ্যারি জিজ্ঞেস করল।

—মারিয়াকেও আমাদের জাহাজে রাখবো। ফ্রান্সিস বলল।

—সেটা তো বললে না। হ্যারি বলল।

—একসঙ্গে সব চাওয়া না। মনে তো হচ্ছে পার্তাদো ভদ্রলোক। আপত্তি করবে না। ফ্রান্সিস বলল।

মারিয়া তখনই ফ্রান্সিসের কাছে এসে বসল। বলল—শেষ পর্যন্ত ক্রীতদাস হতে হল।

—উপায় কি। অবস্থার বিপাকে সবই মেনে নিতে হয়। তবে সময় সুযোগ বুঝে ঠিক পালাবো। ফ্রান্সিস বলল।

—ক্রীতদাসের জীবন। শরীরের শক্তি অর্ধেক হয়ে যাবে। তখন পারবে পালাতে? মারিয়া বলল।

—অবশ্যই পারবো। মনের জোরটাই বড় কথা। মনে জোর থাকলে অথর্ব অবস্থায়ও পালানো যায়। ফ্রান্সিস বলল।

—দেখা যাক। কিন্তু আমিও কি এই ডেক-এই থাকবো? মারিয়া বলল।

—না। তোমাকে আমাদের জাহাজে রাখার জন্যে অনুরোধ করবো। পার্তাদো নিশ্চয়ই রাজি হবে। ফ্রান্সিস বলল।

—দেখ বলে। মারিয়া মাথা নেড়ে বলল।

এবার ফ্রান্সিস শাঙ্কোর দিকে তাকাল। বলল—অনেক করে বলে পার্তাদোকে রাজি করিয়েছি। ফ্রেজার নেই। তুমি জাহাজ চালিয়ে নিয়ে যেতে পারবে?

—নিশ্চয়ই পারবো। তুমি ঠিক জানো না ফ্রেজার কি আর সবসময় হুইলে থাকতো? ওর জায়গায় আমিও অনেকদিন জাহাজ চালিয়েছি। কাজেই আমি ঠিক জাহাজ চালিয়ে যেতে পারবো। শাঙ্কো বলল।

—দু'হাত কিন্তু বাঁধা থাকবে। ফ্রান্সিস বলল।

—তা নিয়েও পারবো। আমার জামার নীচে ছোরা আছে। হাতের বাঁধন কেটে ফেলবো। শাঙ্কো বলল।

—পারবে না। পার্তাদোর দেহরক্ষীরা জাহাজে থাকবে।

—হ্যাঁ। এটা ভুলে গিয়েছিলাম। ঠিক আছে হাত বাঁধা অবস্থাতেই জাহাজ চালাবো। শাঙ্কো গলায় জোর দিয়ে বলল।

ওরা কথাবার্তা বলছে তখনই সকলের জন্যে খাবার নিয়ে রাঁধুনি এল। চিনেমাটির বাসনে ওদের খেতে দেওয়া হল। সবাই ক্ষুধার্ত। প্রথমে সুপ দেওয়া হল। চেটে খেয়ে ফেলল সবাই। তারপর সবজি তরকারি। কী সুস্বাদু! সবাই সাগ্রহে খেতে লাগল। তারপর দেওয়া হল মাংস-রুটি। এত সুস্বাদু খাবার কতদিন খায়নি। সবাই চেটেপুটে খেতে লাগল। বারবার মাংসের ঝোল চাইতে লাগল। রাঁধুনিও দিতে লাগল। তারপর রাঁধুনি হেসে বলল—আর নেই। শুধু আমাদের মালিক আর রক্ষীদের আর জাহাজ চালকের খাবার রয়েছে।

—কিন্তু তুমি? হ্যারি জানতে চাইল।

—আমি অল্প খাবো। তোমরা এরকম রাক্ষসের মতো খাবে তাতো জানতাম না। রাঁধুনি হেসে বলল।

—তুমি বুঝবে না ভাই। কতদিন পরে যে এরকম সুস্বাদু খাবার খেলাম তা মনেও করতে পারছি না। হ্যারি হেসে বলল।

—জাহাজ কখন ছাড়া হবে? শাঙ্কো জানতে চাইল।

—মালিক জানে। রাঁধুনি বলল।

তখনই পার্তাদো ডেক-এ উঠে এলেন। ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়াল। পার্তাদোর কাছে গেল। বিনীতভাবে বলল—আপনি আমাদের সব অনুরোধই রেখেছেন। এটাই আমার শেষ অনুরোধ। মারিয়াকে দেখিয়ে বলল—আমার স্ত্রীকে আমাদের জাহাজে তার কেবিনঘরে থাকতে দিন। এই ডেক-এর ওপর তার পক্ষে থাকা সম্ভব নয়। পার্তাদো মারিয়ার দিকে তাকাল। ভাবতে লাগল। মারিয়া মৃদুস্বরে বলল বলল—আপনি দয়া করে এই অনুরোধ রাখুন।

—বেশ। তাই হবে। তবে পালাবার চেষ্টা করবে না। পার্তাদো বলল।

—আপনার দেহরক্ষীরা তো থাকবে। মারিয়া বলল।

—ওরা তো রাত জেগে তোমাকে পাহারা দিতে পারবে না। পার্তাদো বললেন।

—আমি আমার স্বামী-বন্ধুদের ফেলে একা পালাতে যাবো কেন? মারিয়া বলল।

—ঠিক আছে। তুমি ঐ জাহাজেই থাকবে। পার্তাদো বলল। ফ্রান্সিস বলে উঠল—কী বলে যে আপনাকে ধন্যবাদ জানাবো বুঝতে পারছি না।

—ধন্যবাদের কিছু নেই। অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করতে হয়। পার্তাদো বলল।

—আপনি জাহাজ কবে ছাড়ছেন? ফ্রান্সিস প্রশ্ন করল।

—আমার সব কাজ মিটে গেছে। কাল সকালেই জাহাজ ছাড়বো। পার্তাদো বললেন।

পার্তাদো জাহাজ চালকের সঙ্গে কথা বলে চলে গেলেন।

ফ্রান্সিস ডেক-এ বসে রইল।

বিকেল হল। সূর্য তখন অস্ত যায় যায়। মারিয়া গিয়ে কাঠের রেলিং ধরে দাঁড়াল। মনে যত দুঃখ থাক মারিয়া সূর্যাস্ত দেখবেই।

সূর্য অস্ত গেল। গভীর কমলা রঙ তখনও পশ্চিমের আকাশ জুড়ে। মারিয়া সেইদিকে তাকিয়ে রইল।

রাতের খাবারে মাংস দেওয়া হল না। ফ্রান্সিসরা অবশ্য সেটা আশাও করেনি। সামুদ্রিক মাছের ঝোলই খেতে হল। খাওয়ার সময় একজন রক্ষী এসে ফ্রান্সিসদের হাতের বাঁধন খুলে দিল। খাওয়া হলে আবার হাত বেঁধে দিয়ে গেল। দুপুরেও খাওয়া-দাওয়ার সময় এভাবেই ওদের হাতের বাঁধন খুলে দিয়ে পরে বেঁধে দেওয়া হয়েছিল।

সেই রাতে মারিয়াকে আর তাদের জাহাজে পাঠানো হল না। মারিয়া ফ্রান্সিসদের সঙ্গে ডেক-এই ঘুমোলো। পরের দিন সকালে পার্তাদো জাহাজের ডেক-এ উঠে এল। ফ্রান্সিসদের দিকে তাকিয়ে বলল—

—তোমাদের জাহাজ যে চালাবে সে উঠে এসো। শাঙ্কো উঠে দাঁড়াল। পার্তাদোর কাছে গেল। পার্তাদো বলল—তোমাদের জাহাজে যাও। তোমাদের রাজকুমারীকে নিয়ে যাও। দুজন দেহরক্ষীও যাবে। হাত খোলা হবে শুধু খাওয়ার সময়। অন্য সময় বাঁধা থাকবে।

—বেশ। শাঙ্কো মাথা ঝুঁকিয়ে বলল—হাত বাঁধা নিয়ে আমি জাহাজ চালাবো।

মারিয়াকে নিয়ে শাঙ্কো পার্তাদোর জাহাজ থেকে নেমে গেল। পেছনে দু'জন সশস্ত্র দেহরক্ষী।

নিজেদের জাহাজের কাছে গিয়ে দেখল পাটাতন পাতা নেই। শাঙ্কো সমুদ্রের জলে নামল। সাঁতরে নিজেদের জাহাজের কাছে গেল। দড়ির মই বেয়ে জাহাজের ডেক-এ উঠল। কাঠের পাটাতন এনে পেতে দিল। মারিয়া আর দেহরক্ষীরা জাহাজে উঠে এল।

ভেজা জামাকাপড় নিয়েই শাঙ্কো পাল খুলে দিল। দড়িদড়া বাঁধন। মারিয়া নিজের কেবিনঘরে চলে গেল।

একটু বেলা হতেই পার্তাদোর জাহাজ ছাড়ল। সেই জাহাজের পেছনে পেছনে শাঙ্কোও ওদের জাহাজ চালাল। দুহাত বাঁধা হুইল ঘোরাতে বেশ অসুবিধে হচ্ছে। কিন্তু শাঙ্কোর দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ভালোভাবে জাহাজ চালাবেই। পায়ের বেড়িও কোন বাধা বলে মানবে না।

শান্ত সমুদ্র। বাতাসেরও তেমন বেগ নেই। দুটো জাহাজই দ্রুত চলল।

পার্তাদোর জাহাজের ডেক-এই ফ্রান্সিসদের রাতদিন কাটতে লাগল।

পার্তাদোর জাহাজ একটা ছোট বন্দরে থামলো। পাটাতন ফেলা হল। পার্তাদোর রাঁধুনি নেমে গেল। ওদিকে শাঙ্কোও ওদের জাহাজ থামাল।

তখন বিকেল। মারিয়া জাহাজ থেকে নেমে ফ্রান্সিসদের জাহাজে এল। শাঙ্কোও এল। ফ্রান্সিস আর হ্যারির সঙ্গে কথাবার্তা বলল।

পার্তাদোর রাঁধুনি একগাদা ফুলফলের চারা নিয়ে এল। হয়তো পার্তাদোর বাড়িতে বাগানটাগান আছে। গাছগুলো লাগানো হবে।

সূর্য অস্ত গেল। মারিয়া সূর্যাস্ত দেখে নিজেদের জাহাজে চলে গেল। শাঙ্কোও ফিরে গেল।

আবার জাহাজদুটো চলল। সমুদ্র কিছুটা অশান্ত হলেও জাহাজ চালাতে অসুবিধে হচ্ছিল না।

হ্যারি ফ্রান্সিসকে বলল—

—একটা ব্যাপারে আমারা খুব ভাগ্যবান। ক্যাপ্টেন তেমেলো আমাদের জাহাজটা বিক্রি করে দিয়ে পালায়নি।

—যা বলেছো। ফ্রান্সিস হেসে বলল।

—কিন্তু পার্তাদোর জমিদারিতে ক্রীতদাসের কাজ করতে করতে কি আমরা পালাতে পারবো? পায়ের এই বেড়ি নিয়ে?

—এখন কিছু বলতে পারছি না। আমাদের থাকার ব্যবস্থা, কাজের ব্যবস্থা সব দেখি তখন ভাববো।

হ্যারি একটু থেমে বলল—ফ্রান্সিস—আমার কি ভয় জানো? হয়তো দেশে আর ফেরা হবে না।

—হবে। মন দুর্বল করো না। আমরা মুক্তিও পাবো দেশেও ফিরবো। ফ্রান্সিস গলায় জোর দিয়ে বলল।

—তুমি আশাবাদী। আমি অতটা আশাবাদী হতে পারছি না। হ্যারি আস্তে আস্তে বলল।

—আগে থেকেই হতাশ হয়ে পড়ছো কেন? দেখই না কি হয়। ফ্রান্সিস বলল।

—অগত্যা দেখা যাক। হ্যারি মাথা ঝাঁকিয়ে বলল।

সেদিন দুপুরে আকাশ অন্ধকার করে গভীর কালো মেঘ জমল। ফ্রান্সিসরা বুঝল—ঝড় আসছে। আকাশ চিরে বিদ্যুৎ চমকাতে লাগল। সেইসঙ্গে ঘন ঘন বাজ পরার গুরুগম্ভীর শব্দ।

পার্তাদোর রাঁধুনি ডেক-এ উঠে এল। বলল—ঝড়বৃষ্টি আসছে। মালিক তোমাদের নিচে আসতে বলেছেন।

ফ্রান্সিসরা উঠে দাঁড়াল। তারপর একে একে নীচে নামল। দুটো কেবিনঘর।

একটা বড়। একটা ছোট। বড়টা বোধহয় পার্তাদোর জন্যে। অন্যটা রক্ষী আর রাঁধুনির জন্য।

সেই ঘরেই ফ্রান্সিসরা ঢুকল। কিন্তু এত ছোট কেবিনঘর যে ফ্রান্সিসদের প্রায় জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে থাকতে হল। পাশের কেবিনঘর থেকে পার্তাদো বলল—তোমরা কয়েকজন এইঘরে আসতে পারো।

ফ্রান্সিসরা কয়েকজন পার্তাদোর কেবিনঘরে গেল। ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়াল। ফ্রান্সিস চারদিকে তাকিয়ে দেখতে লাগল। বোঝাই যাচ্ছে পার্তাদো খুব বিলাসী মানুষ। ঘরের সবকিছু সাজানো গোছানো। বিছানার চাদর ফুল আঁকা ধবধবে সাদা।

কাঠের দেয়ালে একটা ঝকঝকে আয়না আটকানো। আয়নার চারপাশের কারুকাজ দেখার মতো। তার সামনের তাকে দাড়ি কামাবার ক্ষুর। দাড়ি কামাবার সাবান রাখার একটা রুপোর বাটি। সুন্দর একটা তোয়ালে ঝুলছে। উল্টোদিকের দেয়ালে একটা তৈলচিত্র। স্টিল লাইফ ছবি। একটা আপেল, ভাঙা বেদানা, কলা একটা ফুল, জ্বলন্ত মোমবাতি। মোমবাতির আলো একপাশ থেকে পড়েছে। বড় সুন্দর ছবি। একটা ছোট্ট টেবিল। তার ওপর কয়েকটা বাঁধানো বই। তাহলে পার্তাদোর পড়াশুনোর অভ্যেস আছে। এরকম মানুষ খারাপ হতে পারে না।

পার্তাদো বলল—সবাই দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়াও।

ঝড়ের প্রথম ধাক্কায় জাহাজটা জোরে লাফিয়ে উঠল। ফ্রান্সিসরা প্রায় ছিটকে পড়ল। শুরু হল প্রচণ্ড দুলুনি। ফ্রান্সিসদের অনেক সময়ও জাহাজে কাটে। ঝড় জল বৃষ্টির ধাক্কা ওরা ভালোই সামলাতে পারে।

প্রায় কুড়ি পঁচিশ মিনিট ঝড়-বৃষ্টি চলল। জাহাজে ক্যাঁচকোঁচ শব্দ উঠল।

পার্তাদো চুপ করে দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। আয়না ছবি দেয়ালে শক্ত করে গাঁথা। ওগুলো নড়তে লাগল কিন্তু ছিটকে পড়ল না।

ফ্রান্সিস ভাবছিল একা শাঙ্কো ঝড়ের মোকাবিলা করতে পারছে কি না। দেহরক্ষীরা তো আর নাবিক না। সমুদ্রের ঝড়ে জাহাজ সামলে নিয়ে যাওয়া ওরা জানে না। শাঙ্কোকে একাই সব সামলাতে হয়েছে। মারিয়াও একা। তবে ঝড়বৃষ্টিতে জাহাজে থাকা ওর অভ্যাস হয়ে গেছে।

বৃষ্টি থেমে গেল। ঝোড়ো বাতাসের বেগও কমে গেল। মেঘ কেটে গেল। সূর্য দেখা গেল। বিকেল হল। সূর্য অস্ত গেল। সমুদ্র অনেকটা শান্ত হল। জাহাজ দুটো চলল। ফ্রান্সিসদের জাহাজ কিছুটা পিছিয়ে পড়েছিল। শাঙ্কো একাই বোধহয় পালটাল ঠিক করছিল। জাহাজের গতি বাড়িয়েছিল। অল্পক্ষণের মধ্যেই ফ্রান্সিসদের জাহাজ পার্তাদোর জাহাজের কাছে চলে এল।

পরে দিনকয়েক ধরে সমুদ্র শান্তই রইল। পার্তাদোর নির্দেশে জাহাজের গতি বাড়ানো হল। উন্মুক্ত ডেক-এ ফ্রান্সিদের দিনরাত কাটতে লাগল। একঘেয়ে জীবন। উপায় নেই। মেনে নিতেই হচ্ছে।

তিন-চারদিন পর একদিন সকালে পার্তাদো ডেক-এ উঠে এলেন। ফ্রান্সিসদের কাছে এলেন। বললেন—সামনেই এনকোবার বন্দর। আমরা ওখানেই নামবো।

দূর থেকে এনকোবার বন্দর দেখা গেল। যতদূর দেখা যাচ্ছে তাতে বোঝা গেল—খুব বড় বন্দর নয়।

আস্তে আস্তে দুটো জাহাজ এনকোবার বন্দরের জাহাজঘাটায় এসে থামল। নোঙর ফেলা হল। পাটাতন পাতা হল।

নিজেদের জাহাজ থেকে শাঙ্কো আর মারিয়া নেমে এল। পার্তাদোর ছোট জাহাজে এল। দেখল ফ্রান্সিসরা ডেক-এ শুয়েবসে আছে। ফ্রান্সিসকে দেখে মারিয়া চমকাল। ফ্রান্সিসের চেহারা বেশ খারাপ হয়ে গেছে। ও তাড়াতাড়ি ফ্রান্সিসের কাছে এল। বলল—তোমার শরীর ভালো আছে তো? ফ্রান্সিস হেসে বলল—আমার জন্যে ভেবো না।

—তোমার শরীর বেশ খারাপ হয়ে গেছে। মারিয়া বলল।

—বন্ধুদের দেখ! ওদেরও আমার মতো অবস্থা। দিনরাত ডেক-এ পড়ে থাকা। বেঁচে আছি এটাই যথেষ্ট। ফ্রান্সিস মৃদু হেসে বলল।

—তুমি কক্ষনো মৃত্যুর কথা বলবে না। অভিমানী স্বরে মারিয়া বলল।

—আমরা কি মৃত্যুকে এড়াতে পারবো? ফ্রান্সিস আগের মতোই হেসে বলল।

—সেসব বুঝি না। তুমি এভাবে কখনও বলবে না। মারিয়া মাথা নেড়ে বলল।

পার্তাদো ডেক-এ উঠে এলেন। বললেন—তোমরা এখানে নামো। আমার দেহরক্ষীরা তোমাদের পাহারা দিয়ে আমার বাড়িতে নিয়ে যাবে।

ফ্রান্সিসরা আস্তে আস্তে জাহাজ থেকে নামতে লাগল। পায়ে বেড়ি। শব্দ হচ্ছে। হাঁটতেও কষ্ট হচ্ছে। তবু যেতে হবে। নতুন আস্তানা। কেমন হবে কে জানে। তবে ক্রীতদাসদের আস্তানা। সে কি কখনও ভালো হয়।

নীচে নেমে ফ্রান্সিস পার্তাদোর কাছে গেল। বলল—আপনার জাহাজের জন্য তো পাহারাদার থাকবে।

—নিশ্চয়ই। পাহারাদার থাকবে জাহাজচালক। পার্তাদো বললেন।

—তাহলে একটা অনুরোধ। সে যেন আমাদের জাহাজটাও পাহারা দেয়। আমাদের কেউ তো থাকতে পারবে না। ফ্রান্সিস বলল।

—না। তোমাদের কাউকে ছাড়া হবে না। পার্তাদো বললেন।

—তাহলে আপনার জাহাজচালক যেন আমাদের জাহাজটারও দেখাশুনো করে। ফ্রান্সিস বলল।

—ঠিক আছে। বলে দিচ্ছি। পার্তাদো বললেন। তারপর ইশারায় জাহাজ চালককে ডাকলেন। জাহাজচালক ওর কাছে এল। পার্তাদো বললেন—শোনো।

আমাদের জাহাজটার যেমন দেখাশুনো করবে তেমনি এদের জাহাজটারও দেখাশুনো করো। দেখো দুটো জাহাজই যেন চুরি না হয়ে যায়। তারপর বললেন—

—তোমাদের জাহাজটার জন্যে আর মায়া বাড়াচ্ছো কেন? আর কোনদিন কি জাহাজটায় চড়তে পারবে?

—তবু আমাদের অনেক সুখদুঃখের সঙ্গে জড়িয়ে আছে ঐ জাহাজটা। ওটা চুরি হয়ে যাক এটা চাই না।

—বেশ। তোমরা চাইছো তাই পাহারার ব্যবস্থা করে দিলাম। এবার চলো সব। পার্তাদো হাত নেড়ে বললেন। দেহরক্ষীরা ততক্ষণে ফ্রান্সিসদের ঘিরে দাঁড়িয়েছে। হাতে খোলা তরোয়াল। খুব বড় বন্দর নয় এই এনকোবার বন্দর। ছোট বন্দরই বলা যায়। আরো দুটো জাহাজ নোঙর করে আছে দেখা গেল।

ফ্রান্সিসরা বাঁচল যে রোদের তেমন তেজ নেই। বেশ হাওয়া ছেড়েছে। কষ্ট একটু কমল।

ফ্রান্সিস চারদিকে দেখতে দেখতে যাচ্ছিল। দুপাশে দোকানপাট। লোকজনেরও ভিড় আছে। লোকেরা ফ্রান্সিসদের দেখল। তবে খুব একটা অবাক হল না। ক্রীতদাস দেখায় তারা অভ্যস্ত। তবে কৃষ্ণকায় যুবক-যুবতীদেরই ওরা দেখে থাকে। আজকে দেখল বিদেশি ইউরোপীয় যুবক ও মারিয়াকে। তাই একটু অবাকই হল।

একজন দেহরক্ষী ওদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল। একটা ঘোড়ায় টানা গাড়িতে পার্তাদো ওদের পেছনে পেছনে চলল।

হ্যারি ফ্রান্সিসের কাছে এল। বলল—ফ্রান্সিস, ডানদিকে তাকিয়ে দেখ—একটা কামারশালা। ফ্রান্সিস দেখল।

হ্যারি বলল—তার মানে এখানে বেশ কয়েকন জমিদার আছে। ক্রীতদাসদের বেড়ি পরানোর কাজ এখানে ভালোই চলে।

—হুঁ। ঠিকই বলেছো। ফ্রান্সিস মাথা নেড়ে বলল।

তখনই কোলা ফ্রান্সিসদের পেছনে এসে দাঁড়াল। বলল—ভাই, তাহলে পালানো গেল না।

—তাই তো দেখছি। ফ্রান্সি একটু মাথা ঝাঁকিয়ে বলল।

—আর কি পালানো যাবে? কোলা বলল।

—দেখা যাক। সময় আর সুযোগ বুঝে পালাতে হবে। ফ্রান্সিস বলল।

—পারবে না। কোলা হাত নেড়ে বলল।

—দেখা যাক। ফ্রান্সিস আস্তে বলল।

পথ প্রদর্শক দেহরক্ষীটি একটা বিরাট বাড়ির প্রবেশপথের সামনে এসে দাঁড়াল। বেশ বড় একটা লোহার দরজা। একজন প্রহরী দরজায় পাহারা দিচ্ছে। ফ্রান্সিসদের দেখে ঘর্ ঘর্ শব্দে দরজা খুলে দিল। ফ্রান্সিসরা ঢুকল।

বাড়ি দেখে ফ্রান্সিস বেশ অবাক হল। কত বড় বাড়ি। পাথর আর কাঠে তৈরী। এসব অঞ্চলে এরকম বাড়ি দেখবে আশা করেনি। বোঝা গেল পার্তাদো বেশ বর্ধিষ্ণু জমিদার।

ডানদিকে তাকিয়ে দেখল দূরে বিস্তৃত জমি। শূন্য। বোঝা গেল যা ফসল হয়েছিল তা কেটে ফেলা হয়েছে। নতুন করে চাষ শুরু হবে।

বাড়িতে ঢোকার দরজার সামনে এসে দেহরক্ষী দাঁড়াল। তখনই পার্তাদোর গাড়ি ঢুকল। পার্তাদো কোন কথা বললেন না। বাড়ির ভেতর ঢুকতে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন। মারিয়াকে তার সঙ্গে যেতে ইঙ্গিত করলেন। মারিয়া দাঁড়িয়ে রইল। ফ্রান্সিস মৃদুস্বরে বলল—যাও। মারিয়া পার্তাদোর পেছনে পেছনে বাড়িতে ঢুকে গেল। ফ্রান্সিস স্বস্তির শ্বাস ফেলল—যা হোক মারিয়া বাড়ির অন্দরমহলেই থাকবে।

দেহরক্ষীটি আবার হাঁটতে শুরু করল। ফ্রান্সিসরাও ওর পেছনে পেছনে চলল।

বাড়ির পেছনদিকে এল সবাই। একটা লোহার ফাঁক ফাঁক দরজাওয়ালা ঘরের সামনে এল ওরা। দরজায় তালা ঝুলছে। দরজার কাছে দুজন সশস্ত্র প্রহরী দাঁড়িয়েছিল। একজন দরজা খুলে দিল। রক্ষীটি ইঙ্গিতে ফ্রান্সিসদের ঘরে ঢুকতে বলল।

ফ্রান্সিসরা ঘরটায় ঢুকল। বেশ বড় পাথরের ঘর। এই দিনের বেলাতেও কেমন অন্ধকার অন্ধকার। অনেক ওপরে দু'দিকে দুটো ফোকর। জানালার মতো। সারা ঘরের মেঝেয় শুকনো ঘাস আর পাতায় তৈরি দড়ি দিয়ে শক্ত করে বাঁধা বিছানার মতো। এককোণে দু'জন কৃষ্ণকায় যুবক বসে আছে। ওরাও ক্রীতদাস।

ঘরে ঢুকে ফ্রান্সিস বসল। হ্যারি পাশে এসে বসল। ফ্রান্সিস হ্যারির দিকে তাকাল। বলল—হ্যারি শরীর ভালো আছে তো?

—আমার তো জানোই। খুব পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছি। এতটা পথ পায়ের বেড়ি টানতে টানতে আসা। ক্রীতদাস হব কোনদিন ভাবিনি।

—অবস্থা বিপাকে সবই হতে হয়। ফ্রান্সিস বলল—এই নিয়ে দুঃখ কোরো না। দেখি না কী করা যায়।

পরদিন ফ্রান্সিসরা সবে সকালের খাবার খেয়েছে দুজন কৃষ্ণকায় ক্রীতদাস দরজায় এসে দাঁড়াল। কয়েদঘরের দরজা খোলা হল।

কৃষ্ণকায়দের একজন এগিয়ে এল। বলল—তোমাদের কয়েকটা কথা বলার আছে—মানে কাজের কথা। তার আগে আমার নাম বলে রাখি। আমার নাম ওঙ্গা। তোমাদের মাতব্বর কে?

মাতব্বর কথাটা শুনে ফ্রান্সিসদের রাগ হল। ও প্রথমে কথা বলতে চাইল না। তারপর ভেবে দেখল এখন রাগারাগি করাটা বুদ্ধিমানের কাজ না। ও উঠে দাঁড়াল। বলল—

—আমি ফ্রান্সিস।

—ঠিক আছে। শোন—ওঙ্গা বলতে লাগল—এখানে গত চারমাস এক ফোঁটা বৃষ্টি হয়নি অথচ এটাই বৃষ্টি হওয়ার ঠিক সময়। এখানে মুষলধারেই বৃষ্টি হয়। কিন্তু বৃষ্টি হওয়ার নাম নেই। তাই কর্তাসাহেবের নির্দেশ এই ঘরের পেছনে যে ইঁদারা আছে সেখান থেকে জল নিয়ে ক্ষেতে জল ছিটোতে হবে।

—ক্ষেতে জল ছিটিয়ে চাষ হয়? হ্যারি বলল।

—সেটা কর্তাসাহেব বুঝবেন। ক্রীতদাসদের কর্তারা ক্রীতদাসদের বসিয়ে বসিয়ে খাওয়ায় না। যতটা কাজ তাদের কাছ থেকে পাওয়া সম্ভব তা আদায় করে নেয়। তোমাদের যা বলা হচ্ছে তাই করতে হবে। রাজি না হলে সবাইকে চাবুক খেতে হবে। ওঙ্গা বলল।

—চাবুক? কর্তাসাহেব চাবুক মারবে? শাঙ্কো বেশ অবাক হয়ে প্রশ্ন করল। ফ্রান্সিস একটু চুপ করে থেকে বলল—পার্তাদো চাবুক মারেন?

—হ্যাঁ। দরকার পড়লে। কর্তাসাহেবদের চেহারা সর্বত্রই এক। ওঙ্গা বলল।

—ঠিক। আমি ব্যতিক্রম আশা করেছিলাম। ফ্রান্সিস বলল।

—তবু তো চাবুক। কোথাও কোথাও হাত পা ভেঙে দিয়ে রাস্তায় বের করে দেওয়া হয়। ভিখারির জীবন কাটাতে হয় সেইসব ক্রীতদাসদের।

—এটা হতে পারে। ফ্রান্সিস বলল।

—যাক গে—যেজন্যে এলাম। আমরা সব দেখিয়ে দিচ্ছি—তোমরা সেইভাবেই কাজে লাগো। ওঙ্গা বলল। তারপর হাত নেড়ে বলল—

—এবার সবাই বেরিয়ে এসো।

ফ্রান্সিসরা বেরিয়ে এল। পুরনো বন্দী দুই কৃষ্ণকায়ও এল। কারো রেহাই নেই।

ফ্রান্সিসদের ঘরের পেছনে নিয়ে যাওয়া হল। একটা মস্তবড় ইঁদারা। তার ধারে ধারে আট দশটা বড় বড় কাঠের বালতি রাখা। ওঙ্গা বলল—এই বালতিগুলোয় জল ভরে ভরে ক্ষেতে ছিটোতে হবে। ক্ষেত জলে ভেজাতে হবে।

—অত বড় ক্ষেত—এ তো অনেকদিন লাগবে। শাঙ্কো বলল।

—যতদিন লাগে লাগুক। তবে তোমাদের ভাগ্যি যদি ভালো হয় তবে হয়তো ততদিনে বৃষ্টি শুরু হবে। তাহলেই ক্ষেত ভেজানোর কাজ তখন বন্ধ হবে। ওঙ্গা বলল।

—তাহলে এখনই কাজ আরম্ভ করতে হবে। শাঙ্কো বলল।

—হ্যাঁ এখনই। দুপুরে একঘণ্টা বিশ্রাম। তখন এখানে এসে খেয়ে যাবে। ওঙ্গা বলল।

—আমরা তো ক্ষেত থেকে পালাতে পারি। হ্যারি আস্তে বলল।

—পায়ের ঐ বেড়ি নিয়ে? সাত পাও যেতে পারবে না। তার আগেই প্রহরীরা মেরে ফেলবে। কাজেই পালাবার ভাবনা ছাড়ো। ভুলে যেও না তোমরা

ক্রীতদাস। কর্তাসাহেবের সব হুকুম। মরে গেলেও সেই হুকুম মানতে হবে। একসময় আমরা দুজনেও এমনি অত্যন্ত কষ্টকর কাজ করেছি। দেখেছি সব সহ্য হয়ে যায়। সহ্য না হলে উপায়ও নেই। ওঙ্গা বেশ বিজ্ঞের মত বলল।

—ঠিক আছে। আমরা কাজ শুরু করছি। শাঙ্কো বলল।

—কিন্তু একটা কথা। পায়ে বেড়ি নিয়ে তো আমরা দ্রুত কাজ করতে পারবো না। ফ্রান্সিস বলল।

—তবু যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কাজ করতে হবে। ওঙ্গা বলল।

ফ্রান্সিসরা ইঁদারার ধারে গেল। দড়ি-বাঁধা দুটো বড় বালতি। শাঙ্কো আর বিস্কো দুটো বালতির দড়ি হাতে নিল। তারপর জল তুলতে লাগল। বালতিতে ঢালতে লাগল।

বাকি সবাই জলভর্তি বালতি নিয়ে ক্ষেতের দিকে চলল। রোদ চড়া নয় বলে বাঁচোয়া।

ফ্রান্সিস দেখল ক্ষেতের মাটি শুকনো খটখটে। এত দূরবিস্তৃত ক্ষেতের মাটি শুধু বালতির জলে ভেজানো কি সম্ভব? কিন্তু উপায় নেই।

কর্তাসাহেবের হুকুম।

ফ্রান্সিসই প্রথম বালতি থেকে জল ছিটোলো। মুহূর্তে জল শুষে গেল। তবে জল পড়ে মাটির রঙ কালো হল। ফ্রান্সিস বুঝল কালো মাটি। তার মানে তুলোর চাষ হয়।

মাটিতে জল ছিটোনো চলল। বেড়ি পায়ে এতবার ইঁদারা থেকে ক্ষেত-এ যাওয়া। সবাই পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ল। হাঁপাতে লাগল। কিন্তু ওঙ্গাদের কোনো হেলদোল নেই। ওরা নির্বিকারে দেখতে লাগল। রোদের তেমন তেজ নেই বলে ওদের কষ্টটা একটু কম হচ্ছিল।

ফ্রান্সিস এবার ভালো করে চারিদিকে তাকাল। দেখল চারপাঁচজন সশস্ত্র প্রহরী দূরের চেস্টনাট গাছটার নীচে বসে আছে। পালাবার পথ বন্ধ।

ক্ষেতে জল ছিটোনোর কাজ চলল।

দুপুর হল। ওঙ্গা গলা চড়িয়ে বলল—খেতে চল।

ফ্রান্সিসরা হাঁপাতে হাঁপনাতে কয়েদঘরে ফিরে এল। প্রায় সবাই ঢক্ ঢক্ করে জল খেতে লাগল। ফ্রান্সিস বলল—এক্ষুনি অত জল খেও না। একটু জিরিয়ে নাও।

কিছু পরেই খাবার এল। ক্ষুধার্ত ফ্রান্সিসরা চেয়ে চেয়ে রুটি মাংস খেল। সবজীর ঝোল খেল।

আবার কাজে নামা।

বিকেল পর্যন্ত জল ছিটোনোর কাজ চলল। ওঙ্গারা ঘুরে ঘুরে কাজ দেখতে লাগল। কেউ বসে পড়লে উঠিয়ে দিতে লাগল। বোঝাই গেল কাজের সময় বিশ্রাম পাওয়া যাবে না।

ক্রীতদাস। কর্তাসাহেবের সব হুকুম। মরে গেলেও সেই হুকুম মানতে হবে। একসময় আমরা দুজনেও এমনি অত্যন্ত কষ্টকর কাজ করেছি। দেখেছি সব সহ্য হয়ে যায়। সহ্য না হলে উপায়ও নেই। ওঙ্গা বেশ বিজ্ঞের মত বলল।

—ঠিক আছে। আমরা কাজ শুরু করছি। শাঙ্কো বলল।

—কিন্তু একটা কথা। পায়ে বেড়ি নিয়ে তো আমরা দ্রুত কাজ করতে পারবো না। ফ্রান্সিস বলল।

—তবু যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কাজ করতে হবে। ওঙ্গা বলল।

ফ্রান্সিসরা ইঁদারার ধারে গেল। দড়ি-বাঁধা দুটো বড় বালতি। শাঙ্কো আর বিস্কো দুটো বালতির দড়ি হাতে নিল। তারপর জল তুলতে লাগল। বালতিতে ঢালতে লাগল।

বাকি সবাই জলভর্তি বালতি নিয়ে ক্ষেতের দিকে চলল। রোদ চড়া নয় বলে বাঁচোয়া।

ফ্রান্সিস দেখল ক্ষেতের মাটি শুকনো খটখটে। এত দূরবিস্তৃত ক্ষেতের মাটি শুধু বালতির জলে ভেজানো কি সম্ভব? কিন্তু উপায় নেই।

কর্তাসাহেবের হুকুম।

ফ্রান্সিসই প্রথম বালতি থেকে জল ছিটোলো। মুহূর্তে জল শুষে গেল। তবে জল পড়ে মাটির রঙ কালো হল। ফ্রান্সিস বুঝল কালো মাটি। তার মানে তুলোর চাষ হয়।

মাটিতে জল ছিটোনো চলল। বেড়ি পায়ে এতবার ইঁদারা থেকে ক্ষেত-এ যাওয়া। সবাই পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ল। হাঁপাতে লাগল। কিন্তু ওঙ্গাদের কোনো হেলদোল নেই। ওরা নির্বিকারে দেখতে লাগল। রোদের তেমন তেজ নেই বলে ওদের কষ্টটা একটু কম হচ্ছিল।

ফ্রান্সিস এবার ভালো করে চারিদিকে তাকাল। দেখল চারপাঁচজন সশস্ত্র প্রহরী দূরের চেস্টনাট গাছটার নীচে বসে আছে। পালাবার পথ বন্ধ।

ক্ষেতে জল ছিটোনোর কাজ চলল।

দুপুর হল। ওঙ্গা গলা চড়িয়ে বলল—খেতে চল।

ফ্রান্সিসরা হাঁপাতে হাঁপনাতে কয়েদঘরে ফিরে এল। প্রায় সবাই ঢক্ ঢক্ করে জল খেতে লাগল। ফ্রান্সিস বলল—এক্ষুনি অত জল খেও না। একটু জিরিয়ে নাও।

কিছু পরেই খাবার এল। ক্ষুধার্ত ফ্রান্সিসরা চেয়ে চেয়ে রুটি মাংস খেল। সবজীর ঝোল খেল।

আবার কাজে নামা।

বিকেল পর্যন্ত জল ছিটোনোর কাজ চলল। ওঙ্গারা ঘুরে ঘুরে কাজ দেখতে লাগল। কেউ বসে পড়লে উঠিয়ে দিতে লাগল। বোঝাই গেল কাজের সময় বিশ্রাম পাওয়া যাবে না।

ওঙ্গার উচ্চকণ্ঠ শোনা গেল—এবার কয়েদঘরে চলো।

তখনই পার্তাদো বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলেন। ওঙ্গারা ছুটে পার্তাদোর কাছে গেল। পার্তাদো ওদের সঙ্গে কী কথাবার্তা বললেন। তারপর বাড়ির ভেতর চলে গেলেন। ফ্রান্সিসদের দিকে তাকালেনও না। ক্ষেতের ধারে চেস্টনাট গাছের নীচে দাঁড়িয়ে থাকা প্রহরীরাও ফিরে এল।

দুপুরের মতো এবারও সবাই পরিশ্রান্ত। অনেকেই হাঁপাচ্ছে। কয়েকজন শুয়ে পড়ল। ফ্রান্সিসের হুঁশিয়ারিতে কেউ তক্ষুণি জল খেল না। একটু জিরিয়ে নিয়ে জল খাওয়া চলল।

বিকেলের খাবার দেওয়া হল। কলা আর আটার পিঠে। তাই ফ্রান্সিসরা গোগ্রাসে গিলল।

কয়েদঘরের দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

হ্যারি শুয়ে পড়েছিল। হঠাৎ শুয়ে থেকেই হ্যারি হো হো করে হেসে উঠল। হ্যারি কখনও এরকম হাসে না। বন্ধুরা অবাক। ফ্রান্সিসের পাশেই হ্যারি শুয়ে পড়েছিল। ফ্রান্সিস সঙ্গে সঙ্গে হ্যারির মুখের ওপর ঝুঁকে বলে উঠল—

—হ্যারি কী হয়েছে? তোমার শরীর ভালো তো?

হ্যারি উঠে বসল—জানো তো আমি শরীরের দিক থেকে দুর্বল। খুবই পরিশ্রান্ত লাগছে।

—তুমি পরিশ্রম সহ্য করতে পারবে? ফ্রান্সিস বলল।

—এই পরিশ্রম আর কতদিন? হ্যারি হেসে বলল।

—তার মানে? ফ্রান্সিস কথাটা শুনে বেশ অবাক হল।

—ইঁদারা কি সমুদ্র না নদী? হ্যারি আবার হেসে বলল।

—অ্যাঁ? ফ্রান্সিস লাফিয়ে উঠল। গলা চড়িয়ে বলল—সাবাস হ্যারি—আমি এটা আগে ভাবতেই পারি নি। শুধু পরিশ্রম কষ্টের কথা ভেবেছি। এবার ফ্রান্সিস সকলের দিকে তাকিয়ে বলল—বেশ দ্রুত ইঁদারা থেকে জল তুলতে থাকো। তাড়াতাড়ি ইঁদারার জল শেষ কর। তাহলেই এই অমানুষিক খাটুনি থেকে মুক্তি।

এবার সবাই ব্যাপারটা বুঝতে পারল। বন্ধুরা ধ্বনি তুলল—হো—হো—হো। প্রহরীরা ছুটে এল। ভাবল বন্দীদের মধ্যে বোধহয় মারামারি লেগেছে। ফ্রান্সিসরা হাসতে লাগল। প্রহরীর বুঝল তেমন কিছু না। ওরা নিশ্চিন্ত মনে পাহারা দিতে লাগল।

রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর কোলা ফ্রান্সিসের কাছে এল। বলল—তোমরা হো হো করছিলে। কী ব্যাপার?

—আরে বাবা ইঁদারার জল তো অঢেল নয়। দিন কয়েকের মধ্যেই ফুরিয়ে যাবে। তখন আর জল উঠবে না। কাদামাটি উঠবে।

—তখন ঐ কাদামাটিই তুলতে বলবে। ফ্রান্সিস বলল—কিন্তু সেটাই বা কতদিন? তারপর তো শুধুই মাটি।

—তা ঠিক। আমরা এটা ভাবিনি। তাহলে তো যত তাড়াতাড়ি সম্ভব জল তুলে ফেলতে হয়। কোলা বলল।

—সে কথাই সব্বাইকে বলেছিলাম। ফ্রান্সিস বলল।

—এটা করতেই হবে। কোলা বলল। তারপর বলল—এখানে আমাদের দেশের লোকও আছে।

—ওরাই তো তোমাদের দেশের লোক। ফ্রান্সিস বলল।

—একবার ওদের বলে দেখবো? যদি ওরা আমাকে মুক্তি দিতে পারে। কোলা বলল।

—অসম্ভব। তোমার দেশের কেউ যদি তোমাকে পালাতে দেয় তাহলে সে পার্তাদোর চাবুক খেয়ে মরে যাবে। এসব বড় সাংঘাতিক জায়গা। কেউ একটু ওদিক করলে আর রক্ষা নেই। বেঘোরে মরতে হবে। ফ্রান্সিস বলল।

—তুমি ঠিক বলেছো। এখান থেকে পালানো অসম্ভব। কোলা বলল। তারপর শুতে চলে গেল।

ফ্রান্সিস শুয়ে পড়ল। তখনই পায়ের দিকে তাকাল। মশালের আলোয় দেখল—লোহার বেড়িতে ঘষা লেগেলেগে ঘা মতো হয়ে গেছে। জলের বালতি নিয়ে ছুটোছুটিতে আরো ঘা বাড়বে। পাশেই হ্যারি ঘুমিয়ে আছে। ফ্রান্সিস হ্যারির পায়ের দিকে তাকাল। হ্যারির পায়েরও এক অবস্থা। ওষুধ চাই। পার্তাদোকে বৈদ্যির কথা বলতে হবে। মারিয়াকেও দিনে একবার ওদের কাছে আসতে দিতে বলবে।

সেদিন জল ছিটোনোর কাজ সেরে ফ্রান্সিসরা সবে বিকেলের খাবার খাচ্ছে তখনই পার্তাদো কয়েদঘরের দরজার কাছে এসে দাঁড়ালেন। প্রহরীরা মাথা নুইয়ে সম্মান জানান।

—কেমন আছো তোমরা? একটু হেসে পার্তাদো বললেন।

—ভালো নেই। ফ্রান্সিস কথাটা বলে দরজার কাছে গেল।

—কেন? খাবার দাবার তো যথেষ্ট দেওয়া হচ্ছে। পার্তাদো বললেন।

—ক্ষেতে জল ছিটোনো অত্যন্ত পরিশ্রমের কাজ। শাঙ্কো বলল।

—পরিশ্রমের জন্যেই তো তোমাদের কিনে এনেছি। আমার লোক দিয়েই যদি হবে তাহলে আর তোমাদের আনলাম কেন!

—পরিশ্রম তো করতেই হবে। কিন্তু তার জন্য তো শরীরটাকেও সুস্থ রাখতে হবে। ফ্রান্সিস বলল।

—কেন? তোমাদের কারো অসুখ করেছে? পার্তাদো বললেন।

—হ্যাঁ। ফ্রান্সিস পা দেখিয়ে বলল—লোহার বেড়ির ঘষায় আমাদের ঘা হয়ে গেছে।

পার্তাদো তাকিয়ে দেখলেন। মুখে চুক্ চুক্ শব্দ করলেন। বললেন—বৈদ্যি পাঠিয়ে দেব।

—পায়ের বেড়ি খুলে ফেললে হয় না? শাঙ্কো বলল।

—না। ওটি হবে না। পার্তাদো মৃদু হেসে বললেন।

এবার ফ্রান্সিস বলল—একটা কথা বলছিলাম।

—বলো। পার্তাদো ফ্রান্সিসের মুখের দিকে তাকালেন।

—বলছিলাম—রাজকুমারী মারিয়াকে বিকেলবেলা মানে আমাদের কাজের শেষে যদি এখানে একবার—সারাদিনেই একবার আসতে দেন তাহলে ভালো হয়। ফ্রান্সিস বলল।

—তোমাদের রাজকুমারী ভালো আছে। আমার স্ত্রীর খাস সহচরী হয়ে আছে। সহচরী হিসেবে অমন শিক্ষিতা মেয়ে তো পাওয়া যায় না। পার্তাদো হেসে বললেন।

—সেটাই ওর মুখ থেকে শুনতে চাই। ও নিজেও আমাদের জন্য চিন্তায় থাকে। আমাদের দেখলে, আমাদের সঙ্গে কথা বললে ওর মনটাও ভালো থাকে। ফ্রান্সিস বলল।

—তোমাদের অনুরোধের দেখছি সীমা নেই। পার্তাদো আবার হেসে বললেন।

—এটাই শেষ অনুরোধ। ফ্রান্সিস বলল।

—ঠিক আছে। দেখছি। পার্তাদো বললেন।

পরদিন সকালের খাবার খাচ্ছে ফ্রান্সিসরা। তখন বদ্যি এল। গায়ে কালো রঙের বিরাট আলখাল্লা। মুখভর্তি দাড়ি গোঁফ। সব সাদা। গলায় নানারঙের পাথরের মালা। হাতে ঝোলানো কাপড়ের ঝোলা।

কয়েদঘরের দরজা খুলে দেওয়া হল। বদ্যি ঝোলা থেকে দুটো চিনেমাটির বোয়াম বের করল। আঠা-আঠামত কালচে মলম বের করল। দুটো মেশাল। তারপর ফ্রান্সিসদের পায়ের ক্ষতে লাগাতে লাগল। শাঙ্কোকে প্রথমে লাগাল। উরি বাবা! কী জ্বলুনি! শাঙ্কো প্রায় লাফাতে লাগল। একটু পরেই জ্বলুনি কমল। কোনো জ্বালা যন্ত্রণা নেই। সকলেরই এক অবস্থা হল।

বদ্যি হেসে বলল—খুব কড়া ওষুধ। লোহার বেড়ির ক্ষত এই ওষুধে অনেকটা সেরে যাবে। সবটা সারবে বিশ্রাম পাবার পর। অবশ্য যদি তোমাদের কপালে বিশ্রাম জোটে। সকলেরই কষ্ট যন্ত্রণা মোটামুটি কমল। বদ্যি ঝোলা তুলে চলে গেল।

এবার কাজ। ক্ষেতে জল ছিটোনো। জল ছিটোনোর কাজ চলল দুপুর পর্যন্ত। তারপর খাওয়া। আবার ক্ষেতে নামা। বিকেলের দিকে ছুটি মিলল।

কয়েদঘরে ফিরে সবাই কমবেশি হাঁপাতে লাগল। কেউ কেউ শুয়ে পড়ল। ফ্রান্সিস ডাকল—শাঙ্কো?

শাঙ্কো এগিয়ে এল।

—ইঁদারার জলের অবস্থা কী দেখলে? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—অসম্ভব। এত গভীর ইঁদারা আর এত জল যেন সমুদ্রের জল। কবে ঐ জল ফুরোবে বলা কঠিন। শাঙ্কো বলল।

এমনসময় মারিয়া এল। পেছনে একটি কৃষ্ণাঙ্গিনী মেয়ে। বোঝা গেল পার্তাদো মারিয়াকে পাহারার ব্যবস্থাও রেখেছে।

মারিয়া দরজার কাছে এল। ফ্রান্সিস উঠে দরজার কাছে গেল।

—তোমাদের খুব খাটাচ্ছে? মারিয়া জানতে চাইল।

—ক্রীতদাস দিয়ে তো খাটানোই হয়। তবে শুনে নিশ্চিন্ত হলাম তুমি নাকি কর্ত্রীর সহচরী হয়েছো? ফ্রান্সিস হেসে বলল।

—হ্যাঁ। তবে ক্রীতদাসী তো। সাবধানে থাকতে হয়। বেশি বাড়াবাড়ি না হয়ে যায়। মারিয়া বলল।

—এ ব্যাপারে খুব সাবধানে থেকো। ফ্রান্সিস বলল।

—শুনলাম বদ্যি এসেছিল। মারিয়া বলল।

—হ্যাঁ। বেড়ির ঘষায় পা ছুলে গিয়ে—ফ্রান্সিস বলল।

—ওষুধ দিয়েছে তো? মারিয়া জিজ্ঞেস করল।

—হ্যাঁ। ওষুধে ভালো কাজ হয়েছে। ফ্রান্সিস মাথা নেড়ে বলল।

ইতিমধ্যে কোলা উঠে এল। সে হেসে হেসে কৃষ্ণাঙ্গিনী মেয়েটির সঙ্গে হাতমুখ নেড়েই ইঙ্গিতে কথা বলতে লাগল। মেয়েটি এবার একটু হেসে কী বলে উঠল। কোলা চেঁচিয়ে বলল—ফ্রান্সিস এ আমার দেশের মেয়ে।

—তাহলে গল্প জুড়ে দাও। ফ্রান্সিস হেসে বলল। মারিয়াও হাসল। এবার কোলা অনর্গল কী সব বলতে লাগল। মেয়েটি কোনটার জবাব দিল কোনটার জবাব দিল না। এতে মারিয়ার সঙ্গে ফ্রান্সিসের কথা বলতে অসুবিধে হচ্ছিল। ফ্রান্সিস একবার কোলার দিকে দেখে নিয়ে হেসে বলল—মারিয়া, ওদের কথা বলতে দাও। আমাদের কথা থাক। মারিয়াও হেসে সম্মত জানাল। কোলার কথার তখনও শেষ নেই।

মারিয়া ফিরে দাঁড়াল। মেয়েটিও মারিয়ার পেছনে গিয়ে দাঁড়াল। দুজনে সদর দরজার দিকে চলল। কোলা তখনও ওদের দিকে তাকিয়ে আছে। ফ্রান্সিস বুঝল কোলা কতদিন পরে দেশের লোক পেয়েছে। ওর কথা তাই ফুরোচ্ছে না।

রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর কোলা ফ্রান্সিসের কাছে এল। ফ্রান্সিস তখন চোখ বুজে শুয়ে পড়েছে। কোলা ওর মাথার কাছে বসল। বলল—মেয়েটির বাড়ি আমাদের গ্রামের পাশের গ্রামে। একদিন গভীর রাতে ক্রীতদাস ব্যবসায়ী গুণ্ডারা ওদের বাড়িঘর জ্বালিয়ে ওদের ধরে নিয়ে আসে। ঐ আমারগো বন্দরের ক্রীতদাসের হাটেই বিক্রি করে। ওদের কাজ হল যাঁতায় গম ভাঙা।

—একদিনেই এত কথা জেনে গেলে। ফ্রান্সিস চোখ বুজেই হেসে বলল।

—জিজ্ঞেসটিজ্ঞেস করে জানলাম। কোলা হেসে বলল।

কালকেও তো ঐ মেয়েটি এলে বকর-বকর করবে। ফ্রান্সিস বলল।
—কতদিন পরে দেশের লোক পেয়েছি। কোলা হেসে বলল।
—তাহলে এক কাজ কর। তোমরাই কথা বল। আমরা বলবো না। ফ্রান্সিস বলল।
—না—না। তা কী করে হয়। তোমরাও বলবে আমরাও বলবো। কোলা বলল।
—তাহলে ব্যাপারটা জগাখিচুড়ি হয়ে যাবে। ফ্রান্সিস বলল।
—ঠিক আছে—আমরা অল্প কথা বলবো।
—আরে না না।—ফ্রান্সিস হেসে উঠল—তোমরা বেশি কথাই বলো।
—ঠিক আছে। কোলা বলল।
—গতকাল বিকেলের খাবার খাওনি। ফ্রান্সিস বলল।
—মনেই ছিল না। কোলা হেসে বলল।
—না খেয়ে থেকো না। শরীরটা ঠিক রাখো। ফ্রান্সিস বলল।

পরদিন বিকেল নাগাদ জল ছিটোনোর কাজ সেরে সবাই কয়েদঘরে ফিরে এল। সবাই শুয়ে বসে বিশ্রাম করছে। কোলা কিন্তু একা ঠায় দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রইল। চোখ বাড়ির পূব দেয়ালের দিকে। ওদিক দিয়েই মারিয়ারা আসে।

তখনই বিকেলের খাবার দেওয়া হল। ফ্রান্সিস ডাকল—কোলা। কোলা ফ্রান্সিসের দিকে ফিরে তাকাল।

কোলা দরজা থেকে সরে এসে খাবার খেতে লাগল। তখনই মারিয়ারা এল। কোলার তখনও খাওয়া শেষ হয়নি। ফ্রান্সিস ধমক দিয়ে বলল—কোলা—খাবার খেয়ে যাও। এবার কোলা খাওয়া শেষ করল।

ফ্রান্সিসের আগেই খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। ও গিয়ে দরজায় দাঁড়াল। মারিয়া বলল—ওষুধে কাজ হয়েছে?
—হ্যাঁ। জ্বালা যন্ত্রণা অনেকটা কমেছে। তবে যতদিন ধরে বালতি টানাটানি করবো ততদিন সবটা সারবে বলে মনে হয় না। ফ্রান্সিস বলল।
—কর্তাসাহেব বদ্যিকে বলেছে সবাইকে কাজ করবার মতো সুস্থ করে তুলতে। প্রত্যেক সন্ধ্যায় বদ্যি ওষুধ দিতে আসবে। মারিয়া বলল।
—হ্যাঁ। আমাদের তো সুস্থ থাকতেই হবে। ফ্রান্সিস মৃদু হেসে বলল।

ততক্ষণে কোলা এসে দাঁড়িয়ে মেয়েটির সঙ্গে কথা বলতে শুরু করেছে। ফ্রান্সিস একবার হেসে ওদের দিকে তাকাল কিন্তু কিছু বলল না। মারিয়ার সঙ্গে এটা ওটা নিয়ে কথা বলতে লাগল।

হ্যারি দরজার কাছে এগিয়ে এল। মারিয়াকে জিজ্ঞেস করল—রাজকুমারী, আপনি কেমন আছেন?
—আজ ভালোই আছি। কিন্তু তোমরা তো ভালো নেই। মারিয়া বলল।
—হ্যাঁ, গাধার খাটুনি খাটছি। হ্যারি বলল।

—হ্যারি তোমার শরীরের দিকে নজর রেখো। এত খাটুনি তুমি সহ্য করতে পারবে না। মারিয়া বলল।

—উপায় নেই। ক্রীতদাসত্ব এমনিই। হ্যারি বলল।

মারিয়া আর কিছু বলল না। ফ্রান্সিসও নিজেদের জায়গায় ফিরে এল। কোলা তখনও বকবক করে চলেছে।

মারিয়া ঘুরে দাঁড়াল। কোলাদের কথা বন্ধ হল। মারিয়া আর কালো মেয়েটি চলে গেল।

ফ্রান্সিস ডাকল—শাঙ্কো। শাঙ্কো ওর কাছে এল।

—ইঁদারার জলের অবস্থা কী? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—অফুরন্ত জল। জলের থই পাচ্ছি না। ইঁদারাটার সঙ্গে বোধহয় সমুদ্রের যোগ আছে।

—সমুদ্রের নোনা জলে চাষ হয়? তা নয়। পার্তাদো খুব ভেবেচিন্তে কাজ করে। পার্তাদো খুব গভীর করে ইঁদারা খুঁড়িয়েছে। যাতে জলের অভাব না হয়। কবে জল শেষ হবে। ততদিন পশুর মত খাটতে হবে। ফ্রান্সিস বলল।

—ফ্রান্সিস তাহলে পালানো যাবে না। শাঙ্কো বলল।

—তুমিই ভেবে বের করো না কীভাবে পালানো যায়। ফ্রান্সিস বলল।

—তোমার মতো বুদ্ধি আমার নেই। তুমি যা বল তাই আমরা করি। এটা তোমারই কাজ। শাঙ্কো মাথা নেড়ে বলল।

—ভাবছি—বুঝলে? আমরা যাতে কেউ আহত না হই, মরে না যাই—সেভাবেই সব ভাবতে হচ্ছে। ফ্রান্সিস চিন্তিত স্বরে বলল।

—দেখ ভেবে। এই জীবন অসহ্য। শাঙ্কো বলে উঠল।

—মেনে নাও। তাহলে দেখবে কষ্টটা কম হচ্ছে। ফ্রান্সিস বলল।

শাঙ্কো আর কিছু বলল না। নিজের জায়গায় ফিরে গেল।

জমিতে জল ছিটোনোর কাজ চলল। সারাদিন। মাঝখানে খাওয়ার জন্যে যেটুকু সময় বিশ্রামের।

সন্ধ্যেবেলা বৈদ্য আসে। ওদের পায়ের অবস্থা দেখে। ওষুধ দিয়ে যায়। রাতে জ্বালা যন্ত্রণা কমে। ওরা ঘুমুতে পারে। কিন্তু ক্ষত একেবারে সারে না। বোধহয় পার্তাদো এভাবেই ওদের দিয়ে কাজ করাতে চায়।

বিকেলবেলা মারিয়া আর মেয়েটি আসে। মারিয়া ফ্রান্সিসদের সঙ্গে কথাটথা বলে। কোলা আর মেয়েটির বকবকানিও চলে। এটা ফ্রান্সিসদের গা সওয়া হয়ে গেছে। কোলার দুই বন্ধুস্থানীয় কোলার সঙ্গে ঠাট্টা তামাসা করে। কোলা কোন কথা বলে না। গুম হয়ে বসে থাকে।

সেদিন খাওয়া দাওয়ার পর কোলা ফ্রান্সিসের কাছে এল। বলল—পাংলু এক অদ্ভুত কথা বলল। ফ্রান্সিস শুয়ে পড়েছিল। চোখ বুঁজেই বলল—পাংলু কে?

—কালো মেয়েটা। ওরা নাম পাংলু। কোলা বলল।

—অদ্ভুত নাম। ফ্রান্সিস বলল।

—আমাদের দেশের বাড়িতে এমনি অদ্ভুত নামই হয়। কোলা একটু অভিমানের সুরে বলল।

—তা অদ্ভুত কথাটা কী? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—তুমিতো আমারগো বন্দরের কথা জানো। কোলা বলল।

—হ্যাঁ। ওখানেই তো ক্রীতদাসের হাট থেকে আমাদের কেনা হয়ে হয়েছিল। ফ্রান্সিস বলল।

—সেই আমারগো বন্দর থেকে বেশ কিছুটা দূরে রাজা আলফ্রেডের ভাঙা দূর্গ আছে। তার পাশেই থাকেন এক ইহুদী ভদ্রলোক। নাম সামুছা। ওখানকার জমিদার। আমারগো বন্দরের ক্রীতদাসের হাট থেকে পাংলুকে কিনেছিলেন। পাংলু সামুছার বাড়িতে ক্রীতদাসী হয়েছিল।

—অদ্ভুত ব্যাপারটা কী তাই বলো? ফ্রান্সিস বলল।

—বলছি। সামুছার বাড়ির কাছেই রাজা আলফ্রেডের ধ্বংসপ্রাপ্ত দুর্গ। ঐ দুর্গে আছে রাজা আলফ্রেডের গুপ্ত ধনভাণ্ডার।

—গুপ্ত ধনভাণ্ডার? ফ্রান্সিস চমকে চোখ মেলল। দ্রুত উঠে বসল। বলল—ঐ ভাঙা দুর্গে?

—হ্যাঁ। জমিদার সামুছা সেই গুপ্ত ধনভাণ্ডার খুঁজে বের করার জন্যে ভাঙা দুর্গের আনাচেকানাচে খুঁজে বেড়ায়। জমিদারি দেখে আর ধনভাণ্ডার খোঁজে। কোলা বলল।

—ঠিক আছে। আমি কয়েকটা বিষয় জানতে চাইছি। ফ্রান্সিস বলল।

—কী কী বিষয় বলো। কোলা বলল।

—জানবে কতকাল আগে রাজা আলফ্রেড রাজত্ব করতো। সামুছা কতদিন যাবৎ গুপ্ত ধনভাণ্ডার খুঁজছেন? তিনি কোন সূত্র পেয়েছেন কিনা। গুপ্ত ধনভাণ্ডার খোঁজার জন্য উনি কাউকে সাহায্য করতে রাজি কি না। ফ্রান্সিস বলল।

—এতসব ব্যাপার পাংলু বলতে পারবে? কোলা সংশয় প্রকাশ করল।

—তুমি জিজ্ঞেস তো করো। সামুছার বাড়িতেই ও কাজ করত। কাজেই ভেতরের অনেক খবর ওর পক্ষে জানা সম্ভব।

—দেখি কথা বলে। কোলা মাথা নেড়ে বলল।

পরের দিন বিকেলে পাংলু মারিয়ার পেছনে পেছনে এল। কোলা আগে থেকেই লোহার ফোকরওয়ালা দরজার সামনে দাঁড়িয়েছিল।

ফ্রান্সিস বলল—পাংলুর কাছ থেকে কিছু দরকারি কথা কোলাকে জানতে বলেছি। কোলা সেসব জানুক। আমরা বেশি কথা বলবো না।

—বেশ। মারিয়া হেসে বলল। তারপর বলল—কী এমন দরকারি কথা?

—রাজা আলফ্রেডের গুপ্ত ধনভাণ্ডারের কথা। ফ্রান্সিস বলল।

—ব্যস্। দেশে ফেরা হয়ে গেল। মারিয়া বলল।

—ব্যস্ত হচ্ছো কেন। দেখাই যাক না। হদিশ করতে পারি কি না। ফ্রান্সিস বলল।

—গুপ্ত ধনভাণ্ডার কি এখানে? মারিয়া জানতে চাইল।

—না। আমারগো বন্দর থেকে কিছুদূরে রাজা আলফ্রেডের ভগ্নদূর্গে। ফ্রান্সিস বলল।

—তাহলে তো আমারগো বন্দরে যেতে হবে। যাবে কী করে? মারিয়া বলল।

—পালাবো। ফ্রান্সিস গলায় জোর দিয়ে বলল।

—পারবে? মারিয়া বলল।

—পারতে হবে। ক্রীতদাস হয়ে বাকি জীবন কাটাবো নাকি? ফ্রান্সিস বলল।

—দেখ চেষ্টা করে। মারিয়া বলল।

ওদিকে কোলা আর পাংলুর কথা শেষ হয় না। ফ্রান্সিস মারিয়া দুজনেই চুপ করে রইল। কোলা আর পাংলু দেশোয়ালি ভাষায় তখনও কথা বলে চলেছে।

কিছুক্ষণ পরে মারিয়া আর পাংলু ফিরে গেল। কোলা সেইদিকে তাকিয়ে রইল।

—কোলা বসবে চলো। ফ্রান্সিস বলল। তারপর নিজের জায়গায় এসে বসল। কোলা এসে পাশে বসল।

—এবার বলো পাংলু কী বলল? ফ্রান্সিস বলল।

—দেখলাম ও অনেক কিছু জানে। কোলা বলল।

—তাহলে বলো রাজা আলফ্রেড কতকাল আগে ওখানে রাজত্ব করতো?

—সামুছা কতদিন যাবৎ গুপ্ত ধনভাণ্ডার খুঁজছে? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—সেটা পাংলু বলতে পারল না। তবে যখন থেকে সামুছার বাড়িতে ক্রীতদাসী হয়ে এল তখন থেকেই দেখেছে সামুছা প্রতি রোববার নেভানো মশাল নিয়ে ভাঙা দূর্গের দিকে যায়। বোধহয় ওখানে চক্‌মকি পাথর ঠুকে মশাল জ্বালিয়ে গুপ্ত ধনভাণ্ডার খোঁজে। কোলা বলল।

—হুঁ। তাহলে খুব বেশিদিন নয়। আচ্ছা সামুছা কি এ ব্যাপারে কারো সাহায্য নিয়েছিল? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—পাংলু বলল—একজন স্পেন দেশের লোক নাকি একটা কি ছবির কাগজ নিয়ে এসেছিল। সামুছার সঙ্গে সেও কিছুদিন ভাঙা দূর্গে যেতো। কিন্তু দুজনের ঝগড়া হয়। স্পেনীয় লোকটি পাততাড়ি গুটিয়ে চলে গিয়েছিল। কোলা বলল।

—তার মানে বখরায় বনেনি। ফ্রান্সিস বলল।

—ঐ রকমই কিছু হবে। কোলা বলল।

—বখরা না চাইলে সামুছা একসঙ্গে ধনভাণ্ডার খুঁজতে রাজি হতো। এটা

আমার জানা দরকার ছিল। পাংলুকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এটা পাংলুকে বলো। ফ্রান্সিস বলল।

—বলবো। তাহলে তোমার সব জানা হল। কোলা বলল।

—মোটামুটি। এখনও অনেক কিছু জানতে হবে। ফ্রান্সিস বলল।

—কিন্তু এসব জেনে তোমার কী হবে? কোলা বলল।

—আমি ঐ গুপ্ত ধনভাণ্ডার খুঁজে বের করবো। ফ্রান্সিস বলল।

—তুমি কি পাগল হয়েছো? কোলা হেসে বলল—এখান থেকে বেরোতে পারলে তবে তো গুপ্ত ধনভাণ্ডার খুঁজবে।

—এখান থেকে পালাবার ছক কষেছি। ফ্রান্সিস বলল।

কোলা চমকে উঠল। বলল—তোমার ছক কষা হয়ে গেছে?

—প্রায়। আর কিছুদিন এখানকার ব্যবস্থাটা দেখতে হবে। কারণ রাতে তো আমরা বেরোতে পারি না। কাজেই জানি না বড় গেট-এ দরজায় কতজন প্রহরী থাকে। এটা জানতে হবে। গেট-এর দরজায় ক'টা তালা লাগানো থাকে। বাইরে ভেতরে দুদিকেই কি তালা লাগানো হয়? ফ্রান্সিস বলল।

—সেটা কী করে জানবে? কোলা বলল।

—একটু রাতে পাংলু বেরিয়ে সেটা জেনে আসবে। ফ্রান্সিস বলল।

—তোমাদের রাজকুমারীও জানতে পারে। কোলা বলল।

—না রাজকুমারী গেলে প্রহরীদের সন্দেহ হবে। ফ্রান্সিস বলল।

—তাহলে পাংলুকে একথা বলতে হয়। কোলা বলল।

—হ্যাঁ। বলবে। ফ্রান্সিস বলল।

—তাহলে মুক্ত জীবন পাবো? কোলা বেশ আবেগের সঙ্গে বলে উঠল।

—হ্যাঁ পাবে। তবে এখনই একেবারে নিশ্চিন্ত থেকো না। সব খবরাখবর এখনও নেওয়া হয়নি। ফ্রান্সিস বলল।

একটু চুপ করে থেকে কোলা বলল—আমি একাই পালিয়ে যাবো।

—পাগল হয়েছো! ঐ কাজটিও করতে যেও না। বেঘোরে মরবে। ফ্রান্সিস কোলাকে সাবধান করল।

—না। আমি পারবো। আমি অনেক জোরে ছুটতে পারি। কোলা বলল।

—পায়ের ঐ বেড়ি নিয়ে? পারবে? ফ্রান্সিস সংশয় প্রকাশ করল।

—হ্যাঁ পারবো। কোলা গলায় বেশ জোর দিয়ে বলল।

—ঠিক আছে। কিছুদিন অপেক্ষা করো। দেখি না ছক খাটে কি না। ফ্রান্সিস বলল।

—আমার অতো ধৈর্য্য নেই। তোমার ছক নাও খাটতে পারে। কোলা বলল।

—হ্যাঁ তা পারে। তবে একবার চেষ্টা তো করবো। ফ্রান্সিস বলল।

—গেট ডিঙিয়ে পালাতে গেলে ঐ প্রহরীরা নিরস্ত্র আমাদের মেরে ফেলবে। কোলা বলল।

—দেখা যাক। ফ্রান্সিস মাথা ওঠা নামা করে বলল।

পরদিন ফ্রান্সিসরা সকালের খাবার খাচ্ছে তখনই পার্তাদো এল। কয়েদঘরের দরজার সামনে এসে দাঁড়ালেন। বললেন—শোন। আমি বাইরে যাচ্ছি। কয়েকদিন পরে ফিরবো। তোমরা ভালা হয়ে থাকবে। কেউ পালাবার চেষ্টা করবে না। করলে জীবন যাবে।

ফ্রান্সিসরা কেউ কিছু বলল না। পার্তাদো বললেন—আজ থেকে ক্ষেতের কাজ বন্ধ। আমার জমির দুপাশে যে জঙ্গল রয়েছে সে দুটো জঙ্গল সাফ করতে হবে। আমি ক্ষেত বাড়াবো। তোমাদের কাজ হল দুধারের জঙ্গল সাফ করা। ঠিক আছে। ওঙ্গারা তোমাদের দেখিয়ে দেবে। ভালো কথা দুধারের জঙ্গলের শেষে তিনজন তিনজন করে দেহরক্ষী থাকবে যাতে জঙ্গলের মধ্য দিয়ে তোমরা পালাতে না পারো। ঠিক আছে।

ফ্রান্সিসরা কোন কথা বলল না। পার্তাদো ওঙ্গাদের আঙুল নেড়ে ডাকলেন। ওঙ্গারা এগিয়ে এল। ওদের দুহাতে তিনচারটে করে কুড়ুল।

পার্তাদো আর দাঁড়ালেন না। চলে গেলেন।

কয়েদঘরের দরজা খুলে দেওয়া হল। কুড়ুল কম পড়ে গেল। ওঙ্গা বলল—কালকে আরো কুড়ুল পাবে। আজকে যে কটা পাচ্ছো তাই দিয়ে কাজ চলুক।

ফ্রান্সিসরা এই ভেবে খুশি হল যে এখন কটা দিন জঙ্গলের ছায়ার গাছ কাটা খুব একটা পরিশ্রমের কাজ নয়।

দুপাশে দু'দল ভাগ হয়ে গেল। শুরু হল গাছ আগাছা কাটা। ফ্রান্সিস এক ফাঁকে জঙ্গল ছাড়িয়ে এল। দেখল তিনজন সশস্ত্র দেহরক্ষী এক ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। ও চলে এল। দেহরক্ষীরা ছাড়াও রয়েছে ওঙ্গারা দু'জন। কড়া পাহারারই ব্যবস্থা হয়েছে।

দুপুরে খাওয়া। একটু বিশ্রাম। তারপরেই গাছ কাটা।

পরদিন দুপুরের দিকে আকাশ অন্ধকার করে মেঘ জমতে লাগল। হ্যারি গাছের মাথার দিকে তাকিয়ে এটা লক্ষ্য করল। ও খুশির স্বরে বলে উঠল—ফ্রান্সিস—সৌভাগ্য। আকাশে মেঘ জমেছে।

—বলো কি? ফ্রান্সিস গাছের মাথার ওপর দিয়ে তাকাল। সত্যিই কালো মেঘের জটলা।

একটু পরেই শুরু হল বিদ্যুৎ চমকানো আর ঘন ঘন বাজ পড়া। তারপরই শুরু হল বড় বড় ফোঁটা বৃষ্টি। একটু পরেই মুষলধারে বৃষ্টি। গাছ কেটে ফেলায় ওপরটা ফাঁকা হয়ে গেছে। ফ্রান্সিসরা খোলা জায়গায় দাঁড়িয়ে ভিজতে লাগল। গাছ কাটা বন্ধ।

ওঙ্গা গলা চড়িয়ে বলল—কাজ চালাও। শাঙ্কো বলল—ভাই কতদিন গরমে সেদ্ধ হয়েছি। এবার বৃষ্টিতে ভিজে একটু ঠাণ্ডা হতে দাও। ওঙ্গা বলল—না, না। কাজ চালিয়ে যেতে হবে।

ফ্রান্সিসরা আর আপত্তি করল না। আবার গাছ কাটতে লাগল। তখনও বৃষ্টি চলছে।

বিকেল হল। ওঙ্গা গলা চড়িয়ে বলল—এবার সবাই ক্ষেতের ওপর এল। ক্ষেতের মাটি তখন প্রায় কাদা হয়ে গেছে। ঐ কাদার ওপর দিয়েই ওরা হেঁটে চলল কয়েদঘরের দিকে। আজকে ওরা খুশি। দুএকজন কাদা ছোঁড়াছুঁড়িও করল। কাল থেকে আর জল ছিটোতে হবে না।

ওঙ্গা বলল—কর্তাসাহেব থাকলে খুব খুশি হত। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বৃষ্টিতে ভিজত।

বৃষ্টির জোর কমে গেছে। টিপ টিপ বৃষ্টি পড়ছে। চারদিক বেশ অন্ধকার হয়ে গেল। আকাশের মেঘ কাটে নি। রাতেও বৃষ্টি হতে পারে।

ফ্রান্সিসদের বিকেলের খাবার তখন খাওয়া হয়ে গেছে। কোলা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খাবার খেল।

মারিয়া আর পাংলু এল। মারিয়া হেসে ফ্রান্সিসকে বলল—তোমাদের আর জল ছিটোতে হবে না। ফ্রান্সিসও হাসল। বলল—হ্যাঁ। বৃষ্টি হতে বেঁচে গেলাম। ওদিকে কোলা পাংলুর সঙ্গে কথা বলছে।

ফ্রান্সিস একটু গলা নামিয়ে বলল—একটা খুব দরকারি কথা বলছি। বাড়িতে কোথায় অস্ত্রশস্ত্র মানে ঢাল তরোয়াল রাখা হয় কোথায়—সেই ঘরটা একবার দেখবে। সাবধান প্রহরীদের যেন কোনরকম সন্দেহ না হয়। খুব গোপনে কাজটা করতে হবে। পারবে তো?

—এটা কী এমন কাজ? মারিয়া বলল।

—কাউকে জিজ্ঞেস করে জানতে যেও না। তুমি একাই খুঁজে দেখবে। ফ্রান্সিস বলল।

—ঠিক আছে। মারিয়া মাথা নেড়ে বলল।

রাতের খাওয়া সেরে কোলা ফ্রান্সিসের কাছে এল। ফ্রান্সিস যথারীতি চোখ বুঁজে শুয়ে আছে। বলল—

—পাংলুকে বলেছো?

—হ্যাঁ। ও বলেছে রাতে ও লক্ষ্য করবে। কোলা বলল।

—ভালো কথা। ফ্রান্সিস বলল।

রাতে বৃষ্টি হল।

পরের দিন আবার জঙ্গল কাটা চলল।

বিকেল হল। ক্ষেতে কাদা আরও বেড়েছে। ওরা ক্ষেত পার হয়ে কয়েদ ঘরে এল।

তখনও ফ্রান্সিসদের বিকেলের খাবার খাওয়া হয়নি। মারিয়ারা একটু তাড়াতাড়ি এল। কোলা দরজায় দাঁড়িয়েই ছিল। পাংলুর সঙ্গে কথা বলছিল। ফ্রান্সিস একবারে তাকিয়ে দেখল। কিছু বলল না। ফ্রান্সিস গলা নামিয়ে বলল—

—খোঁজ পেলে?

—হ্যাঁ। মারিয়াও আস্তে বলল—সদর দরজা দিয়ে ঢুকে ডানহাতি প্রথম ঘরটাই অস্ত্রাগার—তরোয়াল ঢাল চাবুক লোহার শেকল এসব রাখা।

—ঘরটা কি বন্ধ থাকে? ফ্রান্সিস বলল।

—না। দরজা ভেজানো থাকে। ঠেললেই খুলে যায়। মারিয়া বলল।

—কোন প্রহরী থাকে? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—না। ফ্রান্সিস হেসে বলল—সবই অনুকূল। এবার হুক কাজে লাগানো।

রাতে কোলা এল।

—পাংলুকে জিজ্ঞেস করেছো? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—হ্যাঁ। ও বলল—শুধু ভেতর থেকে তালা দেওয়া থাকে। বাইরে কোন তালা লাগানো হয় না। কোলা বলল।

—কাজটা সহজ হয়ে গেল। ফ্রান্সিস হাঁফ ছেড়ে বলল।

—তোমরা কি পালাতে পারবে? কোলা জিজ্ঞেস করল।

—এখনই ঠিক বলতে পারছি না। আগে কাজ শুরু করি। ফ্রান্সিস বলল।

—তোমরা কবে পালাতে পারবে কে জানে। আমি একাই পালাবো। কোলা অসহিষ্ণু ভঙ্গিতে ঘাড় নেড়ে বলল।

—সাবধান। এভাবে বিপদ ডেকে এনো না। ফ্রান্সিস বলল।

কোলা গম্ভীরগলায় বলল—আমি তোমাদের বিশ্বাস করি না। কথাটা বলে ও চলে গেল। আর একটা কথাও বলল না। কথাটা ফ্রান্সিসের ভালো লাগল না। ও নিজের সম্পর্কে এরকম কথা ও কখনও শোনেনি। ও ভাবল কোলার ওপর রাগ না করে ওকে বুঝিয়ে বলবে।

জঙ্গল প্রায় অর্ধেক কাটা হয়ে গেল। শুধু কাটা গুঁড়িগুলো উঁচিয়ে আছে।

গাছকাটার কাজ সেরে ফ্রান্সিসরা ফিরে এল। আসতে আসতে ওঙ্গা বলল—গাছ কাটা হলে তোমাদের চাষের কাজে নামতে হবে।

—এই ক্ষেতে কীসের চাষ হয়? শাঙ্কো জানতে চাইল।

—তুলো। ওঙ্গা বলল।

—তুলো? শাঙ্কো বলল।

—হ্যাঁ। দেখছো না এখানে মাটির রঙ কালো। ওঙ্গা বলল।

ওরা কয়েদঘরে ফিরে এল।

ফ্রান্সিস কয়েকদিন যাবৎ লক্ষ্য করল কোলা রাতের খাওয়ার পর আর ওর কাছে আসে না। কাজ করতে করতেও কথা বলতে আসে না। কেমন গুম মেরে থাকে।

দু'দিন পরের ঘটনা।

সেদিন ফ্রান্সিসরা গাছ আগাছা কাটছে। ফ্রান্সিস ভাবল দেখে আসি জঙ্গলটা কত বড়। ও কুড়ুল রেখে গাছের গুঁড়ি এড়িয়ে হাঁটতে লাগল।

বন শেষ। বনের বাইরে এল। ওকে দেখে দেহরক্ষীরা তরোয়াল উঁচিয়ে ছুটে

এল। ফ্রান্সিস দুহাত তুলে ওদের থামাল। তারপর জঙ্গলে ঢুকে পড়ল। কাজের জায়গায় এল।

—কোথায় গিয়েছিলে? ওঙ্গা জানতে চাইল।

—জঙ্গলটা দেখলাম। জঙ্গলের গাছ আর বেশী বাকি নেই। ফ্রান্সিস বলল।

—পালাতে চেয়েছিলে? ওঙ্গা বলল।

—না। ফ্রান্সিস মাথা নেড়ে বলল।

—সেই চেষ্টাও কোরো না। সাহেবকর্তার হুকুম কেউ পালাতে গেলে মেরে ফেলবে। বনের শেষে দেহরক্ষীরা আছে। ওঙ্গা বলল।

—জানি। ফ্রান্সিস বলল।

ফ্রান্সিস কাজে লাগল। হঠাৎ ওঙ্গা আর তার সঙ্গীর চিৎকারে ফ্রান্সিস ফিরে তাকাল। দেখল কোলা বনের মধ্যে দিয়ে ছুটে পূবমুখো যাচ্ছে আর ওঙ্গারা চিৎকার করে বলছে—পালাচ্ছে—পালাচ্ছে।

গাছের কাটা গুঁড়িতে পা লেগে কোলা মুখ থুবড়ে পড়ল। উঠে দাঁড়িয়ে আবার ছুটল। উঁচিয়ে থাকা গাছের গুড়ি দুপায়ে বেড়ি। কোলা জোরে ছুটতে পারছিল না।

ফ্রান্সিসও কোলার পেছনে পেছনে ছুটতে লাগল। চিৎকার করে বলতে লাগল—কোলা পালাবার চেষ্টা করো না। ফিরে এসো। কোলা—আ। কিন্তু কোলা ছুটে জঙ্গলের বাইরে চলে এল। ফ্রান্সিস দেখল চারজন দেহরক্ষী মধ্যে কোলা একজনকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে খোলা প্রান্তর দিয়ে ছুটল। কিন্তু পায়ে বেড়ি। ও আর কত জোরে ছুটবে? প্রান্তরের প্রায় মাঝামাঝি এসেছে দেহরক্ষীরা ওকে ধরে ফেলল। ছুটন্ত কোলার মাথায় এক দেহরক্ষী কোপ বসাল। অন্যজন ওর বুকে তরোয়াল বিঁধিয়ে দিল। কোলা ঘাসের ওপর গড়িয়ে পড়ল। ফ্রান্সিস চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে এই দৃশ্য দেখল। কোলা বারকয়েক এপাশ ওপাশ করে স্থির হয়ে গেল। ফ্রান্সিসের চোখে জল এল। বন্ধুরাও তখন ছুটে এসেছে। কিন্তু ওঙ্গা আর সঙ্গী দু'হাত ছড়িয়ে ওদের বনের বাইরে আস্তে দিল না।

—ফ্রান্সিস—শাঙ্কো অস্ফুটস্বরে ডাকল। ফ্রান্সিস ফিরে তাকাল। শাঙ্কো ওভাবেই বলল—এখন পালানো যায় না?

—পায়ে বেড়ি নিয়ে কত জোরে আর ছুটবে। দেখছো না কোলার কী অবস্থা হল। ফ্রান্সিস বলল।

দেহরক্ষীরা কোলার মৃতদেহ দুহাত ধরে টেনেহিঁচড়ে নিয়ে আসতে লাগল। উপস্থিত সবাই তখন স্তব্ধ। কোলার মৃতদেহ দেখে বন্ধুদের অনেকের চোখেই জল এল। শুধু ফ্রান্সিস অশ্রুরুদ্ধস্বরে বলল—আমি কোলাকে অনেকবার মানা করেছি। ও শুনল না।

বনের মধ্যে দিয়ে কোলার মৃতদেহ টেনে হিঁচড়ে দেহরক্ষীরা নিয়ে আসতে লাগল।

ওঙ্গা গলা চড়িয়ে বলল—আজকের মতো কাজ শেষ। ফিরে চলো সব!

কাদাটে ক্ষেতের ওপর দিয়ে কোলার মৃতদেহ টেনে হিঁচড়ে নিয়ে এল ওরা। কোলার দেহ কাদায় মাখামাখি।

মৃতদেহ এনে কয়েদঘরের সামনে ফেলে রাখা হল।

ফ্রান্সিসদের কয়েদঘরে ঢুকিয়ে দেওয়া হল। বাড়ির ভেতর থেকে কৃষ্ণকায়া পরিচারিকা এল। কিন্তু তাদের চোখেমুখে কোন দুঃখের চিহ্ন দেখা গেল না। কারণ ওরা এসব দেখে অভ্যস্ত।

কিছু পরে মারিয়া আর পাংলু এল। কোলার কাদামাখা মৃতদেহ দেখে পাংলু হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল। মারিয়াও দুচোখ দুহাতে চেপে কান্না থামাল।

ফ্রান্সিসদের খুব তাড়াতাড়ি প্রহরীরা কয়েদঘরে ঢুকিয়ে দিল। পাছে কোলার এই নির্মম মৃত্যু দেখে ফ্রান্সিসরা ক্ষেপে ওঠে।

কয়েদঘরে ঢুকে ফ্রান্সিস শুয়ে পড়ল। বার বার কোলার কথা মনে হতে লাগল। কোলার এই মৃত্যু ও মন থেকে মেনে নিতে পারছিল না। কী হত কোলাকে না মেরে যদি বাঁচিয়ে রাখা হত। ওকে তো কয়েদঘরেই বন্দী হয়ে থাকতে হত। কেন ওকে হত্যা করা হল?

গতরাতে ফ্রান্সিস অনেক রাত পর্যন্ত জেগে পালাবার ছক কষেছিল। এবার সেসব গুছিয়ে ভাবতে লাগল।

রাতের খাওয়া-দাওয়ার পর ফ্রান্সিস শাঙ্কোকে ডাকল। হ্যারি ওর পাশেই বসে। ফ্রান্সিস গলার স্বর নামিয়ে দেশীয় ভাষায় ওর পালানোর ছকের কথা বলতে লাগল। হ্যারি আর শাঙ্কো মাথা নীচু করে শুনতে লাগল।

সব শুনে হ্যারি মৃদুস্বরে বলল—সাবাস ফ্রান্সিস।

—তাহলে পার্তাদো ফেরার আগেই ছক কাজে লাগাবে? শাঙ্কো জানতে চাইল।

—সেটাই ইচ্ছে। কিন্তু পার্তাদো কবে ফিরবে ওঙ্গাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। ওঙ্গা বলতে পারল না। ফ্রান্সিস বলল।

—ঠিক। পালানোর রাতটা ঠিক কর। হ্যারি বলল।

—সেটাই ভাবছি। ফ্রান্সিস বলল।

—অনেক রাত হল। ঘুমিয়ে পড়। হ্যারি বলল।

তিনজনে শুয়ে পড়ল। শাঙ্কো ভাবল—ফ্রান্সিস অনেক দায়িত্ব দিল। পারবো? পরক্ষণেই ভাবলো—পারতেই হবে। এই ক্রীতদাসের জীবন থেকে মুক্তি চাই। যে কোন মূল্যে!

পরের দিন সকালে ফ্রান্সিসরা সবে সকালের খাবার খেয়েছে পার্তাদো এসে হাজির। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে পার্তাদো গলা চড়িয়ে বলল—কেমন আছো সব?

—একজন আপনার দেহরক্ষীর হাতে মারা গেছে। বাকিরা বেঁচে আছি। ফ্রান্সিস বলল।

—হ্যাঁ। ওঙ্গার কাছে সব শুনলাম। আমি তো বলেছি পালাবার চেষ্টা করবে না। ওটা করলে মরতে হবে। পার্তাদো বলল।

—যে ভাবে বেঁচে আছি। মরে যাওয়াই ভালো। হ্যারি বলল।

—না না। শুধু শুধু মরতে যাবে কেন? দেখছি তো—ভালোই আছো তোমরা। পার্তাদো একটু হেসে বলল।

কেউ কোন কথা বলল না। কোলার মৃত্যু দেখে সবাই রাগে ফুঁসছে। কিন্তু কথা বলা বৃথা। পার্তাদো ওদের মানুষ হিসেবে দেখে না। ক্রীতদাস হিসেবেই দেখে।

—আমি বলেছি তোমাদের মাংসটাংস দিতে—যাতে তোমরা গায়ে জোর পাও। পার্তাদো বলল।

এবার কেউ কোন কথা বলল না।

পার্তাদো চলে গেল।

—ফ্রান্সিস—পার্তাদো তো ফিরে এল। শাঙ্কো বলল।

—ঠিক আছে। ছক অনুযায়ী কাজ চলবে। ফ্রান্সিস বলল।

বল কাটা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে।

বিকেলে কাজের শেষে ফ্রান্সিসরা ফিরে আসছে। ফ্রান্সিস মৃদুস্বরে বলল—শাঙ্কো, দেহরক্ষীরা এখনও ফেরে নি। সবাইকে বলে রেখেছি। ওঙ্গা আর তার সঙ্গী দরজা দিয়ে ঢুকছে। কাজে লাগো।

তারপর বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে চাপাস্বরে বলল—সব সদর দরজায় চলো। একসঙ্গে।

সবাই বেশ ছুটেই সদর দরজার কাছে গিয়ে জড় হল। শাঙ্কো ততক্ষণে ভিড়ের মধ্যে দিয়ে খোলা দরজা দিয়ে বাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়েছে।

দেহরক্ষীরা তখনই ক্ষেতের ওপর দিয়ে ফিরে আসছিল। দূর থেকে ফ্রান্সিসদের জটলা দেখে ছুটে এল। তরোয়াল উঁচিয়ে ফ্রান্সিসদের সামনে এল ওরা। তখনও ওরা হাঁপাচ্ছে। একজন দেহরক্ষী এগিয়ে এল। বলল—কী ব্যাপার? তোমাদের তো কয়েদঘরে ঢোকার কথা। এখানে কী চাই?

—কর্তাসাহেবকে ডেকে দাও। কথা আছে। ফ্রান্সিস বলল।

—কর্তাসাহেব তোমাদের মত ক্রীতদাস নয় যে ডাকলেই আসবে। অন্য রক্ষীটি বলল।

—কিন্তু একটা দরকারি কথা ছিল। ফ্রান্সিস বলল।

—কী কথা। রক্ষীটি বলল।

—তোমাকে নয়। কর্তাসাহেবকে বলব। ফ্রান্সিস বলল।

—ঠিক আছে। আমাকে বলো। আমি কর্তাসাহেবের কাছে গিয়ে বলছি। রক্ষী বলল।

—তাহলে শোন। গত দুদিন যাবৎ বদ্যি আসছে না। আমাদের পায়ের ক্ষত এখনও শুকোয়নি। আরো ওষুধ চাই। ফ্রান্সিস বলল।

—বেশ। তোমরা কয়েদঘরে যাও। আমি গিয়ে বলছি। দেহরক্ষীটি বলল। তারপর ওরা বাড়ির ভেতরে চলে গেল।

ফ্রান্সিসরা কয়েদঘরে ফিরে এল। বিকেলের খাবার খেল। তখনই মারিয়া আর পাংলু এল। পাংলুর চোখমুখ দেখেই ফ্রান্সিস বুঝল পাংলু খুব কান্নাকাটি করেছে। ফ্রান্সিস মনে গভীর ব্যথা অনুভব করল। পাংলু চুপ করে একপাশে দাঁড়িয়ে রইল।

ফ্রান্সিস দেশীয় ভাষায় চাপাস্বরে বলল—মারিয়া আজ রাতে আমরা পালাবো। মারিয়া চমকে উঠল। একবার চারিদিক তাকিয়ে নিয়ে বলল—পারবে?

—আলবাৎ পারবো। এবার তোমাকে যা বলছি মন দিয়ে শোন। আজ রাতে ঘুমিয়ে পড়বে না। পাংলুকেও বলবে না ঘুমোতে। রাত গভীর হলে তোমরা দু'জনে সদর দরজার পেছনে এসে দাঁড়িয়ে থাকবে। তোমাদের অন্দরমহলে কোন প্রহরী থাকে?

—না। মারিয়া বলল।

—তারপর কান পেতে থাকবে বাইরে কুকুরের ডাক শোনার জন্য। ফ্রান্সিস বলল।

—এ বাড়িতে তো কুকুর নেই। মারিয়া বলল।

—দরকার নেই। কুকুরের ডাক শুনলেই দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে আসবে। দেখবে আমরা আছি। পাংলু দরজা বন্ধ করে অন্দরমহলে চলে যাবে। পাংলুকে সব বুঝিয়ে বলতে পারবে? ফ্রান্সিস বলল।

—অনেকদিন একসঙ্গে আছি। ইশারা ইঙ্গিতে পাংলু আমার কথা বোঝে। ওর কথাও আমি বুঝি। সেদিক থেকে কোন অসুবিধে হবে না। তবে একটা কথা বলছিলাম পাংলুকেও আমাদের সঙ্গে নিয়ে চলো না। পাংলুও তো মুক্তি চায়।

—পাংলুকে সঙ্গে নিলে সমস্যায় পড়তে পারি। ফ্রান্সিস বলল।

—আমি গেলে পাংলুও যেতে পারবে। আমার সঙ্গে থাকবে। কোনো বন্দরে ওকে নামিয়ে দিও। ওর সমস্যার সমাধান ওই করবে। মারিয়া বলল।

—বেশ। পাংলুকে বলো। ফ্রান্সিস বলল—যা বললাম ঠিক সেইমতো কাজ করবে। একটু এদিক ওদিক হলে জীবন সংশয় হবে।

—না-না। আমি আমার কাজ ঠিক পারবো। মারিয়া বলল।

—ঠিক আছে। আর একটা হাত বাঁধার কিছু দড়ি নিয়ে আসবে। অস্ত্র ঘরেই পাবে। ফ্রান্সিস বলল।

ওদিকে শাঙ্কো অস্ত্রঘরের দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে। কান পেতে সব শুনছে।

কিছুক্ষণ পর বাড়ির দরজা খোলার শব্দ হল। শাঙ্কো বুঝল কেউ ঢুকল। দেহরক্ষীরা ঢুকল। অস্ত্রঘরের দরজা খুলল। দরজায় দাঁড়িয়ে থেকেই

ডাঁইকারে রাখা তরোয়ালগুলোর ওপর ওদের তরোয়ালগুলো ছুঁড়ে ফেলল। ঝন্‌ঝনাৎ শব্দ হল। শাঙ্কো তখন দেয়ালে প্রায় সেঁটে আছে। চার দেহরক্ষী চলে গেল। ঘরে ঢুকল না। ঘরে একটা মাত্র মশাল জ্বলছে। শাঙ্কোও ছায়ার মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে। ঘরে ঢুকলেও ওরা শাঙ্কোকে দেখতে পেত না। একটু পরেই সদর দরজার কাছে হালকা পায়ের শব্দ শোনা গেল। শাঙ্কো বুঝল মারিয়া আর পাংলু ফিরে এল। পাংলু দরজা বন্ধ করে দিল।

শাঙ্কো কিছুক্ষণ নিঃশব্দে অপেক্ষা করল। তারপরে আস্তে আস্তে কোন শব্দ না করে পাঁচটা তরোয়াল তুলে নিল। বগলে চেপে ধরল। তারপর পায়ের বেড়ি চেপে ধরে দরজার কাছে গেল। কিছু শব্দ না করে বসে বসে আস্তে আস্তে যাওয়ার জন্যে ওর সময় লাগল।

নিঃশব্দে দরজা খুলল। বাইরে বেরিয়ে এল। তারপর যতটা সম্ভব দ্রুত দেবদারু গাছগুলোর দিকে ছুটে গেল। সদর দরজার দুপাশেই লম্বালম্বা দেবদারু গাছ জায়গাটাকে বেশ অন্ধকার করে রেখেছে।

শাঙ্কো একটা একটা করে তরোয়াল যতটা সম্ভব দ্রুত দেবদারু গাছগুলোর আড়ালে লুকিয়ে রাখল। তারপর ওখান থেকে বেরিয়ে কয়েদঘরের দিকে চলল। কয়দঘরের সামনে প্রহরীরা তখন এদিক ওদিক ছুটোছুটি করছে। শাঙ্কো বুঝল ওকে খোঁজা হচ্ছে।

শাঙ্কো কয়েদঘরের আলোর কাছে এসে দাঁড়াল। প্রহরীরা ভূত দেখার মতো লাফিয়ে উঠল। একজন প্রহরী তরোয়াল খুলে শাঙ্কোর কাছে ছুটে এল। বলল—গুনতে গিয়ে দেখি একজন কম। কোথায় গিয়েছিলে তুমি?

—প্রস্রাব করতে। শাঙ্কো নির্বিকার মুখে বলল।

—কয়েদঘরে করলেই পারতে। প্রহরী বলল।

—ভীষণ পেয়েছিল। যাক গে—আমি তো এসে গেছি।

—ভেতরে ঢোক। প্রহরী গম্ভীরগলায় বলল।

শাঙ্কো কোন কথা না বলে ফ্রান্সিসদের কাছে এল। প্রহরীরা তখনও দরজায় দাঁড়িয়ে। ফ্রান্সিস কোন কথা বলল না। মৃদুস্বরে বলল—ছকমতো কাজ হয়েছে? শাঙ্কো মৃদু হেসে বলল—পাঁচটা তরোয়াল—দেবদারু গাছের আড়ালে। ফ্রান্সিসও মৃদুস্বরে বলল—সাবাস।

রাতের খাওয়ার পর পরিবেশক চলে গেল। ফ্রান্সিস দরজার কাছে গেল। দরজা দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখল—প্রহরীরা একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে। ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়িয়ে চাপা গলায় বলতে লাগল—ভাইসব—পালাবার ছক প্রত্যেককে বলেছি। সবাইকে সেইমতো কাজ করতে হবে। কোনরকম ভুল যেন না হয়। এবার সবাই শুয়ে পড়। কিন্তু কেউ ঘুমিয়ে পড়বে না। ছক ঠিকমতো খাটলে আমাদের বহু আকাঙ্ক্ষিত মুক্তি। কাজ অনেকদূর এগিয়েছে। এবার শেষ কাজটা বাকি।

রাত গভীর হতে লাগল। কয়েদঘর নিঃস্তব্ধ। বেশ গভীর রাতে ফ্রান্সিস মৃদু স্বরে ডাকল—শাঙ্কো। শাঙ্কো কাছেই ছিল। বলল—বলো।

—সেই পুরনো কায়দাটাই কাজে লাগাতে হবে। সেই পেটব্যথা। প্রহরীদের ঘরে ঢোকানো। বন্দী করা শুরু কর। ফ্রান্সিস বলল।

হঠাৎ শাঙ্কো চাপা চিৎকার শুরু করল। প্রায় সবাই উঠে পড়ল। শাঙ্কো বিছানার ওপর এপাশ ওপাশ করতে লাগল আর গোঙাতে লাগল। প্রহরী দু'জন ছুটে দরজার কাছে এল। ওরা বুঝে উঠতে পারল না কী করবে।

বিস্কো উঠে দরজার কাছে গেল। বলল—শিগগির বদ্যি ডাকো। আমাদের এক বন্ধু পেটের ব্যথায় মারা যাচ্ছে।

—এত রাতে বদ্যি কোথায় পাবো? একজন প্রহরী বলল।

—তাহলে বন্ধুটি কি মারা যাবে? বিস্কো বলল।

অন্য প্রহরীটি বলল—ও কিছুক্ষণ পরেই ঠিক হয়ে যাবে।

—ঠিক আছে। একবার এসে তো দেখ বন্ধুর অবস্থাটা।

তখনও শাঙ্কোর গোঙানি চলছে।

—দেখি তো কী ব্যাপার? চলো। একজন প্রহরী বলল।

দরজা খুলে একজন প্রহরী ঢুকল। অন্যজন দরজা ভেজিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। ফ্রান্সিস মৃদুস্বরে বলল—ঢুকল। শাঙ্কো সঙ্গে সঙ্গে গলার কাছ দিয়ে হাত ঢুকিয়ে ছোরাটা বের করে ছোরাসুদ্ধ হাতটা পিঠের নীচে রাখল। প্রহরীটি শাঙ্কোর মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ল। শাঙ্কো সঙ্গে সঙ্গে ছোরাটা ওর বুকে ঠেকাল। দাঁতচাপা স্বরে বলল—চুপ করে থাকো। চিৎকার করেছো কি মরেছো। দরজায় দাঁড়ানো প্রহরীটি বুঝল কিছু গণ্ডগোলে ব্যাপার। ও খাপ থেকে তরোয়াল খুলে ছুটে ঘরে ঢুকল। বিস্কো তৈরীই ছিল। সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গিয়ে প্রহরীটির পেটে জোর টুঁ মারল। প্রহরীটি দেয়ালের গায়ে গিয়ে পড়ল। হাত থেকে তরোয়াল ছিটকে গেল। দেয়ালে মাথা ঠুকে গেল। ও মেঝেয় বসে পড়ল।

হ্যারি ফ্রান্সিসের নির্দেশমত ওর কোমরের ফেট্টি খুলে ছিঁড়ে ছিঁড়ে লম্বা ফিতের মতো করে রেখেছিল। হ্যারি সেসব বের করল। শাঙ্কো একজন প্রহরীর হাত বাঁধল ঐ ফিতে দিয়ে। ফ্রান্সিস তার মুখ চেপে ফিতে বাঁধল। প্রহরীটি গোঁ গোঁ করতে লাগল। শাঙ্কো ওর গালে জোরে এক থাপ্পড় মারল। প্রহরীটির গোঁ গোঁ বন্ধ হল। অন্যটিরও হাত মুখ বাঁধা হল।

কয়েদঘরের দরজা খোলা।

মুক্তি।

ফ্রান্সিস চাপা স্বরে বলল—আস্তে।

আস্তে আস্তে সবাই কয়েদঘর থেকে বেরিয়ে এল।

সদর দরজার মাথায় মশাল জ্বলছে। মশালের আলোর বাইরে এসে ওরা অন্ধকারে দাঁড়াল। শাঙ্কো দেবদারু গাছের নীচে ঢুকল। তরোয়ালগুলো বের

করে নিল। ফ্রান্সিস চাপা স্বরে বলল—কুকুরের ডাক। শাঙ্কো মুখের সামনে হাতের তালু রেখে ডেকে উঠল—ভৌ—ভৌ।

খট্ করে সদর দরজা খুলে গেল। মারিয়া আর প্যাংলু বেরিয়ে এল। ওদের সঙ্গে যোগ দিল।

—গেট এর দিকে ছোটো। দু'পা ফাঁক করে ছুটতে হবে। তাহলে বেড়িতে বেড়িতে লেগে শব্দ হবে না। ফ্রান্সিস চাপা স্বরে বলল।

মারিয়া হাত বাঁধার দড়ির টুকরোগুলো হ্যারিকে দিল।

দেউড়ির দুপাশে মশাল জ্বলছে। সেই আলোতে ফ্রান্সিস দেখল তিনজন প্রহরী পাহারা দিচ্ছে।

—তাড়াতাড়ি দেউড়ির সামনে চল। ফ্রান্সিস চাপাস্বরে বলল।

দেউড়ির সামনে মশালের আলোয় প্রহরীরা অবাক। ওরা হকচকিয়ে গেল। তরোয়ালও বের করতে পারল না। ফ্রান্সিস একজনের বুকে তরোয়াল ঠেকিয়ে বলল—দরজা খুলে দাও। নইলে মারবে। শাঙ্কো আর বিস্কো অন্য দুটি প্রহরীর বুকে তরোয়াল চেপে ধরেছে। ফ্রান্সিস যার বুকে তরোয়াল চেপে ধরেছিল তার কোমরেই ঝুলছিল চাবির গোছা। সে চাবি বের করতে লাগল। ফ্রান্সিস বলল—দুটোর হাত মুখ বাঁধো। হ্যারি দড়ি এগিয়ে দিল। শাঙ্কো দ্রুত হাতে একজনের হাত বাঁধল। ফিতে কাপড় দিয়ে মুখ বাঁধল। অন্যজনকে বিস্কো বাঁধল। তারপর দুজনকেই ধাক্কা দিয়ে মাটিতে ফেলে দিল। দুজনের মুখ দিয়েই গোঁ গোঁয়ানির শব্দ বেরিয়ে এল। শাঙ্কো ওদের গলায় তরোয়ালের মুখ ঠেকিয়ে বলল—গোঁ-গোঁ বন্ধ কর। নইলে মরবে। ওদের গোঁ গোঁ বন্ধ হল।

ততক্ষণে চাবিওয়ালা প্রহরী তালা খুলে দিয়েছে। সবাই দেউড়ি দিয়ে বেরিয়ে এল। শুধু শাঙ্কো চাবিওয়ালার হাতমুখ বেঁধে একটু পরে এল।

সদর রাস্তায় এসে ফ্রান্সিস চাপা স্বরে বলল—যতটা দ্রুত সম্ভব ছোটো। কামার শালার পেছনে লুকোবো।

সবাই যতটা সম্ভব জোরে ছুটল। কামারশালার সামনে পৌঁছতে পেছনে প্রহরীদের চিৎকার চেঁচামেচি শুনল।

ওরা কামারশালার পেছনে গিয়ে লুকোল। ফ্রান্সিস কামারশালার ঘরের আড়াল থেকে পেছনে তাকাল। দেখল খোলা তরোয়াল হাতে চারজন দেহরক্ষী ছুটে আসছে।

ওরা কামারশালা ছাড়িয়ে ছুটতে ছুটতে জাহাজঘাটের দিকে চলে গেল। ওরা জানে ফ্রান্সিসরা জাহাজে চড়ে পালাবার চেষ্টা করবে।

এতগুলো লোক। ফিস্‌ফাস্ কথাবার্তাও চলছিল। কামারের ঘুম ভেঙে গেল। সে দরজা খুলে বেরিয়ে এল। ফ্রান্সিস সঙ্গে সঙ্গে ওর বুকে তরোয়াল ঠেকাল। দাঁতচাপাস্বরে বলল—

—একটি কথাও বলবে না। আমাদের পায়ের বেড়ি খুলে দাও।

—ঠিক আছে। দিচ্ছি। কিন্তু এতজনের বেড়ি—

—আরো কয়েকজন কামারকে ডাকো। ফ্রান্সিস একইভাবে বলল।

—আমার তিন ছেলেই পারবে। ওদের ডাকি। কামার বলল।

—কিন্তু আস্তে। কোন শব্দ করবে না। ফ্রান্সিস বলল।

কামার ওর ঘরে ঢুকল। আস্তে ডাকাডাকি করল। কামার বেরিয়ে এল। তিন ছেলেও এল। ওরা ফ্রান্সিসদের দেখে অবাক। ফ্রান্সিসরা আবার বলল—কেউ কোন শব্দ করবে না।

কামাররা আগুন জ্বালল। আগুনে লোহার শাবলমতো লোহা ঢোকাল। হাপড় টানতে লাগল।

কিছুপরে সেই আগুন লাল লোহার মুখ দিয়ে পায়ের বেড়ি কাটা শুরু হল। ফ্রান্সিস বলল—দেহরক্ষীরা পিছু ধাওয়া করছে। ওদের সঙ্গে লড়তে হবে। কাজেই আমি শাঙ্কো বিস্কোর আর হ্যারি আগে বেড়ি কাটিয়ে নিচ্ছি।

বেড়ি কাটা শুরু হল। কিছুক্ষণের মধ্যে পাঁচজনের বেড়ি কাটা হয়ে গেল। আগুন মুখ লোহার আঁচে তখনও ফ্রান্সিসদের পা দপ্‌দপ্‌ করছে। তবু বেড়ি থেকে মুক্তি। অন্যদের বেড়ি কাটা চলল।

ওদিকে দেহরক্ষীরা জাহাজঘাটে পৌঁছল। কিন্তু ফ্রান্সিসদের চিহ্নমাত্র নেই। কোথায় পালালো সব? একজন বলল—নিশ্চয়ই ওদের জাহাজে লুকিয়ে আছে। কিন্তু কোনটা ফ্রান্সিসদের জাহাজ তা বুঝল না। পার্তাদোর বাহারি জাহাজটা জলে ভাসছিল। ওরা সেই জাহাজে উঠল। ঘুমন্ত চালককে তুলল। একজন বলল—ক্রীতদাসরা পালিয়েছে। এদিকেই এসেছে। ওদের জাহাজ কোনটা? চালক আঙুল তুলে ফ্রান্সিসদের জাহাজটা দেখাল।

দেহরক্ষীরা ফ্রান্সিসদের জাহাজের কাছে এল। পাটাতন পাতা নেই। একজন জলে নামল। সাঁতার দিয়ে ফ্রান্সিসদের জাহাজের কাছে গেল। হালের কাছে দড়িদড়া ধরে জাহাজে উঠল। ডেক-এ এল। ডেক জনশূন্য। ও পাটাতন টেনে আনতে লাগল। কিন্তু দারুণ ভারি পাটাতন। আনতে সময় লাগল। বেশ কষ্ট করে পাটাতন পাতল। বাকি তিনজন উঠে এল।

ওরা তরোয়াল হাতে সিঁড়ি দিয়ে কেবিনঘরগুলোর কাছে এল। কেবিনঘর, রান্নাঘর খুঁজে দেখল। কেউ নেই। তাহলে ওরা গেল কোথায়? বেশিদূর তো যেতে পারেনি। পায়ের বেড়ি নিয়ে আর কত জোর ছুটবে?

তখনই একজন বলল—ওরা নিশ্চয়ই কামারশালায় গেছে। বেড়ি কাটতে।

—ঠিক। আর একজন বলল।

ওরা কামারশালার দিকে চলল।

কামারশালার কাছে এসে হাঁপর টানার শব্দ শুনল। তাহলে বেড়ি কাটার কাজ চলছে।

ফ্রান্সিস কামারশালার আড়াল থেকে নজর রেখেছিল। রক্ষীদের দেখল।

—তুম্বা কী করে? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—তুম্বার কাজই হল যেসব জাহাজ বন্দরে আসে তাই থেকে যুবকদের লোভ দেখিয়ে কেদিয়ার বাড়িতে নিয়ে আসা পেট ভরে খাওয়ান। বলে এখানে চাষের কাজ করলে দুমাসে তোমরা বড়লোক হয়ে যাবে। জাহাজে কাজ করে কী পাও? বৃদ্ধ বলল।

—তারপর? ফ্রান্সিস আগ্রহী হল।

তারপরেই তাদের বন্দীঘরে বন্দী করে রাখা হয়। প্রচুর খাওয়া-দাওয়া আদরযত্ন চলে। কিন্তু বন্দী হয়েই থাকতে হয়। বাইরে বেরোবার উপায় নেই। কড়া পাহারা। বৃদ্ধ বলল।

—তারপর তাদের চাষের কাজে লাগায়। ফ্রান্সিস বলল।

—ঠিক। সারাদিন ক্ষেতের কাজ করায়। খাওয়াও আর আগের মতো দেওয়া হয় না। বড়লোক হওয়ার স্বপ্ন মিলিয়ে যায়। বৃদ্ধ বলল।

—এ তো ক্রীতদাসেরই জীবন। ফ্রান্সিস বলল।

—সত্যিই তাই। বৃদ্ধ মাথা ঝাঁকিয়ে বলল।

—অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। ফ্রান্সিসরা ফিরে এল।

জাহাজে এসে ফ্রান্সিস হ্যারি বিস্কো আর কয়েকজন বন্ধুকে ডাকল। যা খবর এনেছে বলল। তারপর বলল—যা বুঝতে পারছি আমাদের বন্ধুরা প্রায় ক্রীতদাস হয়ে আছে। হয় কেদিয়া বা অন্য কোন জমিদারের বাড়িতে। এবার খোঁজখবর নিতে হবে। রাতে আমি আর শাঙ্কোই যাবো খোঁজখবর নিতে।

—মনে হয় কেদিয়ার বাড়িতেই ওদের পাবো। হ্যারি বলল।

—আমারও তাই মনে হয়। যারা চাষ করছিল তাদের এতদূর থেকে দেখেছি চিনতে পারিনি। কেদিয়াই বোধহয় এখানকার সবচেয়ে বড় জমিদার। অঢেল জমি। মনে হয় তার বাড়িতেই বন্ধুরা বন্দী হয়ে আছে। তুম্বাই ওদের ভুল বুঝিয়ে নিয়ে গেছে। কেদিয়ার বাড়িটাই আগে দেখতে হবে। ফ্রান্সিস বলল।

সেদিন রাতে খাওয়ার পর ফ্রান্সিস শুয়ে পড়ল। বিশ্রাম করতে লাগল।

কিছুপরে দরজায় টোকার শব্দ। ফ্রান্সিস উঠে পড়ল।

—কোথায় যাচ্ছো? মারিয়া জিজ্ঞেস করল।

—বন্ধুদের খোঁজে। ফ্রান্সিস বলল।

এত রাতে। এই বিদেশ। কোন বিপদআপদ—

—হতে পারে। তবে সাবধানে থাকবো। ফ্রান্সিস বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। দরজা খুলল। শাঙ্কো দাঁড়িয়ে।

দুজনে জাহাজ থেকে নেমে এল। রাস্তা ধরে চলল কেদিয়ার বাড়ির দিকে।

রাস্তা জনশূন্য। চাঁদের আলো উজ্জ্বল। দুজনে হাঁটতে লাগল।

কেদিয়ার বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল।

বিরাট বাড়ি। ফ্রান্সিসরা বাড়ির পেছন দিকে এল। দেখল একটা লম্বাটে

—তাহলে তো সোনার মণ্ড সোনার খনি এই ভাঙা দুর্গের নীচেই রয়েছে? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—হ্যাঁ। সেই স্বর্ণখনিই খুঁজে বের করতে হবে। রাজা অ্যালবার্টের গুপ্ত ধনভাণ্ডার বলে কিছু নেই। সামুছা বললেন।

—আশ্চর্য! আমরা তো ধনভাণ্ডারের কথাই শুনেছি। ফ্রান্সিস বলল।

—ওটাই প্রচলিত গল্প। আমি স্বর্ণখনির কথা কাউকে বলিনি। তোমাদেরই প্রথম বললাম সামুছা।

ফ্রান্সিস মাথা নীচু করে কিছুক্ষণ ভাবল। তারপর মাথা তুলে বলল—স্বর্ণখনি সম্পর্কে রাজা অ্যালবার্ট তাঁর বইতে কিছু লিখেছেন?

—না। যা বললাম শুধু সেইটুকু। সামুছা বললেন।

—ঠিক আছে। কালকে সকাল থেকে আমি কাজ শুরু করবো। ফ্রান্সিস বলল।

—লোকজনের দরকার হলে বলবেন। সামুছা বললেন।

—না। আমার বন্ধুদের সাহায্য নেব। সমস্ত ভাঙা দুর্গটা ভালোভাবে দেখতে হবে। ফ্রান্সিস বলল।

পরের দিন সকাল থেকেই ফ্রান্সিস হ্যারি আর শাঙ্কো কাজে নেমে পড়ল। ওরা ঘুরে ঘুরে ভাঙা দুর্গটা দেখতে লাগল। কোথাও কোথাও পাথর আলগা বলে ফ্রান্সিসরা বারকয়েক আলগা পাথরে পা রেখে হড়কে যাচ্ছিল। কোথাও পায়ের চাপে আলগা পাথর নীচে গরগর করে গড়িয়ে গেল। অগত্যা সাবধানে পা ফেলে ফেলে ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল।

তখনই সামুছা এলেন। ফ্রান্সিসরা তখন দূর্গের ভাঙা ছাদে দাঁড়িয়ে। সামুছা গলা চড়িয়ে বললেন—পূবদিকে যাবেন না। ওখানে সব আলগা পাথর। গড়িয়ে নীচে পড়ে যাবেন।

ফ্রান্সিসরা পূবদিকে গেল না। অন্য দিকগুলো ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল।

—ভাঙা দূর্গের দেওয়াল যেমন হয়। ভাঙা পাথরের স্তূপ। এটাও তেমনি নতুনত্ব কিছু নেই। শাঙ্কো বলল।

—হুঁ। ফ্রান্সিস মুখে শব্দ করল। তারপর বলল—বোঝা যাচ্ছে—অনেকগুলো ঘর ছিল আর বেশ বড় বড় ঘর। একটা লম্বাটে ঘর দেখলাম। তার দেওয়ালে এখনও কয়েকটা কড়া ঝুলছে। তার মানে কয়েদঘর। রাজা অ্যালবার্ট শাস্তির ব্যবস্থাও রেখেছিলেন।

ওরা ভাঙা দূর্গ থেকে নেমে এল।

—তাহলে দেখলেন সব। সামুছা বললেন।

—হ্যাঁ। তবে প্রাথমিকভাবে। এবার ঘরগুলো দেখতে হবে। আমাদের দেখতে হবে মেঝে। খনি ওপরে থাকে না। ফ্রান্সিস বলল।

—তা ঠিক। যাক গে এখন আর জাহাজে ফিরে যাবেন না। আমি এখানেই আপনাদের খাওয়ার ব্যবস্থা করছি। সামুছা বললেন।

গলা বাড়িয়ে বলল—শাঙ্কো, বিস্কো তোমরা এসো। ওরা এসেছে। একটাকেও ছাড়বে না। সব কটাকেই হত্যা করবে। কোলাকে ওরা নির্মমভাবে হত্যা করেছিল। বদলা নিতে হবে।

ফ্রান্সিস দ্রুত ছুটে গিয়ে একজন রক্ষীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। রক্ষীরা এত দ্রুত আক্রমণ আশা করেনি। পায়ে বেড়ি নেই। এখন পায়ের ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে না। ফ্রান্সিস সেই রক্ষীর তরোয়ালে এত জোরে ঘা মারল যে রক্ষীর তরোয়াল ছিটকে গেল। খালি হাতে ও বোকার মতো দাঁড়িয়ে রইল। ফ্রান্সিস একমুহূর্তও দেরি করল না। সোজা ওর বুকে তরোয়াল বিঁধিয়ে দিল। তারপর তরোয়ালটা টেনে খুলে নিল। রক্ষীটি গড়িয়ে রাস্তার পাশের ঝোপে পড়ে গেল।

অন্য তিনজনের সঙ্গে তখন শাঙ্কোরা লড়াই চালাচ্ছে। পায়ে বেড়ি নেই। ওরা স্বচ্ছন্দে লড়াই চালাচ্ছে। শুধু হ্যারিই পারছিল না। তরোয়ালের ডগা লেগে ওর জামা জায়গায় জায়গায় কেটে গেছে।

ফ্রান্সিস লাফিয়ে গিয়ে হ্যারিকে আড়াল করে দাঁড়াল। শুরু হল তরোয়ালের লড়াই। ফ্রান্সিস ভাবল একে হত্যা করতেই হবে। ও সাবধানে তরোয়াল চালাতে লাগল আর সুযোগের অপেক্ষা করতে লাগল।

হঠাৎ ফ্রান্সিস ঐ রক্ষীটির পেছন দিকে তাকিয়ে গলা চড়িয়ে বলে উঠল—মারো একে। রক্ষীটি পেছনে ফিরে তাকাল। ফ্রান্সিস এই সুযোগই খুঁজছিল। আর দেরি করল না। রক্ষীটির গলায় তরোয়াল ঢুকিয়ে দিল। রক্ষীটি রাস্তার ওপর গড়িয়ে পড়ল। আর উঠল না।

অন্য রক্ষীটি একজন সঙ্গীদের এভাবে মরতে দেখে ভয় পেয়ে গেল। সে তরোয়াল ফেলে পার্তাদোর বাড়ির সদর গেট-এর দিকে ছুটল। বাকি একজনকে ফ্রান্সিস আর শাঙ্কো মিলে হত্যা করল।

হাঁপাতে হাঁপাতে ফ্রান্সিস মৃদুস্বরে বলল—কোলা—তোমাকে হত্যার বদলা নিলাম। তবে একটা বেঁচে গেল।

কামারশালায় তখন সকলেরই পায়ের বেড়ি কাটা হয়ে গেছে।

শাঙ্কো কোমরের ফেট্টি থেকে একটা সোনার চাকতি বের করে কামারকে দিল। কামার খুব খুশি। এর আগেও বেড়ি কেটেছে। কিন্তু সোনা পায়নি। সবাই জাহাজঘাটের দিকে চলল। জাহাজঘাটে যখন পৌঁছল তখন ভোর হয়ে এসেছে।

পাটাতন পাতাই ছিল। সবাই একে একে জাহাজে উঠল।

ডেক-এ উঠে ফ্রান্সিস ডেক-এর ওপর শুয়ে পড়ে ডেক-এ চুমু খেল। ওদের সুখদুঃখের সঙ্গী জাহাজটাকে আবার পাওয়া গেছে।

ফ্রান্সিসের দেখাদেখি ওর বন্ধুরাও শুয়ে পড়ে ডেক-এ চুমু খেল।

এবার ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে বলল—জাহাজ চালাও। এক মুহূর্তও দেরি নয়। পালা খাটাও। কয়েকজন দাঁড়ঘরে চলে যাও। দাঁড় বাও। জাহাজের গতি বাড়াও।

শাঙ্কো হুইল ধরো। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দূরে যেতে হবে।

সবাই কাজে লেগে গেল। নোঙর তোলা হল। জাহাজ চলল। কিছুক্ষণের মধ্যেই জোর গতি পেল। পালগুলো ফুলে উঠল। জাহাজ চলল দক্ষিণমুখো।

নিজের পরিচিত কেবিনঘরে ঢুকেই মারিয়া মাথার কাছে কাঠের দেয়ালের কাছে গেল। কাঠ ফাঁক করে দেখল সোনার চাকতিগুলো রয়েছে। কাঠ চেপে ফাঁক বন্ধ করে দিল। পাংলুও ঘরে ছিল। কিছু বুঝল না মারিয়া ওভাবে ছুটে গেল কেন? কী দেখল? পাংলু কাঠের মেঝেয় বসল।

ফ্রান্সিস ঢুকল। সোজা বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ল। মারিয়াও বিছানার একপাশে বসল। মৃদুস্বরে বলল—

—তোমার পায়ের অবস্থা কী?

—অনেকটা সেরে গেছে। দিনকয়েকের মধ্যেই সেরে যাবে। বেড়ির ঘষা তো আর লাগছে না। ফ্রান্সিস মৃদু স্বরে বলল।

দরজায় আঙুল ঠোকার শব্দ হল। পাংলু উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিল। হ্যারি শাঙ্কো আর একজন বন্ধু ঘরে ঢুকল।

হ্যারি বলল—ফ্রান্সিস জাহাজ দক্ষিণদিকে চালাতে বললে কেন? দেশে যেতে হলে তো উত্তরদিকে জাহাজ চালাতে হবে।

—না। রেজিল বন্দরে নেমে যাবো। বাকি বন্ধুরা কী অবস্থায় আছে কে জানে। ওদের তো সঙ্গে নিতে হবে। ফ্রান্সিস বলল।

—তা ঠিক। বন্ধুদের নিয়ে তো দেশে ফিরবে? শাঙ্কো বলল।

—না। ফেরার পথে আমারগো বন্দরে নামবো। ওখান থেকে কিছুদূরে রাজা আলফ্রেডের গুপ্ত ধনভাণ্ডার খুঁজে বের করবো।

—আবার? প্রায় চেঁচিয়ে উঠল মারিয়া।

ফ্রান্সিস হেসে বলল—হ্যাঁ। আবার। তারপর উত্তরমুখো—দেশে।

—কিছু বলার নেই। তুমি যা ভালো বোঝ। মারিয়া গোমড়ামুখে বলল।

হ্যারিরা চলে গেল। রেজিল বন্দর লক্ষ্য করে জাহাজ চলল।

জাহাজ আমারগো বন্দরে ভিড়ল। জাহাজ নোঙর করল।

তিনজন কৃষ্ণকায় ফ্রান্সিসের কাছে এল। আকারে ইঙ্গিতে বলল—আমরা এখানেই নেমে যাবো।

—বেশ তো। ফ্রান্সিস বলল।

—পুরনো মনিবের কাছেই থাকবে বলছে। মারিয়া বলল।

—ও যা চাইবে তাই হবে। আমিও ওর পুরনো মনিব সামুছার কাছে আসবো। সামুছার সাহায্য না পেলে কিছুই করতে পারবো না। ফ্রান্সিস বলল।

পাংলু আর কৃষ্ণকায় তিনজন নেমে গেল। পাংলুর জন্য মারিয়ার মন খারাপ হয়ে গেল। অনেকদিন একসঙ্গে ছিল। পাংলুর ওপর কেমন একটা মায়া পড়ে গিয়েছিল।

জাহাজ চলল।

পনেরো কুড়িদিন পর জাহাজ রেজিল বন্দরে পৌঁছল। বন্দরে ব্যস্ত জীবন। দোকানে বাজারে ভিড়।

ফ্রান্সিস বলল—শোন—দেরি করা চলবে না। এক্ষুনি বন্ধুদের খোঁজে বেরোতে হবে। প্রথমে শাঙ্কো আর আমি যাচ্ছি।

ফ্রান্সিস ও শাঙ্কো পাটাতন দিয়ে নেমে এল। এদিক ওদিক ছোট ছোট বাড়িঘর। সেসব ছাড়িয়ে বেশ কিছুটা আসতে দেখল একটা বড় বাড়ি। বোঝাই যাচ্ছে বেশ অর্থব্যয় করে বাড়িটা তৈরী। কোন বড় জমিদারের বাড়ি হবে।

বাড়ির সামনেই অনেকদূর পর্যন্ত গমের ক্ষেত। একটা নয়, পরপর কয়েকটা। ক্ষেতের চারপাশে সশস্ত্র প্রহরী। ক্ষেতে চাষের কাজ চলছে।

ফ্রান্সিস ক্ষেতের সীমার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। একজন প্রহরী খাপ থেকে তরোয়াল খুলে ছুটে এল। গম্ভীর গলায় বলল—কী চাই?

—কিছু না। দেখছিলাম—চাষীদের মধ্যে আমার বন্ধুরা আছে কি না। ফ্রান্সিস বলল।

—তুমি তো বিদেশি।

—হ্যাঁ। আমার বন্ধুরাও তো বিদেশি। ফ্রান্সিস বলল।

—হ্যাঁ কিছু বিদেশি আছে চাষীদের মধ্যে। প্রহরী বলল।

—বিদেশি আছে। ফ্রান্সিস চমকে উঠল। বলল—তাদের একজনকে ডেকে দেবে।

—আমি তোমার ক্রীতদাস? হুকুম করলেই শুনবো। প্রহরী বলল।

—চাষীরা কি ক্রীতদাস? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—না। তবে ক্রীতদাসের মতোই। পায়ে বেড়ি নেই। কিন্তু বন্দী। পালাবার পথ বন্ধ। প্রহরী বলল।

—কোথায় রাখা হয় ওদের? ফ্রান্সিস বলল।

—তোমার অত প্রশ্নের জবাব দিতে পারবো না। ভুরু মোটা প্রহরীটি বলল—যাও। রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াও।

ফ্রান্সিস ক্ষেতের সীমা থেকে সরে এল। বুঝল বেশী কিছু জানা যাবে না। তবে বন্ধুরা এখানে বন্দী হয়ে থাকতে পারে। অন্তত সম্ভাবনা আছে।

ফেরার পথে ফ্রান্সিস দেখল একটা বাড়ির বারান্দায় একজন বৃদ্ধ দাঁড়িয়ে আছে।

ফ্রান্সিস বৃদ্ধের দিকে এগিয়ে গেল। কাছে গিয়ে বলল—দেখুন, আমরা বিদেশি। এই রেজিল বন্দর এলাকা আমরা চিনি না। এখানকার বড় বড় জমিদারেরা কি চাষাবাদের জন্যে ক্রীতদাস রাখে?

—কী বলবো? ঐ জমিদার কেদিয়া এখানকার রাজা বললেই হয়। কার সাধ্য ওর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনে। বৃদ্ধ বলল।

কাঠের ঘর। একেবারে ওপরে দুটি জানলামত। ফ্রান্সিস মৃদুস্বরে বলল—শাঙ্কো—এটাই বন্দীঘর।

ফ্রান্সিস কাঠের দেওয়ালের কাছে গেল। চাপাস্বরে ডাকল—ফ্লেজার—সিনাত্রা। ঘরের ভেতরে কোন সাড়াশব্দ নেই। বেশি জোরে ডাকতে সাহস পাচ্ছে না। নিশ্চই ঘরের প্রহরী আছে। আবার বার দুয়েক ডাকল—ফ্লেজার—ভেন। ঘরের ভেতর থেকে কোন শব্দ শোনা গেল না।

—দাঁড়াও। কাঠের দেয়াল ফুটো করছি। শাঙ্কো বলল। তারপর গলা দিয়ে হাত ঢুকিয়ে ওর ছোরাটা বের করল। কাঠের দেয়ালে ছোরা চেপে ঘোরাতে লাগল। শক্ত কাঠ। তবু শাঙ্কো হাল ছাড়ল না। ছোরা ঘোরাতে ঘোরাতে সত্যিই একটা ফুটো মত হল। সেই ফুটোয় মুখ চেপে ফ্রান্সিস গলা চেপে ডাকল—ফ্লেজার—সিনাত্রা—ফ্লেজার। ভেন—ভেন।

একটু পরে ঘরের ভেতরে নড়াচড়ার শব্দ পেল। কেউ যেন উঠে এল। ফুটোয় মুখ চেপে ফ্রান্সিস বলল—এইখানে এসো। এখানে ফুটো।

যে উঠেছিল সে ফুটোর কাছে এগিয়ে এল। ফুটোয় মুখ রেখে বলল—কে? ফ্লেজারের গলা। ফ্রান্সিস শাঙ্কোর দিকে তাকিয়ে হাসল। শাঙ্কোও হাসল।

এবার ফ্রান্সিস ফুটোয় মুখ রাখল। বলল—

—আমি ফ্রান্সিস। সঙ্গে শাঙ্কো। তোমরা কী বন্দী?

—হ্যাঁ। আমাদের দিয়ে চাষের কাজ করায়। ফ্লেজার বলল।

—জানি। ফ্রান্সিস বলল। ও বুঝল ফুটোর কাছে এসে কয়েকজন দাঁড়িয়েছে।

—আর দু'একদিন অপেক্ষা কর। তোমাদের মুক্তির ব্যবস্থা করছি। ততদিন চুপচাপ থাকো। প্রহরীদের মনে যেন কোন সন্দেহ না হয়। ফ্রান্সিস বলল।

—ঠিক আছে। ফ্লেজার বলল।

—বন্ধুদের আমাদের কথা বল। কালকে আবার আসবো। পালাবার ছক বলবো। ফ্রান্সিস বলল।

ফ্রান্সিসরা আস্তে আস্তে চলে এল।

জাহাজে ফিরে ফ্রান্সিস আর শাঙ্কো হ্যারির কাছে গেল। হ্যারির ঘুম ভাঙিয়ে বলল—তোমার অনুমানই ঠিক। কেদিয়ার বন্দীঘরেই আমাদের বন্ধুরা বন্দী হয়ে আছে। এখন আমাদের কাজ হল ওদের মুক্ত করা।

ফিরে আসার সময় শাঙ্কো বলল—বন্ধুরা পালিয়ে আসতে গেলেই প্রহরীরা ওদের তাড়া করবে। তখন তরোয়ালের লড়াই চালাতে হবে। হয়তো প্রহরীদের কয়েকজনকে হত্যা করতে পারবো। কিন্তু আমরাও অক্ষত থাকবো না। সবচেয়ে ভালো হচ্ছে তীরধনুক নিয়ে ওদের সঙ্গে লড়া।

—তাহলে সকালের খাবার খেয়েই চলো তীরধনুকের ব্যবস্থা করতে। ফ্রান্সিস বলল।

—তাই চলো। শাঙ্কো বলল।

পরদিন সকালে ওরা দুজনে রাস্তা দিয়ে চলল। দোকানপাটে বাজারে বেশ ভিড়। ওরা একটা কামারশালা খুঁজতে লাগল। পেয়েও গেল। ছোট দোকান। ওরা দোকানে ঢুকল। কামার একটা কুড়ুল বানাচ্ছিল।

—ভাই, তীরধনুক বানাতে পারো? শাঙ্কো বলল।

—কেন পারবো না। অনেকেই শিকার ধরার জন্য তীরধনুক বানিয়ে নিয়ে যায়। তবে খাটুনি বেশি। বেশি দাম দিতে হবে। কামার হাপড় টানতে টানতে বলল।

শাঙ্কো কোমরের ফেট্টি থেকে একটা সোনার চাকতি বের করে দিল। কামার সন্তুষ্ট। হেসে বলল—কালকে সকালেই পেয়ে যাবেন।

সেদিন গভীর রাতেই ফ্রান্সিস আর শাঙ্কো কেদিয়ার বাড়ির পেছনদিককার বন্দীঘরের কাছে গেল। ফ্রান্সিস ফোকরে মুখ দিয়ে চাপাস্বরে ডাকল—ফ্রেজার, সিনাত্রা—আ। ফ্রেজাররা জেগেই ছিল। ফ্রেজার ফোকরে মুখ রেখে বলল—বলো। ও মুখ সরাল। এবার ফ্রান্সিস বলল—তোমরা যখন ক্ষেতে কাজ করবে আমরা তখনই যাবো। শাঙ্কোর হাতে থাকবে একটা সাদা রঙের পতাকা। পতাকাটার দিকে নজর রাখবে। পতাকা দেখলেই আমাদের কাছে ছুটে আসবে।

—প্রহরীরাও তো আমাদের পিছু ধাওয়া করবে। ফ্রেজার বলল।

—শাঙ্কো তীর ছুঁড়ে ওদের আটকাবে। ফ্রান্সিস বলল।

—শাঙ্কোর হাতে তীরধনুক থাকলে নিশ্চিন্ত। ফ্রেজার বলল।

ফ্রান্সিসরা জাহাজে চলে এল। বন্ধুদের কাছে ছকের কথা বলল। বন্ধুরা সব শুনে ঘুমুতে গেল।

সকালের খাবার খেয়েই ফ্রান্সিসরা তরোয়াল কোমরে গুঁজে জাহাজ থেকে নেমে এল। দোকানে বাজারে রাস্তায় ভিড়। তার মধ্যে দিয়েই ওরা চলল। শাঙ্কোর হাতের কাঠের ডান্ডায় সাদা পতাকা উড়ছে। ভিড়ের মধ্যে অনেকেই ফ্রান্সিসদের দেখল। তারা ভেবে পেল না কোমরে তরোয়াল গুঁজে হাতে পতাকা নিয়ে ওরা কোথায় চলেছে।

যেতে যেতে শাঙ্কো হেসে বলল—ফ্রান্সিস সাদা পতাকা কিন্তু শান্তির পতাকা।

—আমাদের কাছে আজ অশান্তির পতাকা। ফ্রান্সিস হেসে বলল।

ফ্রান্সিসরা ক্ষেতের কাছে পৌঁছল। দেখল ক্ষেতের এক কোনায় একজন প্রহরী দাঁড়িয়ে আছে। কোমরে তরোয়াল। আর একজন প্রহরী একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে।

পতাকা হাতে ফ্রান্সিসদের দেখে প্রহরীটি কেমন হকচকিয়ে গেল। প্রহরীটি কিছু বোঝার আগেই শাঙ্কো পতাকা ফ্রান্সিসের হাতে দিয়ে ছুটে গিয়ে প্রহরীটির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। প্রহরীটি চিৎ হয়ে মাটিতে পড়ে গেল। শাঙ্কোর হাতে ছুরি ছিলই। ও প্রহরীটির বুকে ছুরি বিঁধিয়ে দিল।

ওদিকে ফ্রান্সিসের হাতের সাদা পতাকা দেখে ফ্রেজাররা ছুটে আসতে লাগল। প্রহরীরা বুঝল ওরা পালাচ্ছে। প্রহরীরাও ওদের পেছনে ছুটে আসতে লাগল। কাছাকাছি যে দাঁড়িয়ে ছিল সে খাপ থেকে তরোয়াল খুলে ফ্রান্সিসদের দিকে ছুটে এল। ফ্রান্সিস দ্রুত ছুটে গিয়ে প্রহরীটির ডান হাত লক্ষ্য করে তরোয়াল চালাল। প্রহরীটি সেই মার ঠেকাতে গেল। কিন্তু পারল না। ওর ডানহাতে তরোয়াল বসে গেল। ও তরোয়াল ফেলে হাত চেপে বসে পড়ল।

ততক্ষণে ফ্রেজাররা ফ্রান্সিসদের কাছে এসে গেছে। প্রহরীদের একজন ফ্রান্সিসদের অনেক কাছে চলে এসেছিল। শাঙ্কো ধনুকে তীর পরিয়ে তীর ছুঁড়ল। শাঙ্কোর নিশানা নিখুঁত। তীর গিয়ে বিঁধল প্রহরীটির পেটে। প্রহরীটি ক্ষেতের ওপর পড়ে গেল।

এই দেখে অন্য প্রহরীরা থমকে দাঁড়াল। কী করবে বুঝে উঠতে পারল না। এই সুযোগে শাঙ্কো একটার পর একটা তীর ছুঁড়তে লাগল। তীরগুলো কারো হাঁটুতে, কারো কাঁধে, কারো বুকের কাছে বিঁধল।

প্রহরীদের গতি রুদ্ধ হয়ে গেল। ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে বলল—জাহাজঘাটের দিকে—জলদি।

সবাই জাহাজঘাটের দিকে ছুটল। লোকের ভিড়ের মধ্য দিয়েই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ছুটল সবাই।

তিনজন প্রহরী কিন্তু জাহাজঘাটের কাছে এসে গেল।

ফ্রান্সিসরা ততক্ষণ জাহাজে উঠে গেছে। পাতা পাটাতনের কাছে দাঁড়াল ঐ তিনজন। ফ্রান্সিস কোমর থেকে তরোয়াল খুলল। চেঁচিয়ে বলল—উঠে এসো। তোমাদের লড়াইয়ের সাধ মিটিয়ে দিচ্ছি।

প্রহরী তিনজন নিজেদের মধ্যে কী বলাবলি করল। তারপর পিছু ফিরে হাঁটতে লাগল।

ওদিকে ফ্রেজারদের পালাবার সময় অন্য বন্দীরাও পালাল। প্রহরীরা ফিরে এসে দেখল একজন বন্দীও নেই। ওদের রাগ পড়ল ফ্রান্সিসদের ওপর। কিন্তু কিছুই করার নেই। এখন কর্তার কাছে জবাবদিহি করতে হবে। এই চিন্তা নিয়ে অলস পায়ে কেদিয়ার বাড়ির দিকে চলল।

ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে বলল—জাহাজ ছাড়ো। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। কেদিয়া এখানকার জমিদার। তার যথেষ্ট লোকবল আছে। আমরা বিপদে পড়বো।

সবাই ভাগ হয়ে ছুটলো। পাল খুলে দেওয়া হল। পালগুলো ফুলে উঠল। নোঙর তোলা হল। দাঁড়ঘরে দাঁড় বাওয়া শুরু হল। জাহাজ চলল। অল্পক্ষণের মধ্যেই বেশ গতি পেল।

জাহাজ তখন বেশ দূরে চলে এসেছে। দূর থেকে ওরা দেখল জাহাজঘাটে বেশ ভিড় জমেছে।

জাহাজ ক্রমে মাঝ সমুদ্রে চলে এল। তখনও দাঁড় বাওয়া চলছে।

জাহাজ উত্তরমুখো চলল।

দুদিনের মাথায় জাহাজ ঝড়ের মুখে পড়ল। ভাইকিংরা ঝড়ের মোকাবিলায় অভ্যস্ত। ওরা পাল নামিয়ে দড়িদড়া টেনে জাহাজ ভাসিয়ে রাখল।

প্রায় দিন পনেরো কুড়ি পরে ওদের জাহাজ আমারগো বন্দরে ভিড়লো।

তখন শেষ রাত।

ফ্রান্সিস স্থির করল আর দেরি করবে না। পরদিন সকালেই সামুছার খোঁজে যাবে।

পরদিন সকালেই ফ্রান্সিস, শাঙ্কো আর হ্যারিকে নিয়ে বন্দরে নামল। দোকানের লোকজনকে জিজ্ঞেস করে করে সামুছার বাড়িতে এল।

এমন কিছু বিশাল বাড়ি নয়। ছোট বাড়ি। কাঠ পাথরে তৈরি।

বাড়ির ওপাশে তাকাতেই রাজা আলফ্রেডের দুর্গের প্রায় ধ্বংসস্তূপ দেখল। সমস্ত দূর্গটাই প্রায় ভেঙে পড়েছে। দুএকটা জায়গায় তখনও ছাদমত আছে। কয়েকটা দেয়ালও খাড়া আছে।

সামুছার বাড়ির দরজায় ফ্রান্সিস আঙ্গুল দিয়ে টোকা দিল। একটু পরেই দরজা খুলে গেল। পাংলু দাঁড়িয়ে। ফ্রান্সিস এখানে আসবে এটা পাংলু ফ্রান্সিসের কথা থেকে জেনেছিল। ও খুব অবাক হল না। হাসতে হাসতে ফ্রান্সিসের দুহাত জড়িয়ে দরজা খুলে ধরল। ফ্রান্সিস হেসে বলল—কেমন আছো পাংলু। পাংলু ওর দেশীয় ভাষায় কী বলে গেল ফ্রান্সিস কিছুই বুঝল না। তবে এটুকু বুঝল যে পাংলু ভালোই আছে।

এবার ফ্রান্সিস আকারে ইঙ্গিতে কর্তাকে ডেকে দিতে বলল। পাংলু চলে গেল।

কিছু পরে সামুছা দরজায় এসে দাঁড়াল। মুখে কাঁচাপাকা দাড়িগোঁফ। বেশ রোগাটে চেহারা। তবে চোখদুটো খুব বুদ্ধিদীপ্ত। মাথার কাঁচাপাকা চুলে একবার হাত বুলিয়ে নিয়ে সামুছা বললেন—আপনারা কী চান? আপনারা তো বিদেশী।

—হ্যাঁ। আমরা ভাইকিং। একটা ব্যাপারে আপনার সঙ্গে কথা বলতে এসেছি। ফ্রান্সিস বলল।

—বেশ। বলুন। সামুছা বললেন।

—এখানে নয়। একটু বসে কথা বলতে চাই। ফ্রান্সিস বলল।

—খুব দরকারি কথা? সামুছা বললেন।

—হ্যাঁ। খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা। ফ্রান্সিস বলল।

সামুছা পেছন ফিরে বললেন—আসুন।

একটা ছোট ঘরে ঢুকল সবাই। গদীওয়ালা কয়েকটা চেয়ার। পাথরের দেয়ালে পাথরের পাটাতন পেতেই কিছু চামড়ার বই সাজানো। মাঝখানে একটা চৌকোনো টেবিলমত। সামনের চেয়ারটায় গদী নেই। সাধারণ কাঠের চেয়ার। সামুছা ওটাতেই বসলেন। ফ্রান্সিসরা গদী আঁটা চেয়ারে বসল।

ফ্রান্সিস একবার চারদিকে দেখে নিয়ে বলল—আমার নাম ফ্রান্সিস।

—ও। সামুছা মুখে শব্দ করলেন।

—আমরা শুনেছি যে আপনি রাজা আলফ্রেডের গুপ্ত ধনভাণ্ডার আবিষ্কারের জন্যে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। ফ্রান্সিস বলল।

—ভুল শুনেছেন। সামুছা বললেন।

—না। ভুল শুনিনি। ফ্রান্সিস বলল।

—কথাটা যে সত্যি এটা কী জন্যে মনে করছেন। সামুছা বললেন।

—আপনি আমারগো বন্দর থেকে এতদূরে একা একা এই বাড়িতে নির্জন জায়গায় দিন কাটাচ্ছেন কেন? ফ্রান্সিস বলল।

—বেশি লোকজন আমি একেবারে পছন্দ করি না। সামুছা বললেন।

—তাহলে রোববার রোববার রাতে রাজা আলফ্রেডের ঐ ভাঙা দূর্গে যান কেন? ফ্রান্সিস বলল।

—কে বলল? সামুছা একটু চমকালেন।

—তা বলবো না। সত্যি কিনা তাই বলুন। ফ্রান্সিস বলল।

—হ্যাঁ যাই। ঘুরে ফিরে দেখি। সামুছা বললেন।

—এটা একটা যুক্তি হল? গভীর রাতে মশাল হাতে একটা ভাঙা দূর্গে ঘুরে বেড়ানো—বিনা কারণে? ফ্রান্সিস বলল।

—হ্যাঁ। সামুছা মাথা ঝাঁকিয়ে বলল।

—না। আপনি গুপ্ত ধনভাণ্ডারের কোন সূত্র পান কি না তাই দেখে বেড়ান। ফ্রান্সিস বলল।

সামুছা বুঝল যুক্তিতে তিনি হেরে যাচ্ছেন। একটু চুপ করে থেকে বললেন—বেশ যদি খুঁজেই থাকি তাতে আপনাদের কী?

—কিছুই না। গুপ্ত ধনভাণ্ডার যে কেউ খুঁজতে পারে। ফ্রান্সিস বলল।

সামুছা এবার আঙ্গুল দিয়ে তাকের চামড়ার বইগুলো দেখালেন। বললেন—ঐ বইয়ের একটাতে রয়েছে রাজা আলফ্রেডের নিজের লেখা তাঁর জীবনী।

—তাহলে তো আপনি অনেক তথ্য পেয়েছেন। ফ্রান্সিস বলল।

—না। গুপ্ত ধনভাণ্ডার নিয়ে রাজা আলফ্রেড একটি কথাও লেখেন নি। যাক গে। অনেক কষ্টে বইটা জোগাড় করেছিলাম কিন্তু আমার কোন কাজেই লাগল না। সামুছা বললেন।

ফ্রান্সিস কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর বলল—

—এবার আমার কথা বলি। আমি এর আগে অনেক গুপ্তধন বুদ্ধি খাটিয়ে পরিশ্রম করে খুঁজে বের করেছি। আমার খুব ইচ্ছে যে রাজা অ্যালবার্টের গুপ্তধনও খুঁজে বের করি।

—কেন? সামুছা জানতে চাইলেন।

—এমনি। আমি এসব কাজ ভালোবাসি তাই। ফ্রান্সিস বলল।
—বেশ। খুঁজে বের করলেন। তারপর? সামুছা বললেন।
—সেই গুপ্তধন যার প্রাপ্য তাকে দিয়ে চলে আসি। ফ্রান্সিস বলল।
—রাজা অ্যালবার্টের গুপ্তধন কার প্রাপ্য? সামুছা বললেন।
—কেন—আপনার। ফ্রান্সিস বলল।
—আপনি কোন অংশ নেবেন না? সামুছা জানতে চাইলেন।
—না। গুপ্তধনের প্রতি আমার কোন লোভ নেই। ফ্রান্সিস বলল। সামুছা বেশ চমকে উঠল। একটু চুপ করে থেকে বললেন—সত্যিই আপনি কিছু চাইবেন না? ফ্রান্সিস মাথা নেড়ে বলল—
—না।
—ঠিক আছে। আমি একটু ভেবে দেখি। আপনারা কাল সকালে আসুন। সামুছা বললেন।
ফ্রান্সিসরা উঠে দাঁড়াল।
বাড়ির বাইরে এল। পিংলা ছুটে এল। ফ্রান্সিসদের দিকে তাকিয়ে হাসল। ফ্রান্সিসও হাসল। কিছু বলল না। বললেও পাংলু বুঝবে না।
ফেরার পথে হ্যারি ডাকল—ফ্রান্সিস।
—বলো। ফ্রান্সিস শাঙ্কোর দিকে তাকাল।
—গুপ্তধন উদ্ধারে সামুছা কি তোমার সাহায্য নেবে? শাঙ্কো বলল।
—আলবাৎ নেবে। আমার পিঠে চড়ে সামুছা গুপ্তধন হাতাবার তালে আছে।
—এটা ঠিক গুপ্তধন উদ্ধার হলে ওরই লাভ। শাঙ্কো বলল।
—সেটা ও ভালো করেই জানে। ফ্রান্সিস বলল।
পরের দিন সকালে ফ্রান্সিসরা আবার সামুছার বাড়িতে গেল। তার আগে বন্ধুদের সব কথা বলে গেল।
গতকালের মত পাংলুই দরজা খুলল। ফ্রান্সিসদের বসার ঘরে বসিয়ে গেল।
সামুছা এলেন। চেয়ারে বসল। বললেন—ভেবে দেখলাম আমি তো দীর্ঘদিন চেষ্টা করেও গুপ্তধন আবিষ্কার করতে পারলাম না। ভাবছি তোমাদের সাহায্য নেব। ফ্রান্সিস কোন কথা বলল না। সামুছা এবার বললেন—যে কথাটা কেউই জানে না সে কথাটাই বলছি। গুপ্ত ধনভাণ্ডার নয় রাজা অ্যালবার্ট একটা স্বর্ণখনি স্থাপন করেছিলেন।
—স্বর্ণখনি? ফ্রান্সিস বেশ চমকে উঠল।
—হ্যাঁ। রাজা অ্যালবার্ট তাঁর বইতে এই স্বর্ণখনির কথা উল্লেখ করে গেছেন। দুর্গ নির্মাণ করা হয়েছে সেই স্বর্ণখনির ওপরেই। উনি দক্ষিণ দেশ থেকে কয়েকজন স্বর্ণখনি বিশেষজ্ঞ আনিয়েছিলেন। তারা স্বর্ণরেণু জড়ানো পাথর থেকে সোনা গলিয়ে সোনার মণ্ড তৈরি করেছিল। সেসব তিনি আর ওপরে নিয়ে আসার সময় পান নি। তার আগেই তাঁর মৃত্যু হয়।

দুপুরে সামুছার খাবার ঘরে ওরা খেতে বসল। পাংলু আর একটি কৃষ্ণকায় মেয়ে ওদের খেতে দিল। চিংড়িমাছের খাবারটা ওদের খুব সুস্বাদু লাগল। ওরা চেয়ে খেল। খেতে খেতে হ্যারি বলল—আপনার কাছে একটা অনুরোধ ছিল।

—বলুন। সামুছা বলল।

—রাজা আলফ্রেডের লেখা বইটা একটু দেবেন? হ্যারি বলল।

—পড়তে পারবেন? পুরোনো স্পেনীয় ভাষায় লেখা। সামুছা বললেন।

—আমি স্পেনীয় ভাষা অল্প জানি। পড়তে চেষ্টা করবো। তাছাড়া ছবিটবি থাকলে দেখবো। হ্যারি বলল।

—ছবি আছে। তবে সে সব নানা জাতের ফুলের ছবি। সামুছা বললেন।

—তাহলে রাজা অ্যালবার্ট ফুল ভালোবাসতেন। হ্যারি বলল।

—হ্যাঁ। তাঁর বিরাট ফুলের বাগান ছিল। সামুছা বললেন।

খাওয়াদাওয়া শেষ। ফ্রান্সিসরা বাইরের ঘরে এসে বসল। সামুছা এলেন। তাক থেকে চামড়া বাঁধানো বেশ বড় একটা বই টেবিলে রেখে বললেন—বই পড়ুন। সামুছা বই দিয়ে চলে গেলেন।

ফ্রান্সিস চেয়ারে বসেছিল। উঠে দাঁড়াল। বলল—

—দেরি করবো না। চলো।

—আমি বইটা দেখছি। তোমরা যাও। হ্যারি বলল।

ফ্রান্সিস আর শাঙ্কো ভাঙা দুর্গে এল। এবার ফ্রান্সিস ভাঙা ঘরগুলো দেখতে লাগল। সবই ভাঙা। কয়েকটিকে ঘর বলে মনে হয় এই পর্যন্ত।

দুজনে ঘুরে ঘুরে ভাঙা ঘরগুলো দেখতে লাগল। ঘরগুলোর বৈশিষ্ট্য কিছু নেই। চারকোনা ঘর। প্রায় সবগুলো ঘরই দেখা হল। কিন্তু পূবদিকের ঘরগুলো দেখা হল না। ওদিকটা একেবারেই ভেঙে পড়েছে। ঢোকার পথ নেই। সামুছা এইজন্যেই বোধহয় পূবদিকে যেতে বারণ করেছিল।

ফিরে এল দুজনে।

হ্যারি তখনও বইটা দেখছে।

—কিছু তথ্য পেলে? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—যতটুকু পড়তে পারলাম স্বর্ণখনি সম্পর্কে সামুছা যা বলেছে তাই। বেশি কিছু নেই। তবে একটা অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ্য করলাম প্রায় সব পাতায় বিভিন্ন জাতের ফুলের ছবি।

—সামুছা তো বলল—উনি ফুল ভালোবাসতেন। ফ্রান্সিস বলল।

—প্রথম পাতাতেই একটা বিরাট ত্রিভুজ এঁকেছেন। মা মেরিই জানে কেন এঁকেছেন। তার মধ্যেও ফুল।

—ত্রিভুজের মধ্যে ফুল? ফ্রান্সিস বেশ চমকে উঠল।

—মনে হয় রাজা অ্যালফ্রেডের কোন ত্রিকোন বাগান ছিল। হ্যারি বলল।

—হতে পারে। তবে—ফ্রান্সিস কথাটা শেষ করল না।

—ত্রিকোণ বাগানের এক কোণায় ফুল। হ্যারি বলল।

—উঁহু। এই ফুল আঁকার গুরুত্ব আছে। ফ্রান্সিস বলল।

—তুমি কি ফুলটাকে গুরুত্ব দিচ্ছো? হ্যারি বলল।

—হ্যাঁ। তবে এখনও নিশ্চিন্ত নই। মনে করছি ফুলটা কোন কিছু নির্দেশ করছে। ফ্রান্সিস বলল।

—কী নির্দেশ করছে? হ্যারি জানতে চাইল।

—সেটাই বুঝতে পারছি না। ত্রিকোণ ছবিটা দেখি। ফ্রান্সিস বলল।

হ্যারি বইটা ফ্রান্সিসের দিকে এগিয়ে দিল। ফ্রান্সিস মলাট উল্টে ত্রিকোণ ছবিটা দেখল। ত্রিকোণটি সারা পাতা জুড়ে আঁকা। উত্তর কোণে একটা সূর্যমুখী ফুল আঁকা। ছবিটা এরকম—
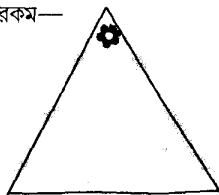
সামুছা ঘরে ঢুকে বসলেন।

ফ্রান্সিস বইটা এগিয়ে দিয়ে বলল—আচ্ছা—এই ত্রিভুজ-ফুলের ব্যাপারটা কী বলুন তো?

—এ তো একটা ছবি। রাজা আলফ্রেড ফুল ভালোবাসতেন। এন্তার এঁকে গেছেন। সামুছা বললেন।

—কিন্তু বইটাতে কোথাও তো কোনো ছবির মধ্যে ফুল আঁকা নেই। তাহলে এই ত্রিভুজের মধ্যে কেন আঁকলেন? ফ্রান্সিস বলল।

—রাজরাজরাদের খেয়াল। বিচিত্র ধরনেরই হয়। সামুছা বললেন।

—আচ্ছা—আপনি আমাদের পূবদিকে যেতে মানা করেছিলেন। পূবদিকে কি ঘরটর আছে? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—থাকতে পারে। আমি যখন থেকে দেখছি তখন থেকেই পূবদিক ভাঙা। সামুছা বললেন।

—আমার মনে হয় ওদিকে ঘর আছে। ফ্রান্সিস বলল।

—তা থাকতে পারে। কিন্তু সেই ঘর দেখবে কী করে? সামুছা বললেন।

—দড়ি বেয়ে নেমে দেখতে হবে। ফ্রান্সিস বলল।

—পারবেন? সামুছা বললেন।

—পারবো।

—আজকে বিকেল হয়ে এল। মশালের আলোয় ভালো দেখা যাবে না। কাল সকালে আসছি। পূবদিকে নামবো। দড়ি আমরাই আনবো।

পরদিন ফ্রান্সিসরা একটু সকাল সকালই এল। জাহাজ থেকে দেখেশুনে বেশ লম্বা দড়ি নিয়ে এল।

ফ্রান্সিস আর শাঙ্কো পাথরে পা রেখে ভারসাম্য বজায় রেখে ভাঙা দূর্গের মাথায় উঠল। হ্যারি নীচে রইল। দুর্গের মাথাটাও ভাঙা। সাবধানে পা ফেলতে হচ্ছে।

পূবদিকে গেল দুজনে। সত্যিই এদিকটা ভেঙে পড়েছে। ফ্রান্সিস পাকানো দড়ি কাঁধে নিয়ে চারদিকে তাকাতে লাগল। দড়ি বাঁধার জায়গা খুঁজতে লাগল। তখনই শাঙ্কো একটা ছোট নিরেট পাথুরে দেওয়াল দেখাল। ফ্রান্সিস কাঁধ থেকে দড়ি নামাল। আস্তে আস্তে দড়ির একটা মুখ নামাতে লাগল। প্রায় সবটা দড়ি ছেড়ে দেখল বেশ নীচে নেমেছে।

এবার ফ্রান্সিস দড়ির মাথাটা দেয়ালে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে বাঁধল। টেনে দেখল বেশ শক্তভাবেই বাঁধা হয়েছে। ওরা দড়ি বাঁধায় ওস্তাদ। কারণ জাহাজে দড়ির কাজ অনেক। নানারকম গিঁট বাঁধায় ওরা অভ্যস্ত। ওরা মশাল এনেছিল। কিন্তু তখনও জ্বালে নি।

ফ্রান্সিস দড়ি ধরে ধরে ভাঙা পাথরে পা রেখে রেখে নীচে নেমে আসতে লাগল। তখনও ভাবছে নীচে বোধহয় কোন অটুট ঘর পাবে না।

বেশ কিছুটা নেমে আসতে ভাঙা পাথরের মধ্যে একটা ভাঙা দরজামতো পেল। দরজার দিকে তাকিয়ে দেখল ভেতরটা বেশ অন্ধকার। রোদ অল্পই ঢুকছে।

ফ্রান্সিস ভাঙা দরজায় পা রাখল। তারপর দড়ি ধরে ধরে ভেতরে ঢুকল। অন্ধকারটা চোখে সরে আসতে দেখল একটা ঘর। ও একনজর দেখে বুঝল একটা ভাঙা চৌকোনো ঘর। ও ঘরের ভেতর নামল। তখনই আবছা দেখল ওপাশে আর একটা ভাঙা দরজা। তবে ছোট।

ফ্রান্সিস দড়ির মুখ কাঁধে ঝুলিয়ে ভাঙা পাথরের মেঝের ওপর দিয়ে সেই ঘরের দরজার কাছে গেল। এদিকটা ভেঙে পড়ায় ওপরে ছাদের মত হয়ে গেছে। সেই ঘরটায় ঢুকতে গিয়ে ফ্রান্সিস দ্রুত পিছিয়ে এল। আবছা দেখল সেই ঘরটা বেশ নীচে। ওর মনে হল বোধহয় দূর্গের ভিতেরও নীচে। কিন্তু একেবারে অন্ধকার। কিছুই দেখা যাচ্ছে না। ঘরটা কেমন বোঝাই যাচ্ছে না। শুধু পাথর আর পাথর।

মশাল চাই। ফ্রান্সিস সরে এল। দড়ি ধরে ধরে আগের ঘরের দরজার কাছে এল। দুহাতের তালু মুখের কাছে গোল করে চিৎকার করে ডাকল—শাঙ্কো—শাঙ্কো।

শাঙ্কো ডাক শুনে ঘাবড়ে গেল। ফ্রান্সিস কি কোন বিপদে পড়ল? ও চিৎকার করে বলল—কোন বিপদ নয়তো?

—না—না। তুমি একটা মশাল জ্বালিয়ে নিয়ে এসো। ফ্রান্সিস বলল।

কিছু পরে শাঙ্কো একটা জ্বলন্ত মশাল বাঁ হাতে নিয়ে আস্তে আস্তে দড়ি ধরে ধরে নেমে এল।

দড়ি ধরে ধরে দুজনে প্রথম ভাঙা ঘরটায় ঢুকল। সেই ঘর পার হয়ে সেই ছোট ঘরটার ভাঙা দরজার কাছে এল।

ফ্রান্সিস এবার জ্বলন্ত মশালটা নীচের ঘরের মাঝখানটায় ছুঁড়ে ফেলল। মশালের আলোয় ছোটঘরটা কিছুটা স্পষ্ট দেখা গেল। ফ্রান্সিস ভীষণভাবে চমকে উঠল। আশ্চর্য! ঘরটা ত্রিকোণ ঘর। এরকম ত্রিকোণ ঘরভাঙা দুর্গ কোথাও দেখেনি। রাজা আলফ্রেডের বইয়ে ত্রিকোণ আঁকা আছে। তাহলে তিনি এই ঘরটাকেই বুঝিয়েছেন। ত্রিকোণের উত্তরের মাথাটায় আঁকা আছে একটা চন্দ্রমুখী ফুল। সেই ঘরের উত্তরের কোণের দিকে তাকাল ফ্রান্সিস। খুব অস্পষ্ট দেখল—পথটা পাথরের স্তূপ।

ফ্রান্সিস মৃদুস্বরে ডাকল—শাঙ্কো।

—বলো। শাঙ্কো এগিয়ে এল।

ঘরের উত্তরের কোণার দিকে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে ফ্রান্সিস বলল—ঐখানে আছে স্বর্ণখনি।

শাঙ্কো বলল—ওখানে তো পাথরের স্তূপ।

—ওসবের নীচেই আছে স্বর্ণখনি। ফ্রান্সিস বলল।

—তুমি নিশ্চিত? শাঙ্কো সংশয় প্রকাশ করল।

—হ্যাঁ নিশ্চিত। এবার স্বর্ণখনি খুঁজে বের করা। ফ্রান্সিস বলল।

—তাহলে তো এই ঘরে নামতে হয়। শাঙ্কো বলল।

—হ্যাঁ নামবো। তারপর পাথরের পাটা সরাবো। ফ্রান্সিস বলল।

—বেশ। চলো। নামি। শাঙ্কো বলল।

দুজনে দড়ি বেয়ে বেয়ে সেই ত্রিকোণ ঘরটার ভাঙা মেঝেয় নামল। ভাঙা পাথরে পা রেখে রেখে শরীরের ভারসাম্য বজায় রেখে ওরা উত্তর কোণায় এল। দেখল স্তূপাকার পাথরের ভাঙা পাটা।

—সব পাথর সরাতে হবে। হাত লাগাও। ফ্রান্সিস বলল।

—বলছো কি। আমরা দুজনে সব সরাতে পারবো? শাঙ্কো বলল।

—হাত তো লাগাই। দেখা যাক। ফ্রান্সিস বলল।

দুজনে পাথরের পাটা সরাতে লাগল। ভাঙা হলেও কোন কোন পাটা বেশ ভারি। ওরা পাথরের পাটা সরাচ্ছে। ভাঙা দুর্গে শব্দ উঠছে—দুম্—দুম্।

অল্পক্ষণের মধ্যেই ওরা হাঁপিয়ে পড়ল। কিছুক্ষণ ভাঙা পাটায় বসে বিশ্রাম নিল। আবার সরাতে লাগল। বিশ্রাম নিয়ে নিয়ে পাটা সরানোর কাজ চলল। স্তূপীকৃত পাটার উচ্চতা কিছু কমল। কিন্তু রইল অনেক।

শাঙ্কো হাঁপাতে হাঁপাতে বলল—এসব সরানো দুজনের কর্ম নয়। আরো লোক লাগবে।

—হুঁ। দেখি সামুছাকে বলে—লোক পাই কিনা। তবে সোনার খনি আবিষ্কার করতে যাচ্ছি। সমস্যা আছে। যদি সত্যিই সোনার খনি পাই তখন

যারা সাহায্য করতে আসবে তারা রুদ্রমূর্তি ধরতে পারে। তখন আমাদের জীবন বিপন্ন হবে। ফ্রান্সিস বলল।

শাঙ্কো মাথা নেড়ে বলল—হ্যাঁ এটা হতে পারে।

—হতে পারে না—হবেই। সোনার লোভেই সামুছা এখানে বছরের পর বছর একা পড়ে আছে। ফ্রান্সিস বলল।

—তাহলে কী করবে? শাঙ্কো জানতে চাইল।

—লোক আনবো। কিন্তু আগে থেকেই সাবধান থাকতে হবে। ফ্রান্সিস বলল।

—এখন কী করবে? শাঙ্কো বলল।

—চলো উঠে পড়ি। লোক জোগাড় করে কালকে আসবো। ফ্রান্সিস বলল।

ফ্রান্সিস ফেরার পথে হ্যারিকে সব বলল।

সামুছা বাইরের ঘরেই বসেছিলেন। ফ্রান্সিসরা ঘরে ঢুকতেই বললেন—কোন খোঁজ পেলে?

—এখনও নিশ্চিত নই। তবে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।

—এত বছর ধরে চেষ্টা করে আমি পারলাম না। তোমরা পারবে? সামুছা সংশয় প্রকাশ করলেন।

—দেখি। একটা কথা। ফ্রান্সিস বলল।

—বলো। সামুছা বললেন।

—প্রায় স্তূপাকার পাথর একটা ঘরে। সেসব সরিয়ে ভাঙা মেঝেটা বের করতে হবে। কিন্তু আমাদের তিনজনের পক্ষে সেটা সম্ভব নয়। ফ্রান্সিস বলল।

—সময় নাও। তোমরাই সরাও। সামুছা বললেন।

—না। আমাদের তাড়াতাড়ি জাহাজে ফিরতে হবে। ফ্রান্সিস বলল।

—আমরা পারবো না। ভীষণ খাটুনি। শাঙ্কো বলল।

—পিংলা বলছিল তোমরা ক্রীতদাস ছিলে। অনেক দিন। শুকনো ক্ষেতে জল ছিটোনোর কাজ করেছো। সামুছা বললেন।

—হ্যাঁ। তবে মুক্ত অবস্থায় পারবো না। শাঙ্কো বলল।

—তাই বলছি তিনচারজন লোক যদি দিতে পারেন তাহলে দ্রুত কাজ সারতে পারি। ফ্রান্সিস বলল।

—তা দেয়া যাবে। পাংলুকে খবর দিতে পাঠাচ্ছি। সামুছা বললেন।

—ঠিক আছে। আমরা কাল সকালে আসবো। ফ্রান্সিস বলল।

—বেশ। সামুছা বললেন।

ফেরার পথে শাঙ্কো বলল—ত্রিকোণ ঘর ফুলের ছবি এসব নিয়ে তো সামুছাকে কিছু বললে না।

—মাথা খারাপ। এসব বললে সামুছা আমাদের হটিয়ে নিজেই কাজে নেমে পড়বে। ফ্রান্সিস বলল।

—কিন্তু তুমি তো ওকেই সব দেবে। শাঙ্কো বলল।

—হ্যাঁ। তা দেব। কিন্তু একটা ব্যাপার আছে। মারিয়াকে দেখতে বলবো কত সোনার চাকতি আছে। যদি দেখি অনেক কম তাহলে স্বর্ণখনি আবিষ্কার করতে পারলে সামুছার কাছ থেকে কিছু সোনা নেব। ফ্রান্সিস বলল।

—সোনা থাকলে কেমনভাবে আছে? চাকতির মত? শাঙ্কো জানতে চাইল।

—সঠিক কী করে বলি। তবে পুরোনো আমলে খনির সোনা গোল তাল করে রাখা হত। হয়তো সেভাবেই রাখা আছে।

জাহাজে এসে ফ্রান্সিস মারিয়াকে জিজ্ঞেস করল—সোনার চাকতি কেমন আছে? মারিয়া দেয়ালের কাঠ সরিয়ে দেখল। বলল—কমে গেছে। কিছু আছে শাঙ্কোর কাছে।

—তাহলে সোনা চাই। ফ্রান্সিস বলল।

পরের দিন সকালে ফ্রান্সিরা এল।

দেখল বসার ঘরের বারান্দায় চারজন কালো যুবক বসে আছে। সামুছা বেরিয়ে এলেন। বললেন—এই যে তোমাদের লোক। ফ্রান্সিস বুঝল তরতাজা বলিষ্ঠ যুবক ওরা। ওদের দিয়ে দ্রুতই কাজ হবে।

ফ্রান্সিস পাংলুর কাছে দড়িটা রেখে গিয়েছিল। পাংলু সেটা নিয়ে এল।

সকলে চলল ভাঙা দুর্গের দিকে। হ্যারি নীচে রইল।

গতকালের মত দড়ি বেঁধে প্রথমে ফ্রান্সিস নেমে গেল। শাঙ্কোও নামল। দুজনের হাতেই জ্বলন্ত মশাল। সঙ্গীদের একজনও একটা জ্বলন্ত মশাল নিল।

সবাই প্রথম ভাঙা ঘরটার ভাঙা দরজার সামনে এল। ভাঙা মেঝের ওপর দিয়ে ছোট ঘরটার দরজার কাছে এল।

পরদিন সকালে ফ্রান্সিস এল। দেখল চারজন কালো যুবক বারান্দায় বসে আছে। তাদের নিয়ে ফ্রান্সিস চলল।

তিনটে মশাল নিয়ে সবাই ছোট ঘরে নামল। এখন চারদিক অনেক স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

এবার ফ্রান্সিস কালো যুবকদের বলল—ঐ উত্তরকোনায় একটা তামার খনি আছে। তামা এমন কিছু দামি নয়। আমরা সেই খনিটা খুঁজে বের করবো। সেটা করতে গেলে ঐ স্তূপাকার পাথর সরাতে হবে। বুঝেছো? ওরা ঘাড় নাড়ল।

—তাহলে কাজে লাগা যাক। ফ্রান্সিস বলল। মশালগুলো পাথরের খাঁজে রাখা হল। মশালের আলোয় সবাই মিলে পাথরের ভাঙা পাটা সরাতে লাগল। বিশ্রাম নিয়ে নিয়ে পাথর সরানো দুপুরের পরেই শেষ হয়ে এল। সবাই কাজ থামাল। সবাই কমবেশি হাঁপাতে লাগল।

ফ্রান্সিস উত্তর কোনায় ভাঙা মেঝের কাছে এল। ভাঙা পাথর সরাতে লাগল। ভাঙা পাথর ফেলে দিতেই দেখল—একটা তিনকোণা পাথরের পাটা। তার ওপর উত্তর কোনায় চন্দ্রমুখী ফুল কুঁদে তোলা।

ফ্রান্সিস চোখ বুঁজে নিজের উচ্ছ্বাস গোপন করল। ফিরে তাকিয়ে বলল—বৃথা চেষ্টা। এখানে তামার খনিটনি নেই। সবটাই ভাঙা পাথরে ভর্তি।

শাঙ্কো হতাশ গলায় বলল—তাহলে সব চেষ্টাই মাটি।

—হ্যাঁ। একটু বিশ্রাম নিয়ে ওপরে উঠে যাবো। ফ্রান্সিস বলল।

কালো যুবকরা বসেছিল। একজন উঠে দাঁড়িয়ে বলল—তাহলে আমরা চললাম।

—হ্যাঁ তাই। আমরাও একটু পরে চলে যাবো। ফ্রান্সিস দুহাত ছড়িয়ে বলল।

কালো যুবকরা উঠে যাবার জন্যে দড়ি বেয়ে ওপরে চলে গেল।

ফ্রান্সিস তখন একটা পাথরের ওপর বসেছিল।

কিছু পরে উঠে দাঁড়াল। বলল—শাঙ্কো উঠে দেখতো ওরা চলে গেল কিনা। শাঙ্কো দড়ি বেয়ে উঠে এল। ওপরে তাকিয়ে দেখল চার যুবকই উঠে গেছে।

শাঙ্কো নেমে এল। বলল—ওরা চলে গেছে। ফ্রান্সিস লাফিয়ে উঠল। চাপাগলায় সজোরে বলে উঠল—

—শাঙ্কো—আমি সফল।

—সেকি? শাঙ্কো অবাক।

—এসো। দেখাচ্ছি। ফ্রান্সিস হাসতে হাসতে বলল।

দুজনে সেই ত্রিকোণ ফুল তোলা পাথরের পাটার কাছে এল। ফ্রান্সিস পাটাটা তুলে দেখিয়ে বলল—শাঙ্কো—এর নীচেই আছে স্বর্ণখনি।

—নিশ্চিন্ত? শাঙ্কোর বিস্ময়তার তখনও কাটেনি।

—এখন নিশ্চিত। চলো। পাটাটা তুলি। এবার দুজনকেই তুলতে হবে। ফ্রান্সিস বলল।

দুজনে মিলে পাটাটা টানতে গেল। আশ্চর্য। আস্তে পাটাটা উঠে এল। ভেতরটা অন্ধকার। কিছুই দেখা যাচ্ছে না। ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে বলল—দুটো মশাল নিয়ে এসো। শাঙ্কো দুটো মশাল পাথরের খাঁজ থেকে তুলে নিয়ে এল।

গর্তটার দু'পাশে দুজনে মশাল দুটো ধরল। ফ্রান্সিস একটা মশাল গর্তের মধ্যে ফেলে দিল। এবার প্রায় স্পষ্ট দেখা গেল কয়েকটা গোল তালা। মশালের আলোয় একটু ঝিকিয়ে উঠল। ফ্রান্সিস অভিজ্ঞ চোখে বুঝল—

—সোনা। ও প্রায় চিৎকার করে উঠল—শাঙ্কো—সোনা। শাঙ্কোও আনন্দে লাফিয়ে উঠল।

ফ্রান্সিস দুহাতে ভর রেখে আস্তে আস্তে গর্তটায় নেমে গেল। একটা সোনার তাল নিয়ে ওপরে উঠে এল।

এবার মশালের আলোয় সোনার তালের এবড়োখেবড়ো গা বেশ ঝিকিয়ে উঠল।

—চলো। মুখটা বন্ধ করি। ফ্রান্সিস বলল। পাটা দিয়ে গর্তটার মুখ বন্ধ করে দুজনে ওপরে উঠে এল। হ্যারি ফ্রান্সিসের হাতে সোনার তাল দেখে ছুটে এল।

হেসে বলল—সাবাস ফ্রান্সিস। তিনজনেই হেসে উঠল। তারপর মৃদুস্বর ধ্বনি তুলল—হো—হো—হো।

ফ্রান্সিস হেসে গলা নামিয়ে বলল—এখন কোন উচ্ছ্বাস প্রকাশ করো না। দেখবে সামুছাও এই কথা বলবে।

ওরা সামুছার বসার ঘরে এল। বসল।

ফ্রান্সিস সোনার তালটা লুকিয়ে রাখল।

একটু পরে সামুছা এলেন। চেয়ারে বসলেন।

সামুছা মৃদুস্বরে জিজ্ঞেস করলেন—হদিশ পেলে?

—হ্যাঁ। ফ্রান্সিস মাথা কাত করে হেসে বলল।

তখনই পাংলু বিকেলের খাবার নিয়ে ঢুকল। সবাইকে দিল। ক্ষুধার্ত ফ্রান্সিসরা প্রায় গোগ্রাসে খাবার গিলতে লাগল। সামুছা মৃদু হেসে বললেন—ওদের আরো খেতে দাও। আবার খাবার। এবার ফ্রান্সিসরা আস্তে আস্তে খেল। পাংলু তখন ঘরে নেই।

সামুছা আবার মৃদুস্বরে বললেন—প্রমাণ? ফ্রান্সিস লুকিয়ে রাখা সোনার তালটা সামুছার হাতে দিল। সামুছার দুচোখ যেন জ্বলে উঠল। সোনার তালটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখলেন। তারপর উঠে আলমারিতে ঢুকিয়ে রাখলেন। এসে চেয়ারে বসলেন। মৃদুস্বরে বললেন—আরো সোনার তাল আছে?

—হ্যাঁ, আছে। ফ্রান্সিস বলল।

সামুছা বললেন—তোমাদের বুদ্ধি চিন্তার প্রশংসা না করে পারছি না। কিন্তু একটা কথা। সোনার খনির কথাটা যেন জানাজানি না হয়। শুধু আমরা চারজন। এমন কি পাংলুকেও বলা হবে না। আমি পরে সোনার খনির ব্যবস্থা করছি।

—এবার আমার একটা অনুরোধ। ফ্রান্সিস বলল।

—আমরা ধনী নই। তবে হতে পারতাম। সে থাক—আমরা দেশে দেশে ঘুরে বেড়াই। সব দেশের মুদ্রা তো আমাদের কাছে থাকে না। তাই সোনাই আমাদের একমাত্র দাম দেবার মাধ্যম। আপনি যদি আমাকে কিছু সোনার চাকতি এই মণ্ড থেকে দেন তাহলে খুবই উপকার হত।

—নিশ্চয়ই দেব। তোমরাই তো কষ্ট করে উদ্ধার করলে। তবে এই সোনা থেকে নয়। আমার কাছে একথলি খাঁটি স্পেনীয় স্বর্ণমুদ্রা আছে। সেটাই দিচ্ছি।

সামুছা উঠে বাড়ির ভেতরে গেলেন। একটু পরেই ফিরে এলেন। একটা নীল সাটিন কাপড়ের থলি টেবিলে রেখে বললেন—এই তোমাদের পারিশ্রমিক। থলিটা তুলে নিয়ে ফ্রান্সিস শাঙ্কোকে দিল। শাঙ্কো সেটা কোমরের ফেট্টিতে ঝুলিয়ে রাখল।

ফ্রান্সিস বলল—তাহলে আমরা চলি।

—বেশ। তোমাদের কাছে কৃতজ্ঞ রইলাম। সামুছা মাথা ঝুঁকিয়ে বললেন।

ফ্রান্সিসরা জাহাজঘাটের দিকে চলল।

শাঙ্কো বলল—প্যাংলুকে দুটো মুদ্রা দিয়ে আসবো।

—না। সামুছা জানতে পারলে মনঃক্ষুণ্ণ হবেন।

ফ্রান্সিসরা পাতা পাটাতন দিয়ে জাহাজে উঠে এল। বন্ধুরা ছুটে এল। জানতে চাইল ফ্রান্সিসরা স্বর্ণখনি খুঁজে বের করতে পেরেছে কিনা।

—হ্যাঁ। আমরা সফল। ফ্রান্সিস হেসে বলল।

বন্ধুরা ধ্বনি তুলল—হো—হো—হো। আশেপাশের জাহাজ থেকে লোকেরাও দেখল।

বুঝল না এত উল্লাসের কারণ কী?

মারিয়া হাসিমুখে এগিয়ে এল। শাঙ্কো মারিয়াকে স্বর্ণমুদ্রা ভরা থলিটা দিল। ফ্রান্সিস শুধু বলল—লুকিয়ে রেখো। মারিয়া মাথা কাত করল।

শাঙ্কো তখন হাত পা নেড়ে বন্ধুদের স্বর্ণখনি আবিষ্কারের ঘটনা বলছে।

তখনও সূর্য অস্ত যায় নি। মারিয়া সূর্যাস্ত দেখার জন্যে রেলিঙ ধরে দাঁড়াল। ফ্রান্সিসও এসে পাশে দাঁড়াল।

সূর্য পশ্চিম আকাশে গভীর কমলা ছড়িয়ে সমুদ্রের ঢেউয়ের মধ্যে ডুবে গেল।

গর্ভগৃহে ধনভাণ্ডার

ফ্রান্সিস আর শাঙ্কো এক বনের মধ্যে দিয়ে চলেছে। সমুদ্রের ধারে ওদের জাহাজ নোঙর করে আছে। ফ্রান্সিস আর শাঙ্কো এসেছে যদি কারো সঙ্গে দেখা হয় তাহলে জেনে নেবে কোথায় এসেছে ওরা। কিন্তু প্রথমেই সব কথা জিজ্ঞেস করতে ভরসা পাচ্ছে না। কোনো কিছু না শুনেই যদি ওদের আক্রমণ করে তাহলে তো লড়াই অনিবার্য। নিজেরা তরোয়াল আনেনি। ফ্রান্সিস এসব ক্ষেত্রে লড়াইয়ের পক্ষপাতী নয়। সে ভাবছে আমাদের শুধু জানতে আসা আমরা কোথায় এলাম। লড়াই-টড়াইয়ের কোনো প্রশ্নই নেই।

দু'দিন আগে এক রাতে প্রচণ্ড ঝড়ের মুখে পড়েছিল ওরা। বহু কষ্টে স্রেফ মনের জোরে জাহাজডুবির হাত থেকে বেঁচেছে। ফ্রান্সিসের শরীর এখনও দুর্বল।

বন শেষ। বেরিয়ে এল ওরা। দুটো বাড়ি দেখল। সেই পাথর, কাঠ, ঘাস দিয়ে তৈরি। চাঁদের আলো খুব উজ্জ্বল নয়। তবে চারদিক মোটামুটি দেখা যাচ্ছে।

—ফ্রান্সিস, এখন কী করবে? শাঙ্কো বলল।

—বাড়ি চাই, খাদ্য চাই, পানীয় জল চাই, ফ্রান্সিস উত্তর দিল।

—বাব্বাঃ, এত সব তোমাকে কে দেবে?

—দেয় দেয়, তেমন পবিত্র মানুষ পেলে তার কাছ থেকে সব পাওয়া যায়।

—দেখো, কপালে মেলে কি না। শাঙ্কো হেসে বলল।

বনের কাছেই ওরা পেল দুটো তক্তা। চাঁদের অস্পষ্ট আলোয় দেকা গেল তক্তা দুটো দিয়ে নিচের বড় গর্ত ঢাকা দেওয়া হয়েছে। দুজনে তক্তা দুটোর কাছে এল। শক্ত করে চেপে ধরে একটা তক্তা সরাল। অস্পষ্ট হলেও চাঁদের আলোয় এবার সিঁড়ি দেখা গেল। পাথরের সিঁড়ি।

ফাঁকের মধ্যে দিয়ে ফ্রান্সিস আর শাঙ্কো নামতে শুরু করল। নামতে নামতে মানুষের কথাবার্তা শুনতে পেল ওরা। এটা তাহলে মানুষের বসবাসের জন্যেই তৈরি হয়েছে। নামতে নামতে ওরা দেখল—বেশ বড় ঘর। পাথর কেটে ঘরটা তৈরি। ঘরের দু'পাশে দেয়ালের খাঁজে মশাল জ্বলছে। মশালের আলোয় সবকিছু মোটামুটি দেখা যাচ্ছে।

ওরা দেখল এক প্রৌঢ় একটা পাথরের ছোট চাঁইয়ের ওপর বসে আছেন।

এতক্ষণ বিড় বিড় করে কথা বলছিলেন। এবার কয়েকজন সৈন্য ফ্রান্সিস আর শাঙ্কোকে ধরে প্রৌঢ়ের কাছে নিয়ে এল। ফ্রান্সিসরা বাধা দেবার চেষ্টাও করেনি।

প্রৌঢ় ফ্রান্সিসদের দিকে তাকিয়ে বলতে লাগলেন, রাজা তুরীনের সৈন্য তোমরা। কিন্তু আমাদের রাজা পারকোনের সঙ্গে পারবে না। পারকোনকে তার প্রজারা দেবতার মতো শ্রদ্ধা করে। বন্ধুর মতো ভালোবাসে। অ্যাই—অ্যাই—অ্যাই—বলতে বলতে প্রৌঢ় হঠাৎ সটান দাঁড়িয়ে উঠে দাঁড়ে বসে থাকা বাজপাখিটার মাথায় আঙুল চালিয়ে দিলেন। বাজপাখিটা পড়ে যেতে যেতে উঠে বসল। ফ্রান্সিস বাজপাখিটিকে বেশ মনোযোগ দিয়ে দেখল। পাখনার রং খয়েরি সাদা মিশেল। চোখ দুটো গোল গোল, কালো। যে জন্যে বাজপাখিটার কদর সেটা হচ্ছে ওর ঠোঁট। বঁড়শির মতো বাঁকানো। প্রৌঢ় বাজটাকে আদর করে ছেড়ে দিলেন। বাজপাখিটা আবার দাঁড়ে গিয়ে বসল। তারপর ফ্রান্সিসদের দিকে চেয়ে বললেন, আমাদের রাজা পারকোনের সঙ্গে রাজা তুরীনের লড়াই হবে। কবে হবে সেটা কারো জানা নেই। সেই লড়াই কালও হতে পারে আবার একশো দিন পরেও হতে পারে।

ফ্রান্সিস একটু জোর দিয়ে বলল, আপনি আমাদের মিথ্যে সন্দেহ করছেন। আপনাদের এই ঘরে সৈন্যরা থাকে জানলে আসতাম না। তবে একটা কথা স্পষ্ট বলছি, আপনাদের এই কাটাকাটি-মারামারির মধ্যে আমরা নেই। তবে কেন আমাদের বন্দী করে রাখবেন!

—তাহলে তোমরা এখানে এসেছো কেন? প্রৌঢ় বললেন।

—এই কথা জানতে যে এই জায়গার নাম কী? য়ুরোপ থেকে কতদূর এই দেশ, শাঙ্কো বলল।

সেটা জেনে কী হবে? প্রৌঢ় বললেন।

তাহলে বুঝতে পারবো য়ুরোপ থেকে কত দূরে আমরা আছি। বুঝতে পারবো কবে নাগাদ দেশে পৌঁছোতে পারবো।

—সে সব জেনে আর কী হবে? তোমরা তো এখান থেকে যেতে পারবে না। প্রৌঢ় বললেন।

—কেন? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—কারণ মাটির নিচে এই ঘর-টরের কথা তোমরা জেনে ফেলেছো। এটা একটা দুর্গের মতো। এই দুর্গের কথা তোমরা জেনে ফেলেছ। তোমাদের আর বাইরে যেতে দেওয়া হবে না।

—অর্থাৎ আমাদের এখানে বন্দী হয়ে থাকতে হবে। শাঙ্কো বলল।

—হ্যাঁ, তোমাদের এখন এখানেই বন্দী হয়ে থাকতে হবে। লড়াই শুরু হোক তখন তোমাদের কথা ভাবা যাবে, প্রৌঢ় বললেন।

শাঙ্কো চাপাস্বরে ওদের দেশীয় ভাষায় বলল, ফ্রান্সিস, আমরা বিপদে পড়লাম।

হুঁ। ফ্রান্সিস মুখে শব্দ করল। তারপর বলল, দেখুন, আমরা ভুল করে এখানে চলে এসেছি। আপনাদের রাজাটাজার কথা আমরা জানি না। ওসব জেনে কী হবে? ভুল করে এসে পড়েছি সেটা বুঝে আমাদের মুক্তি দিন।

—না। তোমাদের যুদ্ধে জেতে হবে আমাদের হয়ে, মানে রাজা পারকোনের হয়ে লড়াই করতে হবে। তোমাদের ছেড়ে দেওয়া হবে না।

—রাজা তুরীন আর রাজা পারকোন কবে যুদ্ধ শুরু করবেন, সেটা কে বলতে পারবে? ফ্রান্সিস জিজ্ঞেস করল।

—কেউ বলতে পারবে না, প্রৌঢ় উত্তর দিলেন।

—তাহলে আমাদের স্বাধীন চলাফেরায় কেন বাধা দিচ্ছেন?

—কারণ আছে। তাহলে তোমাদের একটু ইতিহাস বলতে হয়। এই অঞ্চলে আমার বাবা-ঠাকুর্দা মন্ত্রী হয়ে রাজাকে রাজ্যশাসনে সাহায্য করে গেছেন। উত্তরাংশে বর্তমান রাজা তুরীন ও তাঁদের পূবপুরুষরা রাজত্ব করে গেছেন। উত্তরাংশের সঙ্গে আমাদের দক্ষিণাংশের লড়াই প্রায়ই লেগে থাকে। আমার পিতা নির্বিবাদে থাকার জন্যে পাথর কেটে এই ঘর তৈরি করিয়েছিলেন। এখানেই পরিবার-পরিজন নিয়ে আমিও বাস করতে লাগলাম। এই পাহাড়ের ওপাশে একটা বড় লম্বাটে ঘর বানালাম—পাথরের। ওখানে সৈন্যাবাস তৈরি করলাম। সৈন্য সংগ্রহ করতে লাগলাম। আমরা ধীরে ধীরে রাজা তুরীনের সঙ্গে সম্মুখযুদ্ধের জন্যে প্রস্তুতি নিতে লাগলাম। তাই আমরা সৈন্যসংখ্যা বাড়িয়ে চলেছি। তোমাদের মতো অভিজ্ঞ যুবকদের আমাদের সৈন্যদলে রাখতেই হবে। লড়াই শুরু হলে তোমরা আমাদের রাজা পারকোনের হয়ে লড়াই করবে—এই জন্যেই তোমাদের চাই। কী রাজী? প্রৌঢ় বললেন।

—যদি রাজী না থাকি? শাঙ্কো বলল।

—তাহলে নির্জলা উপোস করে থাকতে হবে। ফলে তোমাদের কী অবস্থা হবে বুঝতেই পারছো।

ফ্রান্সিস বুঝল—সহজে মুক্তি পাওয়া যাবে না। ও বলল, আমরা একটু ভেবে দেখি। আসল কথা, সমুদ্রের তীরে আমাদের জাহাজ রয়েছে। সেই জাহাজে আছে আমার স্ত্রী ও বন্ধুরা। আমরা না ফিরলে ওদের দুশ্চিন্তা বাড়বে।

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে প্রৌঢ় বললেন, আমি এখানকার রাজা পারকোনের মন্ত্রী। বয়েস হয়েছে। নিয়মিত রাজসভায় যেতে পারি না। যাকগে, দুত পাঠাচ্ছি। তোমরা যে-খবর দিতে চাও তা বলে পাঠাও।

ফ্রান্সিস বলল—আমরা বিশেষ প্রয়োজন এদিকে এসেছি। আমাদের জাহাজে খাদ্য পানীয় জল ফুরিয়ে এসেছে। এখানে খাদ্য জল পাবো কি না।

—হ্যাঁ, পাবে। আমাদের মজুদ থেকে দেয়া যাবে। কিন্তু এর জন্যে দাম লাগবে।

শাঙ্কো সঙ্গে সঙ্গে কোমরের ফেট্টি থেকে দুটো স্বর্ণমুদ্রা বের করে মন্ত্রীমশাইয়ের হাতে দিল। মন্ত্রী খুশী। বলল—তোমরা দুজন তো খাদ্য জল নিয়ে যেতে পারবে না।

—সেইজন্যেই আপনার দূতকে দিয়ে খবর পাঠাবো—বস্তা জলের পীপে নিয়ে যেন ছ'সাতজন বন্ধু আসে। খাদ্য, জল নিয়ে যেতে পারবে।

—সেই খবল পাঠাও। মন্ত্রী বলল।

মন্ত্রী হাতে মৃদু তালি দিলেন। একজন শুটকো চেহারার সৈন্য এগিয়ে এল। মন্ত্রী বললেন—ওকাজা এরা কী বলে শোন। সেইমত কাজ কর।

ফ্রান্সিস বলল—ভাই, তুমি সমুদ্রতীরে জাহাজঘাটায় যাও। সেখানে বেশ কটা জাহাজ নোঙর করা আছে। তার মধ্যে যে জাহাজে একটা সাদা পতাকা উড়ছে দেখবে সেটাই আমাদের জাহাজ। জাহাজে উঠে তুমি হ্যারির সঙ্গে দেখা করবে। বলবে যে আমরা এখানে খাদ্য ও জলের ব্যবস্থা করেছি। ওরা ছ'সাতজন যেন বস্তা, পীপে নিয়ে আসে।

—বেশ। ওকাজা বলল।

—তুমিই ওদের এখানে নিয়ে আসবে। তুমি কি এখনই যাবে?

—হ্যাঁ, খেয়েটেয়ে যাবো। ওকাজা বলল।

ফ্রান্সিস নিশ্চিন্ত হল। যাক—খাদ্য আর জলের একটা ব্যবস্থা করা গেল।

মন্ত্রী বললেন—ওকাজা—এদের খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা কর। ফ্রান্সিসদের বললেন—যাও—ওর সঙ্গে।

ঘরের পেছনে একটা ঝর্ণা। দুজনে বেশ অবাকই হল। প্রকৃতির বিচিত্র রূপ। জল ঝরে পড়ছে। বেশ বড়ই ঝর্ণাটা। ফ্রান্সিস ভাবল এত জল পড়ছে কিন্তু যাচ্ছে কোথায়? দেখা গেল একটা ফাটলমত জায়গায় জল ঢুকে যাচ্ছে। অনেকেই স্নান করছে।

—স্নানটা সেরে নিলে হত না। শাঙ্কো বলল।

—না। আগে বন্ধুরা আসুক। খাদ্য জল নিয়ে যাক। তারপর নিশ্চিন্ত হয়ে স্নান খাওয়া। ফ্রান্সিস বলল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই বিস্কোরা পীপে বস্তা নিয়ে এল। মন্ত্রীমশাই ওকাজাকে বললেন—এদের প্রয়োজনমত খাদ্য দিয়ে দাও। ঝর্ণা থেকে জল দাও।

ফ্রান্সিস ইঙ্গিতে বিস্কোদের আসতে বলল। পেছনের দিকে একটা ঘরে নিয়ে এল। বস্তার পর বস্তা সাজানো। বোঝা গেল ভাঁড়ার ঘর। বিস্কোরা আটা ময়দা চিনি বস্তায় ঢেলে নিল।

—আরো লাগলে নিতে পারেন। ওকাজা বলল।

—না-না। পরে কোন বন্দরে খাবার যোগাড় করবো। বিস্কো বলল।

হ্যারি ফ্রান্সিসদের কাছে এল। বলল—কী ব্যাপার? তোমরা কী বন্দী?

—হ্যাঁ। যে কোন দিন যেকোন মুহূর্তে এদের লড়াই লাগতে পারে। এদের শত্রু এক রাজার সঙ্গে। আমাদের লড়াইতে জড়িয়ে দেবার মতলব। আমরাও চুপ করে আছি। দেখি কী হয়। একটু থেমে ফ্রান্সিস বলল—এখানে গুপ্ত ধনভাণ্ডারের খোঁজ পেয়েছি। কাজেই থাকছি।

—বেশ। হ্যারি বলল।

বিস্কো হ্যারিরা খাদ্যজল নিয়ে পাথরের সিঁড়ি দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল। হ্যারি ভাবল—খুব সময়মত খাবার জল পাওয়া গেছে। এখন ফ্রান্সিসরা কবে নাগাদ মুক্তি পায় সেটাই চিন্তার।

ওকাজা ফ্রান্সিসদের কাছে এল। দুজনকে একটা ঘরে নিয়ে এল। কিছু যুবক শুয়ে বসে আছে। এরা যোদ্ধা। মেঝেয় মোটা কম্বল পাতা। ফ্রান্সিসরা বসল।

দুপুরের খাওয়াদাওয়ার পর দুজনে নিজেদের ঘরে এসে শুয়ে পড়ল।

—ফ্রান্সিস—শাঙ্কো ডাকল।

—বলো—ফ্রান্সিস বলল।

—সব ব্যাপারেই বেশি ঔৎসুক ভালো না।

হ্যাঁ। এখন সেটা বুঝতে পারছি। বেশি জানতে গিয়ে এই ঝামেলায় পনলাম। নিচে নামাটা উচিত হয়নি।

শাঙ্কো বলল—শুনলাম, রাজা পারকোন প্রতি রোববার এখানে আসেন। তখন এই গর্ভগৃহে আর কেউ থাকতে পারে না। রাজা আর এক রাঁধুনি তাকে। সেই রাঁধুনিও রাতের খাবার তৈরি করে দিয়ে সন্ধ্যের আগেই এখান থেকে চলে যায়।

—তুমি এসব শুনেছো, না? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—হ্যাঁ, এসব শোনা অব্দি আমার মনে একটা সম্ভাবনা জাগছে। রাজা পারকোনের এই আচরণের অর্থ কী?

—দেখ শাঙ্কো, সংসারে নানা মনোভাবের মানুষ থাকে। রাজা পারকোনও এরকম এক মানুষ। তিনি মাঝে মাঝে একা হতে ভালোবাসেন। ফ্রান্সিস বলল।

—ফ্রান্সিস, আমার কিন্তু একটা সন্দেহ হয়। শাঙ্কো বলল।

—কী সেই সন্দেহ?

—নিশ্চয়ই এর পেছনে কোনো গুপ্ত ধনভাণ্ডারের ব্যাপার আছে।

—এ-বিষয়ে জেনেছো কিছু?

—না, তবে মনে হয় মন্ত্রীমশাই এ সম্বন্ধে সব জানেন। এই ব্যাপারে কী বলেন?

—চলো।

দুজনে মন্ত্রীমশাইয়ের কাছে গেল। তখন মন্ত্রীমশাই পাথরের বিছানায় শুয়ে পড়েছেন। শাঙ্কো আস্তে ডাকল, মন্ত্রীমশাই। মন্ত্রীমশাই সোজা উঠে বসলেন।

—কী ব্যাপার? মন্ত্রী বললেন।

ফ্রান্সিস বলল, দেখুন একটা ব্যাপার আমরা শুনেছি।

—কী শুনেছো? মন্ত্রী জানতে চাইলেন।

—শুনেছি রাজা পারকোনের পূর্বপুরুষের সঞ্চিত ধনভাণ্ডার নাকি এখানেই কোথাও গোপনে রাখা আছে। ফ্রান্সিস বলল।

হুঁ, তোমরা ঠিকই শুনেছো। রাজা পারকোনের পিতা অনেক চেষ্টা করেও তার হদিস পাননি।

ফ্রান্সিস একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, সমস্ত ব্যাপারটা আমাকে বলুন, আমি সেই ধনভাণ্ডারের হদিস বের করবো।

মন্ত্রী একটু অবাকই হলেন। তারপর বললেন, পারবে সেই ধনভাণ্ডার খুঁজে বের করতে?

আমার কিছু জানা প্রয়োজন। আপনারা যদি সেসব আমাকে জানান তাহলে আমি পারবো। ফ্রান্সিস বলল।

—ঠিক আছে, বলছি সব। এই বলে মন্ত্রীমশাই পূর্বাপর ঐ এলাকার রাজাদের কথা সংক্ষেপে বললেন। সবশেষে যোগ করলেন, রাজা পারকোন আর রাজা তুরীন দুজনেরই ধারণা কোনো গর্ভগৃহে সেই ধনভাণ্ডার গোপনে রাখা হয়েছে। সবচেয়ে সহজ হতো যদি রাজা পারকোনের পিতামহ পুত্রকে বলে যেতে পারতেন কোথায় গোপনে রাখা আছে সব ধনসম্পদ। কিন্তু তিনি তা বলে যাননি।

ফ্রান্সিস একটু ভেবে নিয়ে বলল, আমি রাজা পারকোনের সঙ্গে কথা বলতে চাই। আপনি ব্যবস্থা করে দিন।

—ঠিক আছে। তবে কাল রোববার। রাজামশাই একা এখানে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত কাটাবেন। এ সময় তিনি কারো সঙ্গে কথা বলেন না। চুপচাপ শুয়ে থাকেন।

—তাহলে তো গর্ভগৃহে কারো থাকা চলবে না। শাঙ্কো বলল।

—পাহাড়ের ওপারে আরো একটা গৃহ আছে, সেখানে থাকতে হবে।

ফ্রান্সিস বলল, তাহলে যাচ্ছি। রাজা পারকোনকে আমার কথা বলবেন। দেখুন উনি রাজী হন কি না।

—নিশ্চয়ই রাজী হবেন। কত দেশ-বিদেশের লোককে তিনি নিয়ে এসে একানে রেখেছেন ঐ গুপ্ত ধনভাণ্ডারের উদ্ধারের জন্যে। কিন্তু কেউ পারেননি। অগত্যা প্রায় হাল ছেড়ে দিয়েছেন। মন্ত্রী বললেন।

—চলো।

দুজনে মন্ত্রীমশাইয়ের কাছে গেল। তখন মন্ত্রীমশাই পাথরের বিছানায় শুয়ে পড়েছেন। শাঙ্কো আস্তে ডাকল, মন্ত্রীমশাই। মন্ত্রীমশাই সোজা উঠে বসলেন।

—কী ব্যাপার? মন্ত্রী বললেন।

ফ্রান্সিস বলল, দেখুন একটা ব্যাপার আমরা শুনেছি।

—কী শুনেছো? মন্ত্রী জানতে চাইলেন।

—শুনেছি রাজা পারকোনের পূর্বপুরুষের সঞ্চিত ধনভাণ্ডার নাকি এখানেই কোথাও গোপনে রাখা আছে। ফ্রান্সিস বলল।

হুঁ, তোমরা ঠিকই শুনেছো। রাজা পারকোনের পিতা অনেক চেষ্টা করেও তার হদিস পাননি।

ফ্রান্সিস একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, সমস্ত ব্যাপারটা আমাকে বলুন, আমি সেই ধনভাণ্ডারের হদিস বের করবো।

মন্ত্রী একটু অবাকই হলেন। তারপর বললেন, পারবে সেই ধনভাণ্ডার খুঁজে বের করতে?

আমার কিছু জানা প্রয়োজন। আপনারা যদি সেসব আমাকে জানান তাহলে আমি পারবো। ফ্রান্সিস বলল।

—ঠিক আছে, বলছি সব। এই বলে মন্ত্রীমশাই পূর্বাপর ঐ এলাকার রাজাদের কথা সংক্ষেপে বললেন। সবশেষে যোগ করলেন, রাজা পারকোন আর রাজা তুরীন দুজনেরই ধারণা কোনো গর্ভগৃহে সেই ধনভাণ্ডার গোপনে রাখা হয়েছে। সবচেয়ে সহজ হতো যদি রাজা পারকোনের পিতামহ পুত্রকে বলে যেতে পারতেন কোথায় গোপনে রাখা আছে সব ধনসম্পদ। কিন্তু তিনি তা বলে যাননি।

ফ্রান্সিস একটু ভেবে নিয়ে বলল, আমি রাজা পারকোনের সঙ্গে কথা বলতে চাই। আপনি ব্যবস্থা করে দিন।

—ঠিক আছে। তবে কাল রোববার। রাজামশাই একা এখানে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত কাটাবেন। এ সময় তিনি কারো সঙ্গে কথা বলেন না। চুপচাপ শুয়ে থাকেন।

—তাহলে তো গর্ভগৃহে কারো থাকা চলবে না। শাঙ্কো বলল।

—পাহাড়ের ওপারে আরো একটা গৃহ আছে, সেখানে থাকতে হবে।

ফ্রান্সিস বলল, তাহলে যাচ্ছি। রাজা পারকোনকে আমার কথা বলবেন। দেখুন উনি রাজী হন কি না।

—নিশ্চয়ই রাজী হবেন। কত দেশ-বিদেশের লোককে তিনি নিয়ে এসে একানে রেখেছেন ঐ গুপ্ত ধনভাণ্ডারের উদ্ধারের জন্যে। কিন্তু কেউ পারেননি। অগত্যা প্রায় হাল ছেড়ে দিয়েছেন। মন্ত্রী বললেন।

ফ্রান্সিস, শাঙ্কো নিজের জায়গায় ফিরে এল। শুয়ে পড়তে পড়তে শাঙ্কো বলল, —ফ্রান্সিস কিছু সূত্রটুত্র পেলে?

—এই গর্ভগৃহেই আছে সেই গোপন ধনভাণ্ডার। ফ্রান্সিস উত্তর দিল।

—এটা ভাবছো কেন? শাঙ্কো প্রশ্ন করল।

—রাজা পারকোন এই গর্ভগৃহে এসে থাকেন। অন্য কোনো গর্ভগৃহে যান না। কেন? ফ্রান্সিস বলল।

—এই গর্ভগৃহেই ভালো লাগে থাকতে তাই। উত্তরে শাঙ্কো বলল।

—উহুঁ, ব্যাপারটা শুধু ভালো লাগা নয়। হয়তো রাজা পারকোন সোনা-হীরে-মুক্তোর ভাণ্ডারের কিছু হদিস করতে পেরেছেন। এ অবস্থায় হয়তো আমাদের অনুমতি দেবেন না।

পরদিন অন্ধকার থাকতে থাকতেই সবাই তল্পি-তল্পা গুটিয়ে সেই গর্ভগৃহ ছেড়ে অন্যত্র চলে গেল সবাই।

ভোরের দিকে রাজা পারকোন এলেন। গায়ে সাধারণ পোশাক। খাপে ভরা তরোয়াল আনেননি। মাথায় মুকুট নেই।

গর্ভগৃহে নামবার পাথরের সিঁড়ির কাছে মন্ত্রীমশাই দাঁড়িয়েছিলেন। আস্তে আস্তে বললেন, এক বিদেশী ভাইকিংকে পেয়েছি। ও বলছে, গুপ্ত ধনভাণ্ডার উদ্ধার করতে পারবে। রাজা চমকে মন্ত্রীর দিকে তাকালেন। হাতের ইশারায় জানালেন নিয়ে আসতে। রাজা নিচে নেমে গেলেন। ফ্রান্সিসরা কাছেই ছিল। মন্ত্রীমশাই বললেন, দেরি করো না। চলো।

ফ্রান্সিস একা মন্ত্রীমশাইয়ের সঙ্গে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামল। দেখল রাজামশাই মন্ত্রীর আসনে বসে আছেন। সামনে পাথরের টেবিলে কালির দোয়াত আর কলম।

ফ্রান্সিস ও মন্ত্রী ঐ টেবিলের কাছে এল। রাজামশাই কাগজটা এগিয়ে দিলেন। রাজামশাই কাগজে লিখলেন, তুমি সব ঘটনা জানো?

—হ্যাঁ, মোটামুটি জানি। ফ্রান্সিস মুখে বলল।

তোমার নাম কী? রাজা লিখলেন।

—ফ্রান্সিস।

গুপ্তধন খোঁজখুঁজির জন্যে তোমার যা প্রয়োজন পড়বে মন্ত্রীমশাই সেসবের ব্যবস্থা করবেন। তারপর লিখলেন—গুপ্তধন তুমি যদি উদ্ধার করতে পারো সে সবকিছুই আমার, তুমি কিছুই পাবে না।

ফ্রান্সিস পড়ে মৃদু হেসে বলল, তাই হবে।

রাজা লিখলেন—সন্দেহ নেই বেশ কষ্ট করে তোমাকে গুপ্তধন উদ্ধার করতে হবে। তার বদলে তুমি কিছুই চাও না?

—না। ফ্রান্সিস মাথা নেড়ে বলল।

ঠিক আছে। আগে তো উদ্ধার হোক তারপর দেখা যাবে। যাও। কাজ শুরু কর। রাজা লিখলেন।

মন্ত্রী আর ফ্রান্সিস ওপরে উঠে এল। শাঙ্কো এগিয়ে এল। বলল, ফ্রান্সিস, কী কথা হলো?

—উনি রাজী হয়েছেন। মন্ত্রীমশাই সব ব্যাপারে আমাদের সাহায্য করবেন।

মন্ত্রী বললেন, এখানে আপনারা বসুন। আপনাদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করছি। মন্ত্রী চলে গেলেন।

কিছু পরে এক সৈন্য ওদের জন্যে সকালের খাবার নিয়ে এল। একটা পাথরের চাঁইয়ের গায়ে ওরা বসল। খাবার খেতে লাগল। সৈন্যটি দাঁড়িয়ে ছিল। খাওয়া শেষ হতে বলল, আপনারা আসুন। আপনাদের জন্যে একটা ছোট ঘরের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

দুজনে ঐ সৈন্যটির পেছনে পেছনে চলল। ছোট পাহাড়টার পরেই আর একটা গর্ভগৃহ। সিঁড়ি দিয়ে নেমে ওরা একটা ছোট ঘরের সামনে এল। সৈন্যটি বলল, এই ঘরে আপনারা দুজন থাকবেন। কোনো কিছুর দরকার হলে আমাদের বলবেন। সৈন্যটি চলে গেল।

রাত শেষ হলো। রাজা পারকোনের মৌনব্রত শেষ হলো। তিনি রাজবাড়িতে ফিরে গেলেন। ফ্রান্সিসরা আবার গর্ভগৃহে ফিরে এল।

এইবার ফ্রান্সিস কাজে নামল। শাঙ্কোকে নিয়ে রাজবাড়ি থেকে শুরু করে সব গর্ভগৃহেই গেল। একাগ্র দৃষ্টিতে সম্ভাব্য সব জায়গাগুলি দেখতে লাগল। পাথুরে দেয়াল। ঘরগুলো প্রায় একইরকম। সব গর্ভগৃহ। একই রীতি মেনে তৈরি। ফ্রান্সিস বসেছিল। এবার উঠে দাঁড়াল। বলল, শাঙ্কো, চলো মন্ত্রীমশাইয়ের কাছে।

দুজনে মন্ত্রীমশাইয়ের কাছে এল। মন্ত্রী কাগজে কী লিখছিলেন। বললেন, আবার আমার কাছে কেন?

—সন্দেহ না মিটলে আপনার কাছেই বারবার আসতে হবে। ফ্রান্সিস বলল।

—বলো কী ব্যাপার? মন্ত্রীমশাই জানতে চাইলেন।

—আচ্ছা, এই গর্ভগৃহগুলো কি একই সময়ে একই সঙ্গে তৈরি হয়েছিল? ফ্রান্সিস প্রশ্ন করল।

—এটা তো বলা সম্ভব নয়। তবে রাজা পারকোন এ বিষয়ে কিছু বলতে পারবেন।

—কোন গর্ভগৃহটা সবচেয়ে পুরোনো? ফ্রান্সিস জানতে চাইলো।

—সেটাও বলতে পারবো না। মন্ত্রী বললেন।

—রাজা পারকোন? ফ্রান্সিস বলল।

—হয়তো তাঁর কিছু ধারণা আছে।

—আমি রাজার সঙ্গে দেখা করবো। একটু ব্যবস্থা করুন। ফ্রান্সিস বলল।

—বেশ। আমি কিছুক্ষণ পরেই রাজসভায় যাচ্ছি। তুমিও চলো।

ফ্রান্সিসরা মন্ত্রীর সঙ্গে যখন রাজসভায় এল তখন বেশ বেলা হয়েছে। মন্ত্রী নিজের আসনের দিকে চলে গেলেন। ফ্রান্সিসরা সভার কাজ দেখতে লাগল। রাজা বিচার করছেন।

একসময় সভা শেষ হলো। প্রতিহারীরা ব্যস্ত হয়ে পড়ল লোকজন সামলাতে। রাজা উঠবেন সিংহাসন থেকে। মন্ত্রী এগিয়ে গিয়ে রাজাকে কিছু বললেন। রাজা আবার বসে পড়লেন। একজন প্রতিহারী এসে ফ্রান্সিসদের ডেকে নিয়ে গেল। ফ্রান্সিসরা একটু মাথা নুইয়ে শ্রদ্ধা জানিয়ে দাঁড়াল। রাজা বললেন, কোনো বিষয়ে কিছু জানতে চাও?

—আমরা একটা সমস্যায় পড়েছি।

—কী সমস্যা।

—আপনার পিতামহের নির্দেশে কবে ক'টা গর্ভগৃহ তৈরি হয়েছিল?

রাজা একটু ভাবলেন। তারপর বললেন, যে গর্ভগৃহে আমি রবিবার যাই সেই গর্ভগৃহটি আমার প্রপিতামহের আমলে নির্মিত।

অন্য গর্ভগৃহগুলো? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

পরে আমার পিতামহ অন্য গর্ভগৃহগুলো তৈরি করেছিলেন।

তবে মান্যবর রাজা, বোঝা যাচ্ছে যে ঐ গর্ভগৃহটাই প্রথম তৈরি হয়েছিল। ফ্রান্সিস বলল।

আমরাও তাই মনে হয়। রাজা বললেন।

মান্যবর রাজা, এই থেকে একটা কথা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে—আপনার প্রপিতামহই সব ধনসম্পদ লুকিয়ে রেখেছিলেন। তারপর থেকে আপনার পিতামহ, আপনার পিতা সকলেই ঐ গুপ্তধন খুঁজেছেন কিন্তু কেউ সন্ধান পাননি।

রাজা একটু থেমে বললেন, তোমার বুদ্ধির প্রশংসা করি। তোমার অনুমান মনে হয় ঠিক।

—এবার আমাদের কাজটা অনেক সহজ হলো। ফ্রান্সিস বলল।

—কী করে? রাজা জানতে চাইলেন।

—এবার শুধু আপনার প্রপিতামহের তৈরি গর্ভগৃহটাই ভালো করে দেখতে হবে। অন্য গর্ভগৃহগুলো পরবর্তীকালের।

—কথাটা ঠিক বলেছো। এই সম্ভাবনার কথা মনে রেখেই তুমি এগিয়ে চল। রাজা কাঠের সিংহাসন ছেড়ে উঠলেন। ফ্রান্সিসরাও সম্মান দেখিয়ে উঠে দাঁড়াল।

প্রায় মাসখানেক সময় ধরে শোনা যাচ্ছিল যে যে কোনোদিন রাজা তুরীন রাজা পারকোনের রাজ্য আক্রমণ করতে পারেন। সবশেষে সেটাই ঘটল।

সেদিন বিকেল থেকেই আকাশ প্রায় অন্ধকার মেঘে ঢাকা। সন্ধ্যের মুখে জোর হাওয়া ছুটল। ফ্রান্সিসরা প্রথম তৈরি গর্ভগৃহে ছিল। বাইরের প্রাকৃতিক ঝড়-ঝঞ্ঝার আভাসও ওরা পায়নি।

হঠাৎ ফ্রান্সিসরা দেখল সিঁড়ি বেয়ে দ্রুত পায়ে চার-পাঁচজন সৈন্য নেমে এল। চিৎকার করে বলল, সবাই তৈরি হও। রাজা তুরীন আমাদের দেশ আক্রমণ করেছে। চলে এসো সব।

সৈন্যদের মধ্যে সাড়া পড়ে গেল। ওরা দ্রুতপায়ে ছুটল অস্ত্রাগারের দিকে। পোশাকের দিকে তাকাবার সময় নেই। তরোয়াল হাতে ওরা দলে দলে বেরিয়ে এল। ওরা সবাই উঠে গেলে প্রৌঢ় মন্ত্রী সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলেন। ফ্রান্সিসরা ছুটে তাঁর কাছে গেল। মন্ত্রী বললেন, সবাই যাও। প্রচণ্ড লড়াই শুরু হয়েছে!

ফ্রান্সিসরা বুঝে উঠতে পারল না কী করবে? দুজনে মন্ত্রীমশাইয়ের বিছানার কাছে এল। মন্ত্রী তখনও অল্প অল্প হাঁপাচ্ছেন। তিনি আধশোয়া হয়ে আছেন। ফ্রান্সিস বলল, রাজা তুরীন কি বেশি সংখ্যায় সৈন্য এনেছেন?

—ঠিক বুঝতে পারলাম না। ঐ অন্ধকারের মধ্যে কিছুই ভালোভাবে দেখা যাচ্ছিল না। বিদ্যুৎ চমকাতে যা দেখেছি। কিন্তু তোমরা লড়াইতে নামলে না কেন?

মন্ত্রীমশাই, কিছু মনে করবেন না। আপনাদের দুই দেশই আমাদের কাছে বিদেশ। আপনাদের লড়াই আপনাদের। সমস্যার সমাধান আপনারাই করবেন। ফ্রান্সিস বলল।

—কথাটা ঠিক। কিন্তু বিপদের দিনে রাজা পারকোনের হয়ে লড়াইতে নামলে রাজা খুশি হতেন।

ওপরে যাচ্ছি। অবস্থা দেখে সব বুঝে নিই। ফ্রান্সিস বলল।

ফ্রান্সিস সিঁড়ির দিকে চলল। সিঁড়ির মুখের কাছে দুজন সৈন্য তরোয়াল হাতে দাঁড়িয়ে আছে। ওরা বলে উঠল, উঠবেন না, উঠবেন না, জোর লড়াই চলছে।

—আমরা লড়াই দেখবো। শাঙ্কো বলল।

—খালি হাতে থাকবেন না। তরোয়াল আনুন। সৈন্যরা বলল।

ফ্রান্সিস শাঙ্কোর দিকে তাকাল। শাঙ্কো ছুটে গিয়ে দুটো তরোয়াল নিয়ে এলো। এবার দুজনে ওপরে উঠে এল। তেমন বৃষ্টি আর নেই। তবে মাঝেমধ্যেই বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে।

বিদ্যুতের সেই হঠাৎ আলোতেই দেখা যাচ্ছে দু'দল সৈন্যের মধ্যে প্রবল লড়াই চলছে। ফ্রান্সিস বলল, শাঙ্কো, রাজা পারকোন আমাদের সঙ্গে ভালো

ব্যবহার করেছেন। গুপ্তধন উদ্ধারের কাজে যাতে আমাদের কোনো অসুবিধে না হয় তা দেখার জন্য মন্ত্রীকে আদেশ দিয়েছেন। মন্ত্রী বললেন, এমন সৎ ও ঈশ্বরভক্ত রাজা দেখা যায় না।

—হ্যাঁ, তাঁকে আমাদের সাহায্য করা খুবই প্রয়োজন। শাঙ্কো উত্তর দিল।

—তাহলে চলো রাজা তুরীনকে বন্দী করি।

—চলো।

ফ্রান্সিসরা রাজা তুরীনকে খুঁজতে লাগল। দু'পক্ষের সৈন্যরা গোবরভেজা। ফ্রান্সিস রাজা তুরীনের একজন সৈন্যকে পেল। সে তাকে বলল, রাজা তুরীন কোথায় আছেন? সৈন্যটি রেগে গেল। বলল, তুমি বিদেশি, তুমি কেন আমাদের রাজাকে খুঁজছো?

—প্রয়োজন আছে। এই লড়াই থামাতে চাই। ফ্রান্সিস বলল।

—তুমি পারবে না।

—দেখা যাক, তুমি শুধু বলো রাজা তুরীন কোথায়? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—চলো। নিয়ে যাচ্ছি। সৈন্যটি বলল।

অন্ধকারের মধ্যে প্রায় হাতাহাতি লড়াই চলছে। তার মধ্যে দিয়ে সৈন্যটি ফ্রান্সিসদের নিয়ে চলল। অল্পক্ষণের মধ্যেই ওরা একটা ঝাঁকড়া-মাথা গাছের কাছে এল। সৈন্যটি ইঙ্গিতে গাছের নিচে হাত-পা ছড়িয়ে বসে থাকা একজন মধ্যবয়সীকে দেখাল। রাজা তুরীন বেশ অসহায়ভাবে বসে আছেন। মাথার কাঁচাপাকা চুল নাকমুখ পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে। পোশাক সব ভিজে, বাঁ হাতে বৃষ্টিভেজা রক্তের দাগ।

তখন লড়াই থেমে গেছে। চিৎকার আর তরোয়ালে-তরোয়ালে ঠোকাঠুকির ধাতব শব্দ বন্ধ।

রাজা তুরীনের চারপাশে রাজা পারকোনের চার-পাঁচজন সৈন্য খোলা তরোয়াল হাতে দাঁড়িয়ে আছে।

ফ্রান্সিস রাজা তুরীনের সামনে এসে দাঁড়াল। বলল, মাননীয় রাজা, আপনার ও রাজা পারকোনের মধ্যে লড়াই চলছে শুধু একটা বিষয় নিয়ে—কে পাবে অতীতের এক রাজার গুপ্তধন।

রাজা তুরীন একটু অবাক হয়ে বিদেশি যুবকের দিকে তাকিয়ে রইলেন। ফ্রান্সিস বলতে লাগল, কিন্তু গুপ্তধন গুপ্তই থেকে গেছে, অন্তত এখনো পর্যন্ত। একটু থেমে ফ্রান্সিস বলতে লাগল, মাননীয় রাজা তুরীন, আমার বিনীত অনুরোধ যুদ্ধের কথা ভুলে যান। পরাজিত হলেও আপনার কথার মূল্য আমার কাছে কম নয়। আজকে আপনি অত্যন্ত পরিশ্রান্ত। তাড়াতাড়ি খেয়ে আপনি ঘুমিয়ে পড়ুন। কাল রাজা পারকোনের রাজসভায় আপনাকে যেতে হবে। আমরাই নিয়ে যাবো।

—কী আর বলবো সেখানে গিয়ে! রাজা তুরীন অসহায়ভাবে বললেন।

—আপনাকে কিছুই বলতে হবে না। শুধু আমার কাজটায় সম্মতি দেবেন। ফ্রান্সিস বলল।

—দেখি। কথাটা বলে রাজা তুরীন হতাশভাবে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

ফ্রান্সিস শান্তভাবে বলল, মান্যবর রাজা, দুঃখ করবেন না। আমি আপনাকে আপনার রাজ্য ফিরিয়ে দিতে চেষ্টা করবো। আপনি শান্ত হোন।

রাতে একটু তাড়াতাড়িই খাওয়া-দাওয়া সারল সবাই। রাজা তুরীনকে শুকনো পোশাক দেওয়া হলো। শোবার জায়গাও করে দেওয়া হলো।

পরদিন বেশ ভোরে ফ্রান্সিসের ঘুম ভাঙল। ও আর শুয়ে রইল না। উঠে মন্ত্রীর কাছে এল। মন্ত্রী উঠে বসেছিলেন। ফ্রান্সিস বলল, মন্ত্রীমশাই, আপনাকে একটা কাজ করতে হবে।

—কী কাজ?

—রাজসভায় রাজা তুরীনকে বসাবার ব্যবস্থা করবেন।

—রাজা তুরীন হয়তো রাজসভায় যেতেই চাইবে না।

—সেটা আমি দেখবো। আপনি শুধু সম্মান জানিয়ে তাঁকে বসতে দেবেন।

—এখন রাজা পারকোনকে বলা। অবশ্য আমিও বলবো।

ফ্রান্সিস রাজা তুরীনের কাছে এল। রাজা তুরীন অল্প জায়গার মধ্যেই পায়চারি করছিলেন। মাথা নিচু, দু'হাত পেছনে জড়িয়ে পায়চারি করছিলেন। চোখের নিচে কালি। মাথার চুল অবিন্যস্ত। ফ্রান্সিস সামনে এসে দাঁড়াল। রাজা তুরীনও দাঁড়িয়ে পড়লেন। ভারী গলায় বললেন, কী ব্যাপার? কারাগারে নিয়ে যাবে?

—না না, সেসব কিছু না। একটু থেমে বলল, মান্যবর রাজা, আমি বিদেশি ভাইকিং। কখন আসি কখন যাই। আপনাকে একটা বিনীত অনুরোধ।

—হুঁ। রাজা মুখে শব্দ করলেন।

—দু'তিন পুরুষ আগে একজন রাজা, আপনাদের পূর্বপুরুষদের একজন, পারিবারিক হীরে মুক্তো সোনার ভাণ্ডার গোপনে রেখে দিয়েছিলেন। কিন্তু তাতে আপনার আর রাজা পারকোনের শত্রুতা কমেনি। এই ভাবে দুটো পরিবারের মধ্যে মাঝে মাঝেই লড়াই দীর্ঘদিন যাবৎ চলে আসছে। ঐ গুপ্ত ধনভাণ্ডার কে পাবে? ফ্রান্সিস বলল।

—তুমি এত কিছু জানলে কী করে? তুরীন বললেন।

—রাজা পারকোনের মন্ত্রীর কাছ থেকে। একটু থেমে ফ্রান্সিস বলল, এবার আমার অনুরোধ, আপনি আজ রাজা পারকোনের রাজসভায় আসুন। আপনাদের বিবাদ-বিসম্বাদ আমি মিটিয়ে দিতে চাই।

—পারবে? মৃদু হেসে রাজা তুরীন বলেন।

—আপনারা দুজনে আমার প্রস্তাব সম্মত হলেই পারবো। তাহলে সকালের খাওয়া সেরেই আমরা যাবো?

রাজা তুরীন কিছু বললেন না।

ফ্রান্সিস আর মন্ত্রীর চেষ্টায় রাজা তুরীন রাজসভায় এলেন। মন্ত্রী তাঁকে এক অমাত্যের আসনে বসালেন। এসময় ফ্রান্সিস রাজা পারকোনের কাছে বলল—মাননীয় রাজা, এবার আমি কিছু কথা বলতে চাই।

—বেশ বলো। রাজা পারকোন বললেন। ফ্রান্সিস রাজা তুরীনকে একই কথা বলতে রাজা তুরীন সম্মতি জানান।

ফ্রান্সিস রাজসভায় দাঁড়িয়ে বলতে লাগল, মান্যবর রাজা, অতীতের ইতিহাস আপনারা জানেন। আমি সে সব কথায় যাবো না। দুই রাজাকে অনুরোধ করছি আপনারা ধনসম্পদের লোভে দীর্ঘকাল ধরে লড়াই চালিয়ে যাবেন না। আমার বিনীত অনুরোধ আপনারা শত্রুতা ভুলে যান। যে ধনসম্পদ নিয়ে এই লড়াই সেই গুপ্তধন এখনও কেউ উদ্ধার করতে পারেনি। কিন্তু আমি পারবো।

দুই রাজা ভীষণভাবে চমকে উঠলেন, এই যুবকটি বলে কি!

—কত বছর ধরে খোঁজ চলছে। কেউ পারেনি, তুমি পারবে? তুরীন বললেন।

—আমাকে দিন সাতেক সময় দিন, আমি তার মধ্যেই পারবো। ফ্রান্সিস বলল।

ফ্রান্সিস থামল। তারপর বলতে লাগল, আপনারা আর পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করবেন না। মাননীয় রাজা পারকোন, রাজা তুরীনকে তাঁর সৈন্যসহ মুক্তি দিন।

—বেশ। পারকোন বললেন।

ফ্রান্সিস বলল, এইবার প্রশ্ন ঐ ধনসম্পত্তি কার? কে পাবে ঐ ধনসম্পদ?

—আমার। রাজা তুরীন বেশ চড়া গলাতেই বললেন।

—আমার। রাজা পারকোন বললেন।

ফ্রান্সিস বলল—না, কারো একার নয়। ঐ ধনসম্পদ দু'ভাগে ভাগ করে দুজনকে দেওয়া হবে।

—না। সব চাই আমি। রাজা পারকোন বলে উঠলেন।

—ভাগ করা চলবে না, সবটাই আমার। রাজা তুরীন বলে উঠলেন।

—তাহলে, ফ্রান্সিস বেশ গলা চড়িয়েই বলল, তাহলে আমি সেই গোপন সম্পদ আর খুঁজবো না। আমি চলে যাচ্ছি। আপনাদের সমস্যা আপনারাই মেটান।

ফ্রান্সিস রাজসভার মঞ্চ থেকে নেমে আসছে তখনই শাঙ্কো এসে ফ্রান্সিসকে থামাল। রাজাদের দিকে তাকিয়ে গলা চড়িয়ে বলল, এর নাম ফ্রান্সিস। আমার প্রাণের বন্ধু। ফ্রান্সিস এর আগে অনেক গুপ্তধন খুঁজে বের করেছে। ও যখন বলছে এই গুপ্ত ধনভাণ্ডার খুঁজে বের করতে পারবে তখন জানবেন এটা ফাঁকা কথা নয়। গুপ্তধন উদ্ধারের এই চেষ্টাই শেষ চেষ্টা। আপনারা ওর সাহায্য নিন।

—বুঝলাম, কিন্তু সেসব দু' ভাগ হবে কেন। রাজা পারকোন বললেন।

—এটাও মেনে নিন। নইলে ঐ ধনসম্পত্তি গুপ্তই থাকবে। আর কেউ উদ্ধার করতে পারবে না। ভেবে দেখুন। শাঙ্কো বলল।

রাজসভায় নৈঃশব্দ্য। সবাই রাজার দিকে তাকিয়ে। হঠাৎই রাজা তুরীন বললেন, এই সমস্যাটা দুই রাজ্যের মধ্যে চলে আসছে দীর্ঘকাল। যাকগে, আমি অর্ধেক পেলেই সন্তুষ্ট থাকবো।

ফ্রান্সিস রাজা পারকোনের দিকে তাকাল। পারকোন মন্ত্রীকে ডেকে কী বললেন। তারপর বললেন, ঠিক আছে, আমিও অর্ধেক চাই। সভাঘরে সকলেই আনন্দপ্রকাশ করল।

রাজা তুরীন ও রাজা পারকোনের মধ্যে শত্রুতা মিটে গেল। ওই দুদেশের প্রজারা খুশি হল। যুদ্ধের পরিবেশ কারোই ভালো লাগছিল না। সবাই শান্তি চাইছিল।

রাজা তুরীন তাঁর সৈন্যবাহিনী নিয়ে নিজের দেশে ফিরে গেলেন। দুদেশের মধ্যে শান্তি স্থাপিত হল এইজন্যে একদিন উৎসব হল। ফ্রান্সিস শাঙ্কোকেও উৎসবে যেতে অনুমতি দেওয়া হল।

প্রাকৃতিক খেয়ালেই গড়ে ওঠা একটা বিরাট পাথরের বেদীমত। বোঝা গেল এই পাথরের চাতালেই উৎসব-টুৎসব হয়। চারপাশে দর্শকরা বসেছে। চাতাল ঘিরে বড় বড় প্রদীপজ্বালা হয়েছে। তাতে বেশ আলোকিত হয়েছে বেদী। প্রথমে মন্ত্রীমশাই বেদীতে উঠে এলেন। ভাঙা গলায় যতটা জোরে সম্ভব বললেন—দেশবাসীরা—আজকে আমাদের খুব আনন্দের দিন। আমরা যুদ্ধে জয়লাভ করেছি। তার চেয়েও বড় কথা রাজা তুরীনের সঙ্গে আমাদের সমঝোতা হয়েছে। আমরা এখন পরস্পরের বন্ধু। এই উপলক্ষে আজকের এই আনন্দ সন্ধ্যা। একটু থেমে মন্ত্রী বললেন—আপনারা আনন্দ উপভোগ করুন।

মন্ত্রীমশাই বেদী থেকে নেমে গেলেন।

একদল সুসজ্জিত পুরুষ এল। বাজনদাররা বাজনা বাজাতে লাগল। হাতের রুমাল নেড়ে নেড়ে বাজনার তালে তালে ওরা নাচতে লাগল। নাচ বেশ জমে উঠল।

এরপর এল একদল মেয়ে। তারা সুরেলা গলায় গান গাইতে গাইতে ঘুরে

ঘুরে নাচতে লাগল। নাচ জমে উঠল। দর্শকরা জোর গলায় উৎসাহ দিতে লাগল। নাচ শেষ হল।

এবার এল বেঢপ পোশাক পরা একটি হোঁৎকা পুরুষ। হেঁড়ে গলায় সে কি গান। শ্রোতারা হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়তে লাগল।

তারপর আরো কিছুক্ষণ নাচগান হল। উৎসব শেষ। শ্রোতা দর্শকরা বাড়ি ফিরে চলল। ফ্রান্সিসরাও ফিরে এল।

সেদিন সন্ধ্যেবেলা ওকাজা ফ্রান্সিসদের কাছে এল। বলল—মাননীয় রাজা আপনাদের ডেকেছেন।

—কেন বলো তো?

—কী করে বলবো। আপনারা চলুন। ওকাজা বলল।

—বেশ চলো।

ফ্রান্সিস, শাঙ্কো তৈরি হয়ে রাজার গর্ভগৃহের দিকে চলল।

এই গর্ভগৃহ মোটামুটি সুসজ্জিত মশালের বদলে মোটা পলতের প্রদীপ জ্বলছে। পাথরের আসনে গদীপাতা। তাতে রাজা পারকোন বসে আছেন।

ফ্রান্সিসরা মাথা নুইয়ে সম্মান জানিয়ে দাঁড়াল।

—তোমরা বিদেশি—রাজা বললেন—এ দেশের সঙ্গে তোমাদের কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু আজ আমি বিপদগ্রস্ত। আমাদের পশ্চিমে একটি রাজ্য আছে—জামিনা—সেই রাজ্যের রাজা কাদর্জা এক নৃশংস রাজা। আমার রাজ্যের ওপর তাঁর বড় লোভ। কী করে আমার রাজ্য দখল করা যায় এই তার চিন্তা। অবশ্য আর একটা লোভও আছে। আমার পূর্বপুরুষদের সঞ্চিত গুপ্তধন। সে এই গুপ্তধন উদ্ধারের চেষ্টা করবে।

—জানি না রাজা কাদর্জা কতটা বুদ্ধিমান। গুপ্তধন উদ্ধার বেশ জটিল ব্যাপার। ফ্রান্সিস বলল।

—উদ্ধার করতে পারুক না পারুক—চেষ্টা তো করবে। এটাই কাদর্জার উদ্দেশ্য। রাজা পারকোন বললেন।

—বোঝাই যাচ্ছে কাদর্জা লড়াই চায়। আপনি আক্রান্ত হলে লড়াইই করুন। ফ্রান্সিস বলল।

—আক্রান্ত হলে লড়াই তো করতেই হবে। সেক্ষেত্রে তোমাদের সাহায্য চাই। যদিও এ দেশ তোমাদের নয় তবু আমার অনুরোধ যুদ্ধ হলে আমাদের হয়ে তোমরা লড়াই কর। রাজা পারকোন বললেন।

—নিশ্চয়ই করবো। অবশ্য তার আগে বন্ধুদের সম্মতিটা নিতে হবে। ফ্রান্সিস বলল।

—তাই নেবে। রাজা বললেন।

—কাদর্জা কবে আক্রমণ করতে পারে বলে আপনার মনে হয়? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—যেকোন দিন। কাদর্জা বিদেশ থেকে সৈন্য আমদানি করছে। সৈন্যসংখ্যা বাড়িয়েছে। অস্ত্রশস্ত্র এনেছে। তাতেই সন্দেহ যেকোন দিন আক্রমণ করতে পারে। রাজা বললেন।

—রাজা কাদর্জা সম্বন্ধে কিছু জানতে চাই। কী ধরনের মানুষ। কতটা বুদ্ধি ধরে। গুপ্তধনের লোভ কতটা। ফ্রান্সিস বলল।

রাজা পারকোন ওকাজাকে দেখিয়ে বললেন—ওকাজার জামিনাতেই জন্ম। ওকাজা রাজা কাদর্জা সম্বন্ধে অনেক কিছু জানে। ওর সঙ্গে কথা বলুন সব জানতে পারবেন।

ফ্রান্সিস ওকাজার দিকে তাকাল। বলল—ভাই তুমি একটু আমাদের সঙ্গে এসো। আমরা রাজা কাদর্জা ও তার দেশ জামিনা সম্বন্ধে জানতে চাই। এসো।

ফ্রান্সিস রাজা পারকোনকে সম্মান জানিয়ে চলে এল। নিজেদের ঘরে এসে বসল। ফ্রাসিস বলল—ওকাজা এবার বলতো রাজা কাদর্জা ও ঐ দেশ জামিনা সম্বন্ধে।

ওকাজা আস্তে আস্তে বলতে লাগল—রাজা কাদর্জার মত নৃশংস মানুষের নরকেও ঠাঁই হবে না। জামিনার প্রজারা রাজা কাদর্জাকে ঘৃণার চোখে দেখে। মুখে তো কিছু বলতে পারে না। জামিনায় চলছে এক সন্ত্রাসের রাজত্ব। রাজার বিরুদ্ধে টুঁ শব্দটি করার উপায় নেই। গুপ্তচর ঘুরে বেড়াচ্ছে রাজ্যময়। রাজার বিরুদ্ধে কেউ কোন কথা বললে গুপ্তচর টুটি চেপে ধরছে। সৈন্যাবাসের কাছেই কয়েদখানা। সঙ্গে সঙ্গে কয়েদখানায় ঢুকিয়ে দেবে। কাদর্জার কয়েদখানা সবসময়ই ভর্তি। নরকের আর এক নাম কাদর্জার কয়েদখানা। একবার ঐ কয়েদখানায় ঢুকলে একমাত্র মরলেই বেরিয়ে আসা যায়। নইলে নয়। ঐ কয়েদখানায় দশ-বারো বছরের ছেলেরাও রয়েছে। রাস্তায় হয়তো খেলাচ্ছলে কাদর্জার নিন্দে করেছে। প্রহরীরা ওদের ধরে নিয়ে গেছে। জামিনাতে এই অবস্থাই চলছে।

একটু থেমে ওকাজা বলল—একটা ঘটনা শুনুন। রাজা কাদর্জাকে হত্যার চেষ্টা চলেছে বছর কয়েক। একবার রাজা কাদর্জা পাহাড়ি এলাকার জনবসতি দেখেটেখে নেমে আসছে—কোত্থেকে একটা বর্শা উড়ে এল। লাগল রাজার ডানবাহুতে। রাজা বসে পড়ল। প্রহরীদের মধ্যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হল। ধারেকাছের লোকজন পালিয়ে গেল। দুর্ভাগা যে যুবকটি বর্শা ছুঁড়েছিল সে প্রহরীদের হাতে ধরা পড়ল। ওখানেই প্রহরীদের হাতে মারাত্মক মার খেল। কিন্তু যুবকটি কাঁদল না।

রাজাকে ঘোড়ার পিঠে চড়িয়ে রাজবাড়িতে নিয়ে আসা হল। রাজার চিকিৎসা শুরু হল।

পরদিন রাজার হুকুমে ঐ পাহাড়ি জনবসতির ওপর রাজার দেড়শ দু'শ সৈন্য ঝাঁপিয়ে পড়ল। নির্বিচারে মানুষ মরতে লাগল। শিশুনারীও বাদ গেল না। তাতেও হল না। বাড়িগুলিতে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হল। সব বাড়ি পুড়ে ছাই হয়ে গেল।

ওকাজা থামল। তারপর বলল—কাদর্জার নৃশংসতার কত ঘটনা বলবো।

—সেই যুবকটির কী হল? শাঙ্কো জিজ্ঞেস করল।

—যুবকটিকে কয়েদ ঘরে আটকে রাখা হল। দু'দিন না খাইয়ে এমনকি জল পর্যন্ত খেতে না দিয়ে ফাঁসি দেওয়া হল রাজবাড়ির সামনে। অনেক প্রজা ভিড় করে দেখতে এসেছিল। অনেকেই কেঁদেছে। যুবকটি কিন্তু বিন্দুমাত্র কষ্ট প্রকাশ করেনি। আমি অবাক হয়ে যুবকটির দিকে তাকিয়েছিলাম।

কাদর্জার আর এক শাস্তির নমুনা—পাহাড় থেকে ছুঁড়ে ফেলা। আর একটি নদীর জলে চুবিয়ে মারা। দেশবাসী ক্ষেপে আগুন হয়ে রয়েছে। কিন্তু নিরুপায়।

—ঐ নৃশংস অত্যাচারী রাজার বিরুদ্ধে দেশবাসী রুখে দাঁড়াতে পারছে না? ফ্রান্সিস বলল।

ওকাজা বলল—অত্যাচার অবিচারের বিরুদ্ধে মানুষ দল বাঁধে। জামিনাতেই দল বাঁধা হয়েছে। তবে এখনও বেশিদিন হয়নি। তবে সেই দল প্রজাদের অকুণ্ঠ সমর্থন পেয়েছে। দল বাড়ছে। একদিন তারা বিদ্রোহ করবেই। ওকাজা বলল।

—এই তো কাজের কথা। ফ্রান্সিস বলল—কাপুরুষের মতো পড়ে পড়ে মার খাওয়া কোন কাজের কথা নয়।

ওকাজা উঠে দাঁড়াল। বলল—চলি।

—পরে হয়তো তোমার কাছ থেকে আরো কিছু জানতে হবে। ফ্রান্সিস বলল।

—আমাকে ডাকলেই আমি আসবো। ওকাজা বলল।

—তুমি যে বিদ্রোহের কর্তা বললে তার কি প্রস্তুতি চলছে?

—হ্যাঁ। অত্যন্ত গোপনে বিদ্রোহী নেতা পারেলার দল তৈরি হচ্ছে। আমিও সেই দলে আছি। মাঝে মাঝে জামিনায় যাই। বিদ্রোহীদের সাহায্য করি। নানাভাবে। পারেলা আমাকে খুব ভালোবাসে। আমিও পারেলার জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত। একদিন বিদ্রোহ হবেই। নৃশংস কাদর্জার সন্ত্রাসের রাজত্ব শেষ হবে। জামিনায় নতুন যুগের সূচনা হবে। ওকাজা বলল।

—তাই যেন হয়। ফ্রান্সিস বলল।

ওকাজা বলল—জানেন—পারেলার দলের দশজনকে কাদর্জা ফাঁসি দিয়েছে। কিন্তু বিদ্রোহীদের দমাতে পারে নি। ওকাজা চলে গেল।

রাজা পারকোনের আশঙ্কা সত্য হল।

একদিন রাজা পারকোন গুপ্তচর মারফৎ সংবাদ পেল, রাজা কাদর্জা তাঁর দেশ আক্রমণ করতে আসছে। দু'একদিন মধ্যেই কাদর্জার সৈন্যবাহিনী পৌঁছে যাবে।

ফ্রান্সিস শাঙ্কোকে বলল—সামনেই লড়াই। বন্ধুদের নিয়ে আসতে হয়।

—আমিই যাবো। কিন্তু মন্ত্রীকে বলে যেতে হবে। ওঁর অনুমতি দরকার। শাঙ্কো বলল।

—বেশ তো। বলে যাও। ফ্রান্সিস বলল।

শাঙ্কো মন্ত্রীর কাছে গেল। মন্ত্রী চুপচাপ পাথরের আসনে বসেছিলেন।

—মাননীয় মন্ত্রীমশাই—শুনেছেন বোধহয় রাজা কাদর্জা এই দেশ আক্রমণ করতে আসছে। শাঙ্কো বলল।

—হ্যাঁ শুনেছি। সামনে বড় দুর্দিন। মন্ত্রী বললেন।

—একটা কথা বলছিলাম। শাঙ্কো বলল।

—বলো। মন্ত্রী বলল।

—এই লড়াইয়ে আমার ভাইকিং বন্ধুরাও অংশ নেবে। রাজা পারকোনের হয়ে তারা লড়বে। ফ্রান্সিস বলল।

—খুব ভালো কথা। মন্ত্রী বললেন।

—সমুদ্রতীরে জাহাজঘাট আমাদের জাহাজ নোঙর করা আছে। জাহাজে বন্ধুরা আছে। তাদের মধ্যে থেকে দশ-বারোজনকে নিয়ে আসতে হবে। আপনি অনুমতি—

—হ্যাঁ—হ্যাঁ। যাও। বন্ধুদের নিয়ে এসো। আমাদের জিততেই হবে। মন্ত্রী বললেন।

দুপুরে খেয়েদেয়ে শাঙ্কো সমুদ্রতীরের দিকে রওনা হল। যখন জাহাজে পৌঁছল তখন বিকেল। শাঙ্কোকে দেখে বন্ধুরা হৈ হৈ করে উঠল। ছুটে শাঙ্কোর কাছে এল। ওদের জিজ্ঞাসা ফ্রান্সিস ভালো আছে তো? মারিয়াও এল। শাঙ্কো বলল—রাজকুমারী—কোনরকম দুশ্চিন্তা করবেন না। ফ্রান্সিস সুস্থ সবল আছে। তারপর শাঙ্কো পারকোনের রাজত্বে লড়াইয়ের কথা বলল। বলল—ফ্রান্সিসের সিদ্ধান্ত আমরাও লড়াইয়ে অংশ নেব। লড়াইয়ের কথা শুনে ভাইকিংরা খুশি হল। কর্মহীন অবস্থায় জাহাজে থাকা ওদের ভালো লাগছিল না।

—বেশি না। দশ বারোজন তৈরি হয়ে আমার সঙ্গে চলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই বন্ধুরা তৈরি হল। জাহাজ থেকে নেমে এল। প্রত্যেকেই তরোয়াল নিল। সবাই চলল রাজা পারকোনের রাজত্বের দিকে। সন্ধ্যে নাগাদ সবাই সেখানে পৌঁছল।

বন্ধুরা ফ্রান্সিসের সঙ্গেই রইল।

রাতের খাওয়াদাওয়া শেষ হল। তখন রাজা পারকোন এলেন। সবাই উঠে দাঁড়িয়ে সম্মান জানাল। পারকোন বললেন—বসো বসো। সবাই বসল। পারকোন বলনেল—খবর পেয়েছি কাল সকালেই রাজা কাদর্জা আমাদের রাজ্য আক্রমণ করবে। তোমরা বীরের জাতি। তোমাদের সাহায্য আমাদের অবশ্য প্রয়োজন। অনুরোধ তোমরা আমাদের হয়ে লড়াই করো।

—আমরা লড়াই করবো। ফ্রান্সিস বলল—আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

—তোমাদের সাফল্য কামনা করি। রাজা পারকোন বললেন। তারপর চলে গেলেন।

পরদিন সকালেই সারা রাজ্য জুড়ে সাজ সাজ রব পড়ে গেল। রাজা পারকোনের সৈন্যরা অস্ত্র হাতে ছুটে এল। রাজার গর্ভগৃহের সম্মুখে বিরাট প্রান্তর। সব সৈন্য সেখানে জড়ো হল। কিছু পরে দূরে দেখা গেল কাদর্জার সৈন্যবাহিনী আসছে। একেবারে সামনে একটা কালো ঘোড়ায় চড়ে রাজা কাদর্জা।

রাজা পারকোনের সৈন্যদের দেখে চিৎকার করতে করতে কাদর্জার সৈন্যরা ছুটে আসতে লাগল। রাজা পারকোনের সৈন্যরাও ছুটে গেল।

লড়াই শুরু হল। চিৎকারে আর্তনাদে তরোয়ালে তরোয়ালে ঠোকাঠুকির শব্দে প্রান্তর ভরে উঠল।

একপাশে ফ্রান্সিসরা লড়াই চালাল। যোদ্ধা হিসেবে ভাইকিংরা যে কম যায় না কিছুক্ষণ লড়ে কাদর্জার সৈন্যরা বুঝতে পারল।

চারজন সৈন্য ফ্রান্সিসকে ঘিরে ধরল। ফ্রান্সিস বিদ্যুৎগতিতে তরোয়াল চালাতে লাগল। বুকে গলায় তরোয়াল চালিয়ে ফ্রান্সিস দুজনকে মেরে ফেলল। বাকি দুজন লড়তে লাগল। ফ্রান্সিস হঠাৎ প্রচণ্ড জোরে একজনের তরোয়ালে ঘা মারল। সৈন্যটির হাত থেকে তরোয়াল ছিটকে গেল। সৈন্যটি হতভম্ব হয়ে গেল। কী করবে বুঝে উঠতে পারল না। ও তরোয়াল খুঁজতে চলে গেল। অন্যটির বুকের কাছে তরোয়াল চালিয়ে জামা কেটে দিল। সৈন্যটি খালি গায়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

ফ্রান্সিস হঠাৎ দ্রুত শুয়ে পড়ল। গড়িয়ে গিয়ে সৈন্যটির পায়ে তরোয়ালের ঘা মারল। সৈন্যটির পা কেটে গেল। ও পা চেপে ধরে মাটিতে বসে পড়ল।

ভাইকিং বন্ধুরাও জোর লড়াই চালাল। চিৎকার গোঙানি আর্তনাদে প্রান্তর ভরে উঠল।

রাজা কাদর্জা ঘোড়ার পিঠে চেপে যুদ্ধক্ষেত্রের মধ্যে ঘুরে ঘুরে তার সৈন্যদের উৎসাহ দিতে লাগল।

রাজা পারকোন শান্তস্বভাবের মানুষ। যুদ্ধবিগ্রহ মোটেই পছন্দ করেন না। যুদ্ধক্ষেত্রের এক কোণে এক গাছের নিচে তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন। যুদ্ধ চলল।

বেশ কয়েকঘণ্টা পরে যুদ্ধের জয়পরাজয়ের আভাস পাওয়া গেল। রাজা পারকোনের সৈন্যদের সংখ্যা কমে গেল। আহত ও মৃতের সংখ্যা বেড়ে গেল। কাদর্জার সৈন্যরা উল্লাসে চিৎকার করতে লাগল। সন্ধ্যের সময় পারকোনের সৈন্যরা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালাতে লাগল। রাজা পারকোন তাদের ফেরাবার চেষ্টা করলেন না। ফ্রান্সিসরা কয়েকজন তাদের ফেরাবার চেষ্টা করলো। কিন্তু তারা ফিরলো না।

যুদ্ধের ফলাফল এখন স্পষ্ট। রাজা পারকোনের জয়ের কোন আশাই রইলো না। কাদর্জার সৈন্যরা খোলা তরোয়াল হাতে যুদ্ধক্ষেত্রে ঘুরতে লাগল। পারকোনের আহত সৈন্যদের হত্যা করতে লাগল। ফ্রান্সিস দেখল সেটা। এই নিষ্ঠুরতা দেখে ওর মন বিচলিত হল। এরা কি মানুষ? কিন্তু নিরুপায়। ওরা পরাজিত।

ফ্রান্সিসদের বন্ধুরা একত্রিত হল। একদল কাদর্জার সৈন্য ওদের ঘিরে ধরল। ফ্রান্সিসদের চেহারা-পোশাক-পরিচ্ছদ দেখে বুঝল ওরা বিদেশী। ওদের যত রাগ পড়ল ফ্রান্সিসদের ওপর। দড়ি দিয়ে ফ্রান্সিসদের হাত বেঁধে ফেলল। দুজন আহত ভাইকিং কোনরকমে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালাল। তিনজন মারা গেল।

রাজা কাদর্জার সেনাপতি তখনই ওখানে এল। ফ্রান্সিসদের বন্দী দেখে খুশি হল। বলল—ভালো করেছিস। এরা আমাদের অনেক সৈন্যকে মেরেছে। সন্দেহ নেই ভালো লড়িয়ে।

ফ্রান্সিস বলল—একটা কথা বলছিলাম।

—বলো। সেনাপতি বলল।

—আমাদের তিন বন্ধু মারা গেছে। আমরা তাদের কবর দিতে চাই। ফ্রান্সিস বলল।

—কবরটবর দেওয়া চলবে না। আমরা সব মৃতদেহ পাহাড়ের গহ্বরে ছুঁড়ে ফেলে দেব। সেনাপতি বলল।

ফ্রান্সিস বন্ধুদের দিকে তাকাল। সকলেরই মন খারাপ হয়ে গেল। কিন্তু উপায় কি। এই নির্মমতা মেনে নিতেই হবে।

সেনাপতি একটা ছোট্ট গর্ভগৃহে ফ্রান্সিসদের বন্দী করে রাখল। ফ্রান্সিসরা প্রায় জড়াজড়ি করে শুয়ে রইল। ওদিকে রাজা পারকোনের সভাঘরের পাথরের সিংহাসনে রাজা কাদর্জা বসল। হা হা করে হাসতে হাসতে একজন অমাত্যকে বলল—যান পরাজিত রাজা পারকোনকে নিয়ে আসুন। অমাত্য চলে গেল।

কিছু পরে রাজা পারকোনকে নিয়ে এল। কাদর্জা হেসে বলল—আরে—এখনও আপনার হাত বাঁধা হয়নি। প্রহরীদের দিকে তাকিয়ে বলল—এ্যাই—হাত বেঁধে দে। একজন প্রহরী দড়ি এনে রাজা পারকোনের দুহাত বেঁধে দিল।

—আমার সঙ্গে লড়তে এসেছিলেন। আপনার দুঃসাহস। ফল দেখলেন তো? আমাকে যুদ্ধে হারায় এই অঞ্চলে কেউ নেই। কাদর্জা বলল।

পারকোন কোন কথা বললেন না। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন।

—এবার আসল কথায় আসি—রাজা কাদর্জা বলল—আপনার কোন পূর্বপুরুষ আপনাদের ধনসম্পদ এখানকার কোন গর্ভগৃহে গোপনে রেখে গেছে। সেই ধনসম্পদ আমার চাই। এবার বলুন কোথায় আছে সেই ধনভাণ্ডার। কাদর্জা গলা চড়িয়ে বলল।

—আমি জানি না। রাজা পারকোন মৃদুস্বরে বললেন।

—জোরে বলুন। কাদর্জা চেঁচিয়ে বলল।

—আমি জানি না। পারকোন জোরে বললেন।

—বাজে কথা আপনি জানেন। আমি লড়াই করতে আসছি শুনে সেই ধনভাণ্ডার বাইরে বের করেন নি। এবার বলুন কোথায় সেই ধনভাণ্ডার? কাদর্জা বলল।

—আমি কিছ্ছু জানি না। পারকোন বললেন।

—এ্যাই—চাবুকওয়ালাকে ডাক। কাদর্জা চিৎকার করে বলল।

একপাশ থেকে কালো পোশাক পরা একজন লোক চাবুক হাতে এগিয়ে এল।

—মার্ চাবুক। চাবুকের মার না খেলে মুখ খুলবে না। কাদর্জা বলল।

লোকটি পারকোনের পিঠ লক্ষ্য করে চাবুক চালাল। বাতাসে শ্-শ্ শব্দ উঠল। পারকোনের শরীর কেঁপে উঠল।

—মার্ চাবুক। কাদর্জা চেঁচিয়ে বলল। আবার চাবুকের মার নেমে এল। রাজা পারকোনের পিঠের দিকে জামা ছিঁড়ে গেল। কালশিটে দাগ ফুটে উঠল।

—এবার বলুন। কোথায় সেই গুপ্তধনভাণ্ডার? কাদর্জা বলল।

—আমি জানি না। রাজা পারকোন একই স্বরে বললেন।

—আপনি জানেন। পাছে আমি জেনে ফেলি তাই কোন কথাই বলছেন না। ঠিক আছে। আজকে থাক। সারারাত ভাবুন। কালকে আবার চাবুক মারা হবে। কাদর্জা বলল।

রাজা পারকোনের মন্ত্রী উপস্থিত ছিলেন। হাত তুলে বললেন—মাননীয় রাজা কাদর্জা—রাজা পারকোনকে এভাবে চাবুক মেরে কোন লাভ নেই। কারণ উনি এ বিষয়ে কিছুই জানেন না। যদি জানতেন তাহলে কি এতদিনে উদ্ধার করতেন না?

—ঠিক আছে। আমার সেনাপতিকে আমি এ দেশের রাজা করে দিয়ে যাবো। সে গুপ্ত ধনভাণ্ডারের খোঁজ করবে। উদ্ধার হলে সমস্ত ধনভাণ্ডার আমার হবে। আর কোন দাবিদার থাকবে না। কাদর্জা বলল।

—ঠিক আছে। এটা আপনি করতে পারেন। মন্ত্রী বললেন।

—আপনি কে? মন্ত্রীর দিকে তাকিয়ে রাজা কাদর্জা বলল।

—আমি রাজা পারকোনের মন্ত্রী। মন্ত্রী বললেন।

—দেখছি আপনাকে বন্দী করা হয় নি। কাদর্জা বলল।

—আমার মত বৃদ্ধকে বন্দী করে কী লাভ? আমি ছুটোছুটিও করতে পারবো না, তরোয়াল হাতে লড়তেও পারবো না। আমি বড়জোর বুদ্ধি দিতে পারি। প্রয়োজনে পরামর্শ দিতে পারি। মন্ত্রী বললেন।

—যাক গে—আপনাকে আর বন্দী করা হবে না। আমার সেনাপতি এখানে নতুন রাজা হবে। আপনি তার পরামর্শদাতা হয়ে থাকবেন। বদলে ভালো মাইনে পাবেন। কাদর্জা বলল।

—আপনাকে ধন্যবাদ। মন্ত্রী বললেন।

ফ্রান্সিস যে ঘরে বন্দী হয়ে ছিল রাজা পারকোনকে সেই ঘরেই ঢোকানো হল। পারকোন ঘাসপাতা ছড়ানো মেঝেয় শুয়ে পড়লেন। রাজার শরীরের দশা দেখে ফ্রান্সিসরা চমকে উঠল। কী নির্মমভাবে চাবুক মারা হয়েছে। রাজা কিন্তু গোঙাচ্ছেন না।

ফ্রান্সিস রাজার কাছে গেল। আস্তে আসতে বলল,

—মাননীয় রাজা—খুব কষ্ট হচ্ছে?

রাজা শুকনো ঠোঁটে হাসলেন। নিম্নস্বরে বললেন—চাবুক খেয়ে কষ্ট হবে না?

—আপনাকে চাবুক মারা হল কেন? হ্যারি জানতে চাইল।

—রাজা কাদর্জার ধারণা আমি আমার পূর্বপুরুষদের ধনসম্পত্তির হদিশ জানি। যাতে আমি হদিশ বলে দিই তাই নির্মমভাবে চাবুক মারা। রাজা পারকোন বললেন।

ফ্রান্সিসদের দলে ভেন ছিল না। ভেন থাকলে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা যেত।

শাঙ্কো জালায় রাখা জল থেকে কাঠের গ্লাশে এক গ্লাশ জল নিয়ে এল। রাজার পিঠে কালশিটে দাগের ওপর আস্তে আস্তে জল বুলিয়ে দিতে লাগল। রাজা একটু নড়ে উঠে স্থির হলেন। চুপ করে শুয়ে রইলেন।

শুধু যুদ্ধে জয়লাভ করেই রাজা কাদর্জা সন্তুষ্ট রইল না। সে লুঠ করা শুরু করল। সে চারপাঁচজন অনুচর নিয়ে গর্ভগৃহগুলো অধিবাসীদের সোনা, হীরে, মুক্তো, দামি পাথর লুঠ করতে শুরু করল। কেউ বাধা দিতে সাহস পেল না। অবাধ লুঠ চলল। রাজা কাদর্জা খুব খুশি। অনেক মণিমুক্তো দামি গয়না পেল।

কাদর্জা দেশে ফিরে যাবার জন্যে তৈরী হল। রাজা পারকোনের সভাঘর সেনাপতিকে রাজা করার জন্যে আয়োজন চলল। রাজার দূত এদেশীয়দের মধ্যে প্রচার করল রাজা পারকোনের রাজার সভাগৃহে আসার জন্যে।

রাজসভাগৃহে ভালোই লোক হল। এদেশীয়রা তো ছিলই কাদর্জার সৈন্যরাও সারি দিয়ে দাঁড়াল।

রাজসিংহাসনের কাছে রাজা কাদর্জা দাঁড়াল। সেনাপতি নিচে থেকে উঠে এল। রাজা কাদর্জা তরোয়াল খুলে সেনাপতির দুই কাঁধ ছোঁয়াল। হাত বাড়িয়ে সিংহাসন দেখাল। সেনাপতি আস্তে আস্তে গিয়ে সিংহাসনে বসল। সেনাপতি ঐ দেশের রাজা হয়ে গেল। উপস্থিত সৈন্যরা হৈ হৈ করে আনন্দ প্রকাশ করল। এদেশীয়রা মুখে কোন শব্দ করল না। আস্তে আস্তে রাজসভা ছেড়ে চলে গেল।

এবার ফেরার পালা। রাজা কাদর্জার হুকুমে রাজা পারকোন আর ফ্রান্সিসদের পেছনে রাখা হল। তাদের আগে পিছে সৈন্যরা একেবার সামনে কালো ঘোড়ার ওপরে কাদর্জা।

তখন সকাল। রোদ্দুরের তেমন তেজ নেই। আকাশ মেঘলা। শোভাযাত্রা চলল জামিনার দিকে। হাঁটতে হাঁটতে হ্যারি ডাকল—ফ্রান্সিস? ফ্রান্সিস ফিরে তাকাল।

—কী ব্যাপার কিছুই বুঝতে পারছি না। আমাদের বন্দী করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে কেন? হ্যারি বলল।

—হয়তো আমাদের বিচারটিচার হবে। তারপর শাস্তি। ফ্রান্সিস বলল।

—আমাদের অপরাধ? শাঙ্কো বলল।

—রাজা পারকোনের হয়ে লড়েছি। কাজেই আমাদের সহজে ছেড়ে দেবে না। আমাদের জীবন সংশয়। ফ্রান্সিস বলল।

শোভাযাত্রা এগিয়ে চলল। কী উৎসাহ, কী উদ্দীপনা। যুদ্ধ জয় করে ফিরছে। রাজা কাদর্জা মাঝে মাঝেই তরোয়াল উঁচিয়ে হা হা করে হাসছে।

হঠাৎ আকাশ অন্ধকার করে বৃষ্টি নামল। অঝোর বৃষ্টি। বৃষ্টির মধ্যে দিয়েই শোভাযাত্রা চলল। সবাই ভিজে একশা। কাদর্জাও বাদ গেল না। কাদর্জা নড়লও না। ঠায় বসে রইল।

বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে শোভাযাত্রা জামিনাতে ঢুকল। সদর রাস্তার ধারে ধারে লোকজন জড় হল ঠিকই। কিন্তু কোথাও কোন আনন্দ উচ্ছ্বাস নেই। কাদর্জা বেশ ক্রুদ্ধ হল। দেশজয় করে ফেরার পরেও প্রজাদের মধ্যে আনন্দ উল্লাস নেই। কিন্তু উপায়ও তো নেই। কিছু করারও নেই। শোভাযাত্রা রাজবাড়ির সামনে এসে শেষ হল।

লোকজন ফ্রান্সিসদের দেখে বেশ অবাকই হল। এরা কারা? এদের বন্দী করে আনা হয়েছে কেন? রাজা ঘোড়া থেকে নেমে রাজবাড়িতে ঢুকে পড়ল। সৈন্যরা সৈন্যাবাসের দিকে চলল। প্রহরীদের দলপতি ফ্রান্সিসদের দিকে এগিয়ে এল। সৈন্যদের থেকে ফ্রান্সিসদের আলাদা করল। ফ্রান্সিসদের নিয়ে চলল রাজবাড়ির পূর্ব কোণার দিকে। বোধহয় ওদিকেই কয়েদ ঘর।

ফ্রান্সিসদের কয়েদঘরের সামনে নিয়ে আসা হল। ঠং-ঠং শব্দে লোহার দরজা খোলা হল। হ্যারি মৃদুস্বরে বলল—ফ্রান্সিস আবার কয়েদ ঘরের জীবন। জীবনের বেশ কিছুটা সময় কয়েদ ঘরেই কেটে গেল।

—ঠিকই বলেছো। ফ্রান্সিস মৃদু হেসে বলল।

কয়েদ ঘরে ঢুকল ফ্রান্সিসরা। বেশ বড় ঘর। বন্দীদের সংখ্যাও অনেক। হতেই হবে। রাজা কাদর্জার রাজত্বে এটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। কারো মুখে রাজার নিন্দা শুনলে সৈন্যরা ধরে এনে কয়েদঘরে ঢুকিয়ে দেয়। কাজেই বন্দীর সংখ্যা বেশি হবে এটা স্বাভাবিক।

ফ্রান্সিস দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে বসল। হ্যারি পাশে বসল।

শাঙ্কো দরজার কাছে গেল। প্রহরীদের ডেকে বলল—ভাই ঘরেই তো আটকে আছি। তবে আর হাত বাঁধা থাকে কেন? হাত খুলে দাও।

—দলপতি যদি চায় তবেই তোমাদের হাত খোলা হবে। প্রহরী বলল।

—দলপতির সঙ্গে কথা বলবো। শাঙ্কো বলল।

—ঠিক আছে। বলছি। প্রহরী বলল।

একটু পরেই দলপতি এল। দলপতির মুখে দাড়ি গোঁফ। বেশ দীর্ঘদেহী। বলিষ্ঠ। বলল—কী ব্যাপার?

—বলছিলাম পুরোনো বন্দীদের তো হাত খোলা। তবে আমাদেরও হাত খোলা হোক। ঘরেই তো আটকা আছি তবে আর হাত বাঁধা থেকে কী হবে। শাঙ্কো বলল।

দলপতি কিছুক্ষণ শাঙ্কোর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর বলল—বেশ। তোমাদের বাঁধা হাত খুলে দেওয়া হচ্ছে। খোলা হাতপা নিয়ে যে ক'টা দিন বাঁচার বাঁচো।

—ঠিক বুঝলাম না। শাঙ্কো বলল।

—তোমাদের বাঁচার কোন আশা নেই। রাজা কাদর্জা বেশ কিছুদিন ফাঁসিটাসি দেখেন না। তোমাদের ফাঁসিতে লটকিয়ে সেই দৃশ্য দেখবেন। লোকের কষ্ট যন্ত্রণা মৃত্যু দেখলে রাজা কাদর্জা খুব খুশি হল। ওসব উপভোগ করেন। দলপতি বলল।

শাঙ্কো বুঝল ওদের রেহাই নেই। রাজা কাদর্জা নিশ্চয়ই ওদের ফাঁসি দেবে। বলল—আমরা তো বিদেশী আমাদের বাঁচামরা নিয়ে রাজা অত ভাবছে কেন?

—তোমরা রাজা পারকোনের হয়ে লড়াই করেছো। কাজেই তোমাদের শাস্তি পেতে হবে। দলপতি বলল।

—তাই বলে ফাঁসি? শাঙ্কো বলল।

—এতে তো কষ্ট কম। রাজা অপরাধীকে কষ্ট দিয়ে মারেন। তোমরা কষ্টকর মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে গেলে। দলপতি বলল।

—হুঁ। শাঙ্কো মুখে শব্দ করল।

একজন প্রহরী একটা ছোরা হাতে ঘরে ঢুকল। একে একে ফ্রান্সিসদের হাতবাঁধা দড়ি কেটে দিল। ফ্রান্সিসদের কষ্টটা কমল। বাঁধা হাতের অস্বস্তি থেকে বাঁচা গেল।

শাঙ্কো ফ্রান্সিসের কাছে এল। ডাকল—ফ্রান্সিস?

—বলো। ফ্রান্সিস বলল।

—একটা কথা বলছিলাম। শাঙ্কো বলল।

—কী কথা? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—রাজা পারকোনের হয়ে লড়াই করাটা বোধহয় আমাদের উচিত হয়নি। শাঙ্কো বলল।

—এ কথা বলছো কেন? ফ্রান্সিস বলল।

—দলপতি বলছিল আমাদের ফাঁসি দেওয়া হবে। কারণ রাজা পারকোনের হয়ে আমরা লড়াই করেছি। শাঙ্কো বলল।

—আমাদের ফাঁসি হবে? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—হ্যাঁ। দলপতি তাই বলল। শাঙ্কো বলল।

—রাজা পারকোনের হয়ে লড়াই করে আমরা কোনো ভুল করি নি। রাজা পারকোন একজন প্রজাবৎসল সৎ রাজা। আমরা তাঁর জয় চেয়েছি। হেরে গেছি সেটা আলাদা কথা। ফ্রান্সিস বলল,

—ফাঁসির হাত থেকে তো বাঁচার কোনো উপায় নেই। শাঙ্কো বলল।

—সেটা দেখতে হবে।

দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর হ্যারি ফ্রান্সিসকে বলল—রাজা পারকোনকে দেখে এলাম। খুবই কাহিল হয়ে পড়েছেন গায়ে বেশ জ্বর। অজ্ঞান-টজ্ঞান না হয়ে যায়।

ঠিক তাই ঘটল। রাজা পারকোন জ্বরের ঘোরে অজ্ঞান হয়ে গেলেন। হ্যারি ফ্রান্সিসকে বলল—তাঁর চিকিৎসার ব্যবস্থা কর। নইলে মারা যাবেন। শাঙ্কো ছুটে গেল রাজার কাছে। কাঠের গ্লাশে জল নিয়ে রাজার মাথায় ঢালল। কপালে জল বুলিয়ে দিতে লাগল।

ফ্রান্সিস উঠে লোহার দরজার কাছে গেল। একজন প্রহরীকে বলল—তোমাদের দলনেতাকে ডাকো।

—পারবো না। প্রহরী বলল।

—ভাই রাজা পারকোন জ্বরে অজ্ঞান হয়ে গেছেন। তাঁর এক্ষুনি চিকিৎসার প্রয়োজন। ফ্রান্সিস নরম সুরে বলল—নইলে মানুষটা মারা যাবে।

—দলনেতা আসবে না। প্রহরী বলল।

—তোমাকে আমি ভাই বলে বলছি। দলনেতাকে আসতে খবর দাও। ফ্রান্সিস বলল।

—আমি পারবো না। প্রহরী বলল।

—ঠিক আছে। কাছে এসে দেখো। ফ্রান্সিস বলল।

প্রহরী দরজার কাছে এগিয়ে এল। ফ্রান্সিস এটাই চাইছিল। হাতের নাগালের কাছে আসতেই ফ্রান্সিস দ্রুত হাত বাড়িয়ে ওর গলা চেপে ধরল। প্রহরী তরোয়াল তুলতে গেল। ফ্রান্সিস তার আগেই লোহার দরজায় ওর মাথা ঠুকে দিল। প্রহরী ও'মাগো বলে চিৎকার করে উঠল। প্রহরীরা সব ছুটে এল।

শাঙ্কোরাও উঠে এসে দরজার কাছে ভিড় করল। প্রহরীরা তরোয়াল চালাবার আগেই ফ্রান্সিস প্রহরীকে ছেড়ে দিল। বলল—এবার যাও। দলনেতাকে ডেকে আনো। প্রহরীটির কপাল থেকে রক্ত বেরিয়ে এল। ও কী করবে বুঝে উঠতে পারল না। শাঙ্কো চেঁচিয়ে বলল—শিগগির দলনেতাকে ডেকে আনো। ভাইকিংরা একসঙ্গে ধ্বনি তুলল—ও—হো—হো। প্রহরীরা ঘাবড়ে গেল।

এখানকার গোলমাল শুনল দলনেতা। সে প্রায় ছুটে এলো। বলতে লাগল—কী ব্যাপার? এত গোলমাল কীসের?

ফ্রান্সিস বলল—রাজা পারকোন জ্বরের ঘোরে অজ্ঞান হয়ে গেছেন। এক্ষুনি বৈদ্যকে ডেকে নিয়ে আসুন।

দলনেতা বলল—চাবুকের মার খেয়েছে তো। সহ্য করতে পারেনি। যাক গে—রাজাকে বলছি। উনি অনুমতি দিলে বৈদ্যকে ডাকা হবে।

হ্যারি বলল—একজন মানুষ এত সাংঘাতিক অসুস্থ তার চিকিৎসার জন্য রাজার অনুমতি লাগবে? অবাক কাণ্ড।

—এই জামিনায় রাজার অনুমতি ছাড়া কিছু হবার উপায় নেই। যাক গে—আমি দেখছি। দলপতি চলে গেল।

শাঙ্কো নিজের পোশাক ছিঁড়ে জলে ভিজিয়ে রাজার মাথায় জলপট্টি দিতে লাগল। রাজা তখনও জ্ঞান ফিরে পান নি।

কিছুক্ষণ পরে দলনেতা বৈদ্যকে নিয়ে এল।

ফ্রান্সিস নিশ্চিন্ত হল—যাক রাজা কাদর্জা তাহলে চিকিৎসার অনুমতি দিয়েছে।

বৈদ্যের মাথা ঢাকা সাদা কাপড়ের টুপি মত। দাড়ি গোঁফ ইয়া মোটা গলায় নানা রঙের পাথরের মালা। গায়ে টকটকে লাল রঙের জামা। কাঁধে ঝোলা।

দরজা খোলা হল। প্রহরীরা দরজার দুপাশে খোলা তরোয়াল নিয়ে দাঁড়াল। বৈদ্য আর দলনেতা ঘরে ঢুকল। বৈদ্য রাজার কাছে গেল। বসল। কাঁধের ঝোলা নামাল। রাজার চোখের পাতা খুলে দেখল। কপালে গলায় হাত বোলাল। রাজার

ঠোঁট ফাঁক করে দেখল দাঁতে দাঁত লেগে গেছে। বোঝাই যাচ্ছে ওষুধ খাওয়ানো যাবে না।

বৈদ্য এবার ঝোলা থেকে মাটির মুখ ঢাকা ভাঁড় বের করল। সেটা থেকে দুটো বড়ি বের করল। তারপর রাজার দুই নাকের ফুটোতে চেপে ধরল। বড়ি দুটোয় নিশ্চয়ই কোন গন্ধ আছে। গন্ধ নাক দিয়ে মাথায় গেল।

কিছুপরে রাজার শরীরটা নড়ল। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে রাজা চোখ মেলে তাকালেন। শূন্য দৃষ্টি। কিছু নির্দিষ্টভাবে দেখছেন বলে ফ্রান্সিসদের মনে হল না। বৈদ্য নাক থেকে বড়ি দুটো সরিয়ে নিল।

আবার ঝোলা থেকে একটা কাপড়ের পুটুলি বের করল। পুটুলি থেকে দুটো কালো বড়ি বের করল। শাঙ্কোর দিকে তাকিয়ে বলল—খাইয়ে দাও।

হ্যারি কাঠের গ্লাসে জল এনে দিল। শাঙ্কো ওর উরুর ওপর রাজার মাথাটা শুইয়ে দিল। এতে মাথাটা উঁচু হল। শাঙ্কো এবার গলা চড়িয়ে বলল—মাননীয় রাজা, মুখ খুলুন। বড়ি দুটো খেয়ে নিন। রাজার ততক্ষণে শরীরের সাড় ফিরেছে। আস্তে আস্তে মুখ খুললেন। শাঙ্কো বড়ি দুটো খাইয়ে দিল।

এবার ফ্রান্সিস রাজাকে তুলে বসাল। বৈদ্যকে রাজার পিঠ দেখাল। কালসিটে দাগ আর জায়গায় জায়গায় কালচে রক্ত জমে আছে। বৈদ্য দলনেতার দিকে তাকাল। দলনেতা বলল—চাবুক মারা হয়েছিল। ওষুধ দিন।

বৈদ্য ঝোলা থেকে একটা চিনেমাটির বোয়াম বের করল। মুখ খুলে বৈদ্য সবজে রঙের আঠালো কিছু বের করল। ওষুধটা রাজার পিঠে ঠেকাতেই রাজার সারা শরীর কেঁপে উঠল। বৈদ্য আস্তে আস্তে ওষুধটা কালসিটের ওপর লাগিয়ে দিল। রাজার বোধহয় একটু স্বস্তি পেলেন। চুপ করে বসে রইলেন।

বৈদ্য পোটলা ভাঁড় ঝোলায় ভরল। শুধু ঝোলা থেকে ওষুধটা একটা ছোট্ট ভাঁড়ে ভরে দিয়ে শাঙ্কোকে দিল। বলল—রাতে কালকে লাগিয়ে দিও। চিন্তার কিছু নেই। সেরে যাবে।

বৈদ্য চলে গেল। দলপতি গলা চড়িয়ে বলল,

—চিকিৎসার ব্যবস্থা তো হল। এবার চ্যাঁচামেচি বন্ধ কর।

ফ্রান্সিসরা কেউ কিছু বলল না। ফ্রান্সিসদের চিন্তা এইসব ওষুধে রাজা পারকোন সুস্থ হবেন তো? তারপরেই ভাবল—কয়েকদিনের মধ্যেই তো ফাঁসি মৃত্যু। সুস্থ হওয়া না হওয়া সমান।

ফ্রান্সিসদের মন খারাপ হয়ে গেল। কয়েদঘর থেকে নিরস্ত্র অবস্থায় পালাতে গেলে আরো কিছু বন্ধু মারা যাবে। ফাঁসির হাত থেকে বাঁচার উপায় ভাবতে হবে। দুহাত বাঁধা থাকবে। দৌড়ে পালানো যাবে না। গভীরভাবে উপায় ভাবতে হবে। ফ্রান্সিস ঘাসপাতার বিছানায় শুয়ে পড়ল।

শাঙ্কো তখনই এল। বলল — রাজা পারকোন কি বাঁচবে?

—দেখা যাক। ওষুধ তো পড়েছে। এর বেশি এখানে আমরা আর কী করতে পারি। এখন তো আমাদের ভেন নেই। ফ্রান্সিস বলল।

ওদিকে রাজা কাদর্জা খুব উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে ফ্রান্সিসদের ফাঁসির ব্যবস্থা করতে শুরু করেছে। রাজবাড়ির সামনে একটা ছোট্ট প্রান্তর। তারপরেই বড় বড় গাছগাছালির বন। তারই কাছে ফাঁসিকাঠের মঞ্চ তৈরি হতে লাগল।

প্রহরীরা নিজেদের মধ্যে এই নিয়ে কথাবার্তা বলে। তাই থেকে ফ্রান্সিসরা ফাঁসির মঞ্চের কথা জানতে পারল।

ফ্রান্সিসদের মন প্রায় ভেঙে গেল। কেউ কোন কথা বলছে না। সবাই চুপ। একটাই চিন্তা ওদের আসন্ন মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই নেই। নীরবতা ভেঙে এক বন্ধু বলে উঠল—আমরা রাজা পারকোনের হয়ে লড়তে গিয়ে ভুল করেছি। ফ্রান্সিস দ্রুত উঠে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বলে উঠল—

—কোন ভুল করি নি। এক সৎ প্রজাবৎসল রাজার হয়ে লড়াই করেছি। দুর্ভাগ্য হেরে গেছি। কিন্তু এরকম একজন নৃশংস রাজার পাল্লায় পড়বো স্বপ্নেও ভাবিনি। রাজা কাদর্জা আমাদের ফাঁসি দেবে এতটা ভাবতে পারিনি। কথাগুলো বলে ফ্রান্সিস হাঁপাতে লাগল। হ্যারি বলে উঠল—ফ্রান্সিস একটা প্রশংসনীয় মানবিক কাজ করেছে। তার জন্য তাকে দোষ দেওয়া যায় না।

ফ্রান্সিস বলল—ঠিক আছে। আমি রাজা কাদর্জার কাছে যাচ্ছি। ওরকম একটা রাজার কাছে প্রার্থনা করা অপমানজনক। কিন্তু আমি প্রার্থনা করব। বলবো—আমাকে ফাঁসি দিন। কারণ আমার নির্দেশেই আমার বন্ধুরা লড়তে এসেছিল। এজন্য আমিই দায়ী। আমাকে ফাঁসি দেওয়া হোক। বন্ধুদের মুক্তি দিন।

—রাজা কাদর্জার মত লোক এই প্রার্থনা শুনবে না। বন্ধুদের মুক্তি দিতে রাজি হবে না। শাঙ্কো বলল।

—একবার বলে তো দেখি। ফ্রান্সিস বলল।

ফ্রান্সিস দরজার কাছে গেল। দরজায় শব্দ করল। একজন প্রহরী এগিয়ে এল। বলল—কী ব্যাপার?

—দলপতিকে খবর দাও একজন বন্দী কথা বলবে। ফ্রান্সিস বলল।

—আবার তোমরা ঝামেলা পাকাচ্ছো। প্রহরী বলল।

—আমার অনুরোধ দলপতিকে আসতে বল। ফ্রান্সিস বলল।

—বেশ। এই শেষবার। দলপতিকে আর ডাকতে বলবে না। প্রহরী বলল।

—ঠিক আছে। ফ্রান্সিস বলল।

কিছুক্ষণের মধ্যে দলপতি এল। কয়েদঘরের দরজার কাছে এসে বলল—আবার কী হল? ফ্রান্সিস এগিয়ে গিয়ে বলল—আমার একটা অনুরোধ ছিল।

—কী অনুরোধ? দলপতি বলল।

—রাজা কাদর্জার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ করার ব্যবস্থা করে দিন। কাদর্জা বলল।

—সম্ভব নয়। দলপতি বলল।

—একটু চেষ্টা করে দেখুন। বলবেন ভাইকিংদের দলপতি একটা অনুরোধ জানাতে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চান। ফ্রান্সিস বলল।

—অনুরোধটা কী? দলপতি জানতে চাইল।

—সেটা আমি রাজাকেই বলবো। আপনি দেখা করার ব্যবস্থাটা করে দিন। ফ্রান্সিস বলল।

—তোমার কপাল ভালো রাজা কাদর্জা এখন খুব খোশ মেজাজে আছেন। এতগুলি লোকের ফাঁসি উনি কখনও দেখেন নি। সেটা দেখবেন। এই আনন্দে আত্মহারা। দলপতি বলল।

—মানুষ এরকমও হয়। ফ্রান্সিস বলল।

—রাজা কাদর্জা এরকমই মানুষ। যাকগে দেখি রাজার সঙ্গে কথা বলে। দলপতি চলে গেল।

হ্যারি গলা চড়িয়ে বলে উঠল—ফ্রান্সিস—তোমার জীবনের বিনিময়ে আমরা মুক্তি চাই না। বন্ধুদের মধ্যেও গুঞ্জন উঠল। কয়েকজন বন্ধু বলে উঠল—তুমি অনুরোধ করবে না।

—অনুরোধ করেই দেখা যাক না। তোমরা নিশ্চিন্ত থাক রাজা রাজি হবে না। ফ্রান্সিস বলল।

বেশ কিছুক্ষণ পরে দলপতি এল। হেসে বলল—রাজা কথা বলতে রাজি হয়েছেন।

—তাহলে—দরজাটা খুলতে বলুন। ফ্রান্সিস বলল।

কয়েদঘরের দরজা খোলা হল। ফ্রান্সিস বেরিয়ে এল। চারজন প্রহরী খোলা তরোয়াল হাতে ফ্রান্সিসকে পাহারা দিয়ে নিয়ে চলল। সবচেয়ে আগে দলপতি।

রাজবাড়ির মন্ত্রণাকক্ষে ফ্রান্সিসকে নিয়ে আসা হল। একটা বড় শ্বেতপাথরের টেবিল। চারপাশে চেয়ার সাজানো।

ফ্রান্সিসকে চেয়ারে বসিয়ে দলপতি ভেতরে চলে গেল। একটু পরেই ফিরে এল। অনুচ্চস্বরে বলল—রাজা আসছেন।

কিছু-পরে রাজা কাদর্জা ঘরে ঢুকলেন। ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়াল না। রাজা কড়া চোখে ফ্রান্সিসের দিকে তাকিয়ে বলল—আমাকে দেখে উঠে দাঁড়ালে না কেন?

ফ্রান্সিসের প্রায় মুখের ডগায় এসে গিয়েছিল—আপনার মত একটা নরপশুকে—। কষ্টে নিজেকে সংযত করল। বলল—আমার পায়ে ভীষণ ব্যথা। দাঁড়িয়ে থাকতে কষ্ট।

—হেঁটে তো এলে। রাজা বলল।

—অনেক কষ্টে। ফ্রান্সিস বলল।

রাজা কাদর্জা চেয়ারে বসল। আলখাল্লার মত জামার পকেট থেকে চৌকোনো নস্যির কৌটো বের করল। সজোরে এক টিপ নস্যি নিল। বলল—হুঁ—বলো আমার সঙ্গে তোমার কী প্রয়োজন?

—একটা কথা বলছিলাম। ফ্রান্সিস বলল।

—বলো। রাজা বলল।

—রাজা পারকোনের হয়ে আমরা লড়াই করেছিলাম। আমার নির্দেশেই আমার বন্ধুরা এই লড়াই করেছিল। কাজেই এর পুরো দায়িত্ব আমার। ফ্রান্সিস বলল।

—তুই তাহলে দলের পান্ডা। রাজা বলল।

—হ্যাঁ। তাই আমার অনুরোধ—বিনীত অনুরোধ আমাকে ফাঁসি দেওয়া হোক। আমার বন্ধুদের মুক্তি দেওয়া হোক। রাজা হো হো করে হেসে উঠল—কী যে বলো। অতগুলো মানুষকে একসঙ্গে ফাঁসি দেব—কী রোমাঞ্চকর। সেখানে একজনের ফাঁসি দেখে কী হবে।

—তাহলে আপনি আমার অনুরোধ রাখবেন না। ফ্রান্সিস বলল।

—না-না। সবার ফাঁসি হবে একসঙ্গে। আমি বলে দিয়েছি মঞ্চেও একটা লম্বা পাটাতন থাকবে। ফাঁসির সময় পাটাতন সরিয়ে দেওয়া হবে একসঙ্গে সবাই ঝুলবে। কী চমৎকার।

ফ্রান্সিসের আর কথা বলতে ইচ্ছে করল না। এরকম একটা নির্মম মানুষের সঙ্গে কী কথা?

ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল। বেশ খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ঘরের বাইরে এল। পায়ের ব্যথাটা যদি রাজা মিথ্যে বুঝতে পারে বলা যায় না হয়তো দলপতির তরোয়াল খুলে নিয়ে ওকে সঙ্গে সঙ্গে হত্যা করতে পারে। এইরকম মানুষ সব পারে।

বাইরে এসে প্রহরীদের পাহারায় ফ্রান্সিস চলল। দলপতি বলল—তুমি রাজাকে মিথ্যে কথা বললে কেন?

—আমি একথার উত্তর দেব না। ফ্রান্সিস বলল।

—কেন? দলপতি বলল।

—তোমাদের বিশ্বাস নেই। ফ্রান্সিস বলল।

কয়েদঘরে ঢুকতে বন্ধুরা এগিয়ে এল। ফ্রান্সিস বলল—ভাইসব, যা বলেছিলাম। তাই হল। রাজা গররাজি। একসঙ্গে এতজনের ফাঁসি দেখতে রাজা উদগ্রীব হয়ে আছে। এ নাকি এক রোমাঞ্চকর দৃশ্য। এরকম মানুষের সঙ্গে

আমরা কথা বলতেও ঘৃণা হয়। রাজা ঘরে ঢুকতে আমি উঠে দাঁড়াই নি। রাজা বেশ ক্ষেপে গেল। আমি পায়ে ব্যথা বলে সমস্যাটার পাশ কাটিয়েছি। যাহোক রাজা রাজি হয়নি। অবশ্য এটা আমি আগেই জানতাম।

বন্ধুরা কেউ কোন কথা বলল না। ফ্রান্সিসকে ওরা প্রাণের চেয়ে বেশি ভালোবাসে। একা ফ্রান্সিসের ফাঁসি হবে না—এটা জেনে ওরা খুশিই হল। ফ্রান্সিসদের সঙ্গেই সবাই মৃত্যুবরণ করবে। সবাই এই সংকল্প নিল।

পরদিন সকাল হল। ফাঁসির মঞ্চে দড়িটড়ি টাঙানো হল। যারা ফাঁসি দেবে তারা ঝুলন্ত দড়ির ফাঁস টেনে টেনে দেখল। মঞ্চের পেছনটায় স্তূপাকার শুকনো ডালপাতা। ওসব রাখা হয়েছে কেন প্রহরী সৈন্যরা বুঝল না। ওরা ওসব ফেলেও দিল না। তখন ফাঁসি হবে তার উত্তেজনা।

প্রহরীরা দল বেঁধে দুহাত বাঁধা ফ্রান্সিসদের সারি বেঁধে নিয়ে আসছে।

রাজা অনেক আগেই এসে গেছে। মঞ্চের মুখোমুখি একটা সামিয়ানা টাঙানো হয়েছে। তার নিচে রাজার সিংহাসন এনে পাতা হয়েছে। রাজা এল। তার সাজসজ্জার বহর কত। মাথায় বোধহয় নতুন মুকুটটা রোদ পড়ে ঝক্‌ঝক্ করছে। গায়ে সোনালি-রূপালি কাজ করা আলখাল্লার মত।

ফাঁসি দেখতে খুব বেশি লোক আসে নি। এই ঘৃণ্য ঘটনা দেখার আগ্রহ অনেক মানুষেরই নেই। তবু রাজার উৎসাহে কমতি নেই। হাত-পা নেড়ে দলপতিকে নানা নির্দেশ দিচ্ছে। লোকজন ছড়িয়ে ছিটিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সবারই লক্ষ্য ফাঁসির মঞ্চ।

ফ্রান্সিসরা সার বেঁধে আসছে।

হঠাৎ ওকাজা কোত্থেকে ছুটে এসে ফ্রান্সিসকে ধাক্কা দিয়ে মাটিতে ফেলে দিল। হাত বাঁধা ফ্রান্সিস মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ল। ওকাজা ফ্রান্সিসদের হাত ধরে তুলতে তুলতে বিড় বিড় করে বলল—আগুন—মঞ্চ পল্‌কা—পেছনে জঙ্গল।

ওকাজা এক ছুটে চলে গেল। ফ্রান্সিস চোখ বুঁজে যীশুকে স্মরণ করল। গলা চড়িয়ে দেশীয় ভাষায় বলল—সবাই পালাবার জন্য তৈরী থাকো। পেছনের জঙ্গলে আত্মগোপন।

ফ্রান্সিসরা মঞ্চে উঠল। ফাঁসুড়েরা ফ্রান্সিসদের ওপর থেকে ঝোলানো ফাঁসগুলোর ঠিক নিচে দাঁড় করিয়ে দিতে লাগল। হঠাৎ মঞ্চের পেছনের শুকনো ডালপাতায় কোত্থেকে একটা জ্বলন্ত মশাল উড়ে এসে পড়ল। শুকনো ডালপাতায় সঙ্গে সঙ্গে আগুন জ্বলে উঠল। ফাঁসুড়েরা হতবাক। কী করবে বুঝে উঠতে পারল না। আগুন মঞ্চেও ছড়াল। দর্শকদের মধ্যে ছুটোছুটি শুরু হয়ে গেল। হঠাৎ মঞ্চ ডানদিকে একেবারে কাত হয়ে মাটি ছুঁল। প্রহরীরা, সৈন্যরা এদিক ওদিক ছুটোছুটি করছে। পীপেভর্তি জল আনছে আগুন নেভাবার জন্যে।

হঠাৎ রাজার মাথার ওপরের সামিয়ানা ভেঙে পড়ল। ফ্রান্সিসরা কাত হওয়া মঞ্চ থেকে মাটিতে পড়ে গেল। শাঙ্কো রাজা পারকোনকে কাঁধে তুলে নিয়ে জঙ্গলের দিকে ছুটল। এবার ফ্রান্সিসরাও ছুটল।

সৈন্যরা তরোয়াল উঁচিয়ে ছুটে আসতে লাগল। সৈন্যরা জঙ্গলের কাছে পৌঁছোবার আগেই ফ্রান্সিসরা বনের মধ্যে ঢুকে পড়ল। গভীর বন। সৈন্যরা ওদের খুঁজে বের করতে পারবে না।

ফ্রান্সিসরা গাছগাছালির নিচে দিয়ে চলল। কিন্তু দুহাত বাঁধা থাকায় খুবই অসুবিধে হচ্ছিল। মোটা মোটা গাছের গুঁড়ি ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে ফ্রান্সিসরা বেশ কিছুদূরে এল।

সবাই হাঁপাতে লাগল। বেশ কষ্ট করে রাজা পারকোন ফ্রান্সিসদের সঙ্গে সঙ্গে এল। ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে বলল—

—সবাই বসে পড়ল। বিশ্রাম নাও। সবাই এখানে ওখানে বসে পড়ল।

শাঙ্কো ফ্রান্সিসদের কাছে এল। মাথা নিচু করে ফ্রান্সিসকে ইঙ্গিত করল। ফ্রান্সিস শাঙ্কোর বুকের কাছ দিয়ে হাত ঢুকিয়ে জামার তলা থেকে ছোরাটা বের করল। তারপর ঘষে ঘষে শাঙ্কোর হাতের দড়ি কেটে দিল। ছোরা নিয়ে এবার শাঙ্কো একে একে সকলের হাতের দড়ি কেটে দিল। হাত খোলা পেয়ে ফ্রান্সিসদের অস্বস্তি কাটল।

হ্যারি ফ্রান্সিসের কাছে এল। বলল—এখন কী করবে?

—বুঝতে পারছি না। এই বনটা তো পার হয়ে যাই। তারপরে নিশ্চয়ই লোকজনের বসতি পাব।

—হ্যাঁ। এ ছাড়া তো কোন উপায় নেই। হ্যারি বলল।

হঠাৎ সামনের দিকে শুকনো ডালপাতা ভাঙার শব্দ উঠল। সকলেই শুনল সেটা। ফ্রান্সিস কান খাড়া করল। শব্দটা সামনে থেকেই আসছে।

ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়াল। বলল—সবাই লড়বার জন্য তৈরি হও। রাজা কাদর্জার সৈন্যরা বোধহয় আসছে। নিরস্ত্র অবস্থাতেই লড়বো আমরা। আর বন্দী হব না।

ডালপাতা ভাঙার শব্দ কাছে এল। সবাই উঠে দাঁড়িয়েছে তখন। শুধু রাজা পারকোন বসে আছে। এক্ষুনি উঠে দাঁড়াবার শক্তি নেই।

তিনজন লোক গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল। ওকাজা!

ফ্রান্সিস হেসে বলল—ওকাজা সময়মতই এসেছো। আমরা কী করবো বুঝে উঠতে পারছিলাম না।

—আপনারা আমার সঙ্গে আসুন। ওকাজা বলল।

—কোথায় যাবো? ফ্রান্সিস বলল।

—বিদ্রোহীদের আস্তানায়। আসুন। ওকাজা বলল।

ওকাজারা সামনে এগিয়ে চলল। ফ্রান্সিসরা পেছনে পেছনে চলল। এই দিনের বেলাও বনতল অন্ধকার। সাবধানে পা ফেলে চলতে হচ্ছে। নইলে আছাড় খাওয়ার সম্ভাবনা।

বেশ কিছুটা যেতে গাছগাছালির আড়ালে ফ্রান্সিসরা দেখল একটা বড় ঘর। সবটাই কাঠের। ফ্রান্সিসরা ওকাজার পেছনে পেছনে দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

ঘর থেকে এক বলিষ্ঠ যুবক বেরিয়ে এল। মুখে দাড়ি গোঁফ। খুব বুদ্ধিদীপ্ত চোখমুখ। বলল—ওকাজার কাছ থেকে আপনাদের কথা শুনেছি। ফাঁসির হাত থেকে বেঁচে এসেছেন। আপনাদের মনের অবস্থা বেশ বুঝতে পারছি। ভেতরে আসুন।

ফ্রান্সিসরা ঘরটায় ঢুকল। ওকাজা ফ্রান্সিসদের কাছে এল। নিম্নস্বরে বলল—ঐ যুবকটিই পারেলা। বিদ্রোহীদের নেতা। ফ্রান্সিস পারেলার কাছে গেল। হাত বাড়িয়ে করমর্দন করল। বলল—রাজা কাদর্জার মত নরপশুর সন্ত্রাসের রাজত্ব আপনারা শেষ করুন।

—আমরা সেই চেষ্টাতেই আছি। পারেলা বলল।

ফ্রান্সিস টানা পাতা দড়ি দিয়ে শুকনো ঘাস বুনে তৈরি বিছানায় বসল। হ্যারিরাও বসল। হ্যারি বলল—

—ফ্রান্সিস—রাজা পারকোনের চিকিৎসার ব্যবস্থা এখানে কর। পিঠের ঘাটা শুকিয়ে গেছে কিন্তু দুর্বলতাটা এখনও যায় নি।

—ঠিক বলেছো। ফ্রান্সিস বলল। তারপর ওকাজাকে ডাকল। ওকাজা এল। ফ্রান্সিস বলল—ওকাজা—একটা উপকার যে করতে হয়।

—বলুন কী উপকার। ওকাজা বলল।

—রাজা পারকোনকে রাজা কাদর্জার হুকুমে চাবুক দিয়ে মারা হয়েছিল। পিঠে ঘাটা সেরেছে কিন্তু দুর্বলতাটা যায় নি। যদি ওষুধপত্রের ব্যবস্থা করে দাও।

—নিশ্চয়ই। ওকাজা বলল। তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

কিছু পরে ওকাজা এক বৃদ্ধকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে এল। বৃদ্ধের কাঁধে ঝুলছে বুনো লতা দিয়ে তৈরি ঝোলা। বোঝা গেল এই বৃদ্ধই বৈদ্য।

ফ্রান্সিস বৃদ্ধকে রাজা পারকোনের কাছে নিয়ে গেল। চাবুক মারার কথা বলল। বৃদ্ধ চুপ করে সব শুনল। তারপর রাজার পিঠের ছেঁড়া পোশাক সরিয়ে দেখল। বলল—ভেতরে এখনও ঘা আছে। সম্পূর্ণ সারে নি।

বৈদ্য ঝোলার মুখ খুলল। কয়েকটা শুকনো পাতা বের করল। রাজার পিঠে চেপে চেপে বসিয়ে দিল। পাতাগুলো চেপ্টে লেগে রইল। বৈদ্য তারপর ঝোলা থেকে একটা ছোটো চিনেমাটির বোয়াম বের করল। বোয়াম থেকে চারটে

কালোবড়ি বের করল। ফ্রান্সিসদের দিকে তাকিয়ে বলল—এখন একটা বড়ি খাইয়ে দিন। কাল থেকে দৈনিক একটা করে বড়ি খাবে। দিন দশেকের মধ্যে আগের শক্তি ফিরে পাবেন। বৈদ্য চলে গেল।

তৃষ্ণার্ত ফ্রান্সিসরা জল খেল। এবার খিদে। হ্যারি সেকথা ফ্রান্সিসকে বলল। ফ্রান্সিস ওকাজাকে ডাকল। ওকাজা কাছে এলে বলল—সেই সকালে কিছু খেয়েছি। এখনো কিছু খাওয়া জোটেনি।

—কিছুক্ষণের মধ্যেই আপনাদের খেতে দেওয়া হবে। সকাল থেকে কী কষ্ট হয়েছে আপনাদের তা তো আমরা জানি। ওকাজা চলে গেল।

কিছু পরে ওকাজা এল। গলা চড়িয়ে বলল—আপনাদের খেতে দেওয়া হচ্ছে।

এবার ফ্রান্সিস ভালো করে চারদিকে দেখল। অনেক যুবক শুয়ে বসে আছে। ঘরের এককোণে জলের জালা। অন্য কোনে তরোয়ালের স্তূপ। বর্শাও রয়েছে।

প্রত্যেকের সামনে লম্বাটে পাতা পেতে দেওয়া হল। কম পোড়া তিনকোণা রুটি আর তরিতরকারির ঝোল। একটা করে ঝোলসহ মাছের টুকরোও দেওয়া হল। ক্ষুধার্ত ফ্রান্সিসরা চেটেপুটে খেল।

রাত হল। সারাদিনের উত্তেজনায় ক্লান্ত ফ্রান্সিসরা ঘুমিয়ে পড়ল।

একটু বেলায় ঘুম ভাঙল ফ্রান্সিসের। হাতমুখ ধুয়ে এসে সকালের খাবার খেতে বসল। হ্যারি পাশে এসে বসল। বলল—

—এখন কী করবে?

—কিছুই ভেবে উঠতে পারছি না। কয়েকটা দিন এখানে বিশ্রাম নেব। তারপর যা করবার করবো। ফ্রান্সিস বলল।

খেয়েদেয়ে শুয়ে বসে কয়েকদিন কাটাল।

সেদিন ফ্রান্সিস ওকাজাকে কাছে ডাকল। বলল,

—ওকাজা আমরা এখন কী করবো বুঝে উঠতে পারছি না। রাজা পারকোনের রাজত্ব চালাচ্ছে রাজা কাদর্জার সেনাপতি। ওখানে যাওয়া যাবে না। এখানে তো থাকা যাবেই না।

—এক কাজ করতে পারেন। উত্তর দিকে একটা দেশ আছে—কানজেন। রাজা নয় রানি ইচিনা ঐ দেশের প্রধান। মন্ত্রী অমাত্যের সহায়তায় রাজত্ব চালায়। খুব বুদ্ধিমতী। কানজেন-এ আশ্রয় নিতে পারেন। তারপর আমরা এই জামিনায় আমাদের শাসন কায়েম করতে পারলে এখানে চলে আসবেন। ততদিন কানজেন-এ থাকুন।

ফ্রান্সিস এই নিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলল। হ্যারি বলল—ওকাজা ভালো

বুদ্ধিই দিয়েছে। কানজেনেই চলো। আশ্রয়, আহার দুটোই মিলবে। রাজা কাদর্জার রাজত্ব শেষ হলেই আমরা চলে আসবো।

বনজঙ্গল গাছগাছালি কেটে এখানে ঘর বানানো হয়েছে। চারিদিকে গাছ। কাজেই ঘরটা দৃষ্টির আড়ালেই থাকে। কিন্তু দূর্ভাগ্য ওকোজাদের আর ফ্রান্সিসদের।

তখন দুপুরের খাওয়া সেরে শাঙ্কো ঘরটার বাইরে একটু দূরে একটা গোড়া কাটা গাছের গোড়ায় বসেছিল। হঠাৎ শুকনো পাতাডাল ভাঙার শব্দে ফিরে তাকাতেই দেখে দুজন রাজা কাদর্জার সৈন্য। সৈন্য দুজন হতবাক। শাঙ্কোরও মুখে কথা নেই। শাঙ্কো সেই অবস্থাটা কাটিয়ে উঠল। দ্রুত ছুটল সৈন্য দুজনের দিকে। সৈন্য দু'জন তখন পালাতে ব্যস্ত। শাঙ্কো মাথা নিচু করে পোশাকের নিচ থেকে ছোরাটা বের করল। তারপর একটা সৈন্যকে লক্ষ্য করে ছোরা ছুঁড়ল। পরিষ্কার হাত শাঙ্কোর। ছোরাটা সৈন্যটির গলায় গেঁথে গেল। ও বসে পড়ল। শাঙ্কো অন্যটির দিকে ছুটে গেল। কিন্তু সেই সৈন্যটি লাফ দিয়ে সরে গেল। তারপর গাছগাছালির মধ্যে দিয়ে ছুটে পালিয়ে গেল।

এবার সমূহ বিপদ। এই ঘরের কথা রাজা কাদর্জার কাছে গোপন থাকবে না। নিশ্চয়ই নতুন সেনাপতিকে সৈন্যসহ পাঠাবে এই ঘরের খোঁজে। শাঙ্কো ভাবল এসব। ও দ্রুত পারেলার কাছে গেল। ঘটনাটা বলল। পারেলা তখন গলা চড়িয়ে বলল—কাদর্জা এই আস্তানর খোঁজ পেয়ে যাবে। এক মুহূর্তও দেরি না। সব অস্ত্রশস্ত্র জঙ্গলে লুকিয়ে রাখো। তারপর যে যেদিকে পারো পালাও। আমরা সংখ্যায় কম। লড়াই করবো না। সাত দিন পরে সবাই এখানে চলে আসবো।

পারেলার দলের লোকেরা তরোয়াল বর্শা সব জঙ্গলে লুকিয়ে ফেলল। তারপর যে যেদিকে পারল পালালো।

ফ্রান্সিস জোরে বলল—ভাইসব—উত্তরদিকে পালাও।

ফ্রান্সিসরা উত্তরমুখো ছুটল। কিছুদূর যাবার পর পেছনে কাদর্জার সৈন্যদের চিৎকার ডাকাডাকি শুনল। ফ্রান্সিস জোরে বলল—জলদি।

একসময় ফ্রান্সিসরা বনভূমি থেকে বেরিয়ে এল। সামনে বিস্তৃত প্রান্তর। ফ্রান্সিসরা দ্রুত ছুটল। বনের বাইরে এসে কাদর্জার সৈন্যরা ওদের দেখে ফেলতে পারে।

প্রান্তর শেষ। সামনে বাড়িঘরদোর। জনবসতি। কাঠপাথরে তৈরি প্রথম বাড়িটার কাছে এল ওরা। বন্ধুরা অনেকেই হাঁপাতে হাঁপাতে মাটিতে বসে পড়ল।

ফ্রান্সিসও ভীষণ হাঁপাচ্ছে তখন। কথা বলতে পারছে না। একটুক্ষণ দম নিয়ে ফ্রান্সিস বাড়ির সামনের দরজাটার কাছে এল। দেখল দরজা খোলা।

ফ্রান্সিস ডাকল—কেউ আছেন? কোন সাড়াশব্দ নেই। আবার ডাকল—কেউ আছেন?

—কে? ভেতর থেকে শোনা গেল। একটু পরে একজন বৃদ্ধ বেরিয়ে এল। পাকা দাড়ি গোঁফ। গায়ে ঢোলা জামা।

ফ্রান্সিস বলল—আমরা বিদেশী ভাইকিং। এদেশে ঘটনাচক্রে এসেছি। রাজা কাদর্জা আমাদের ফাঁসি দিতে চেয়েছিল। অনেক কষ্টে আমরা পালিয়ে এসেছি।

—রাজা কাদর্জা? ওতো সাংঘাতিক মানুষ। বৃদ্ধ বলল।

—হ্যাঁ, আমরা তার প্রমাণ পেয়েছি। যা হোক আমরা এখন এখানে আশ্রয় চাই। খাদ্যও চাই। ফ্রান্সিস বলল।

তখনই বাড়ি থেকে এক যুবক বেরিয়ে এল। ফ্রান্সিসদের দেখে একটু অবাকই হল। এতজন বিদেশি। হ্যারি বলল—এটা বোধহয় রানি ইচিনার রাজত্ব?

—হ্যাঁ। যুবকটি বলল—কিন্তু আপনারা?

ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে সবই বলল। যুবকটি বলল—তাহলে আপনারা এখন কী চান?

—আমরা আপনার বাড়ীতে আশ্রয় চাই। খাদ্যও চাই। ফ্রান্সিস বলল।

—তা দেব কিনা বাবা বলুক। যুবকটি বলল।

—এরা আশ্রয়হীন। বিপদগ্রস্ত। এদেশ ওদের কাছে বিদেশ। কোথায় আর আশ্রয় পাবে? আমাদের বাড়ীতেই থাকুক। বৃদ্ধ বলল।

—তুমি রাজি হলে আমার আপত্তি নেই। যুবকটি বলল—তবে বেশিদিন আপনাদের আশ্রয় ও খাদ্য দিতে পারবো না।

—না-না। আজকের রাতটা। কাল আমরা রানির দরবারে যাবো। আশ্রয় খাদ্য চাইবো। মনে হয় উনি ব্যবস্থা করে দেবেন। ফ্রান্সিস বলল।

—বেশ। আপনারা থাকুন। তবে ছোট ঘর। আপনাদের কষ্ট হবে। বৃদ্ধ বলল।

—আমরা কয়েদঘরে থেকে অভ্যস্ত। আমাদের কোন কষ্ট হবে না। হ্যারি বলল।

ঘরের জিনিসপত্র সরানো হল। ভাইকিংরা যুবকটিকে সাহায্য করল।

ফাঁকা ঘরে মোটা কাপড় পেতে দেওয়া হল। ফ্রান্সিসরা বসল। রাজা পারকোন শুয়ে পড়লেন। ফ্রান্সিস পারকোনের কাছে এল। বলল—এখন নিজের হারানো রাজ্যে ফিরে যেতে পারবেন?

—তোমাদের পোশাক পরে বনভূমি পার হয়ে চলে যেতে পারবো। এখন শরীরে জোর হয়েছে। তবে শাঙ্কো যদি আমাকে বনভূমিতে পৌঁছে দেয় তাহলে ভালো হয়। রাজা পারকোন বললেন।

—ঠিক আছে। শাঙ্কো আপনাকে নিয়ে যাবে। ফ্রান্সিস বলল।

রাতে ফ্রান্সিসদের খেতে দেওয়া হলো। আনাজের তরকারী মাছের ঝোলমত। পরিষ্কার রুটি। ক্ষুধার্ত ফ্রান্সিসরা পেট পুরে খেল।

শাঙ্কো রাজা পারকোনকে নিয়ে রওনা হল। রাজা পারকোন সকালের খাবার খেল। বললেন—ফ্রান্সিস তোমার কাছে ঋণী রইলাম।

ফ্রান্সিস রানির বাড়ির দিকে চলল। যুবকটিই ওদের পথ দেখিয়ে নিয়ে এল।

রানির পাথরের বাড়ি খুব বড় নয়। তবে দেখতে সুন্দর। হ্যারি বলল—ফ্রান্সিস, রানি যদি আশ্রয়, খাদ্য না দেয় তবে খুবই বিপদে পড়বো।

—না, না। বলবো—আমরা কিছুদিন থাকবো। প্রয়োজনে আপনার হয়ে লড়াই করবো। ফ্রান্সিস বলল।

—আবার পরের হয়ে লড়াইয়ে নামবে? শাঙ্কো বলল।

—এক্ষুনি তো আর লড়াই হচ্ছে না। আমরা যে তাঁর সহায় এটা তো বোঝাতে হবে। নইলে আমাদের গুরুত্ব কী? ফ্রান্সিস বলল।

—দেখো বলে। হ্যারি বলল।

ফ্রান্সিসরা সভাঘরে ঢুকল। অনেকেই ওদের দিকে তাকিয়ে দেখল। এই বিদেশিরা কোত্থেকে এল? প্রহরীরা ফ্রান্সিসদের আটকালো না। কাঠের সিংহাসনে রানি ইরিনা বসে আছেন। দুপাশে মন্ত্রী ও অমাত্যরা। ঘরটায় তেমন আলো ঢোকে নি। রানি বিচার করছেন। রানির মাথায় মুকুট। পরনে ঝলমলে পোশাক। দেখতে সুন্দরী। চেহারায় ব্যক্তিত্ব আছে।

একটা বিচার শেষ হল। ফ্রান্সিসরা ততক্ষণে রানির নজরে পড়েছে। সভাঘরে ভর্তি লোক। বোঝা গেল রানি জনপ্রিয়। হয়তো তাঁর সুশাসনই তাঁকে জনপ্রিয় করেছে।

ফ্রান্সিসরা অপেক্ষা করতে লাগল। বিচার চলল।

বেশ কিছুক্ষণ বিচার চলার পর বিচারপর্ব শেষ হল। রানি হাততালি দিলেন। আস্তে আস্তে সভার লোকজন বেরিয়ে যেতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে বিচারসভা নির্জন হল। ফ্রান্সিসরা তখনও দাঁড়িয়ে। এবার রানি ফ্রান্সিসদের দিকে তাকালেন। হাত বাড়িয়ে এগিয়ে আসতে ইঙ্গিত করলেন।

ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে এগিয়ে গেল। মাথা নুইয়ে সম্মান জানিয়ে ফ্রান্সিস বলল—আপনার কাছে আমাদের কিছু নিবেদন ছিল।

—বলো কী নিবেদন? রানি বললেন। তখন ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে সব ঘটনা বলল।

—ও। রাজা কাদর্জা তো একটা সাক্ষাৎ শয়তান। দু'দুবার এই কালজেন আক্রমণ করেছিল। আমরা তাড়িয়ে দিয়েছি। কিন্তু আমরা বিপদমুক্ত এই। উত্তরের এক দেশ। বুনোদের রাজত্ব। ওরা সুযোগ পেলেই আমাদের দেশ

আক্রমণ করে। হেরে পালিয়ে যায়। কিন্তু এভাবে কতদিন ওদের আক্রমণ করে। হেরে পালিয়ে যায়। কিন্তু এভাবে কতদিন ওদের আক্রমণ ঠেকাতে পারবো জানি না। তবে আমার বীর সৈন্যরা হার স্বীকার করতে জানে না। এটাই আমার ভরসা। যাকগে—তোমরা কী চাও বলো।

—আমরা আপনার কাছে আশ্রয় চাই। আমরা কিছুদিন এখানে থাকবো। তারপর ফিরে যাবো। ফ্রান্সিস বলল।

—বেশ। তোমরা ভাইকিং—দক্ষ জাহাজচালক দুঃসাহসী। প্রয়োজনে তোমরা আমার সহায় হবে—এই আশা আমার। রানি বললেন।

—আমরা নিশ্চয়ই আপনাকে সর্বপ্রকার সাহায্য করবো। এমন কি যদি আপনি চান আপনার হয়ে লড়াই করবো। ফ্রান্সিস বলল।

—তাহলে তো খুবই ভালো হয়। রানি বললেন।

রানি আঙুল নেড়ে সেনাপতিকে ডাকলেন। অমাত্যদের পাশে বসা সেনাপতি দ্রুত উঠে দাঁড়াল। সেনাপতি রোগা লম্বা। এ কী লড়াই করবে? শাঙ্কো ভাবল।

সেনাপতি মাথা নিচু করে সম্মান জানিয়ে দাঁড়াল। রানি ফ্রান্সিসদের দেখিয়ে বললেন—এদের থাকার জন্যে সেনানিবাসের একটা ঘর ছেড়ে দিন। সেনাদের সঙ্গেই ওদের খাওয়ার ব্যবস্থা করবেন। এরা কিছুদিন থাকবে। আপনি একটু দেখাশোনা করবেন।

—যে আজ্ঞে। সেনাপতি মাথা নিচু করে বলল। তারপর ফ্রান্সিসদের কাছে এসে বলল—আমার সঙ্গে আসুন।

সবাই সভাঘরের বাইরে এল। বেশ রোদ বাইরে। এলেমেলো বাতাস বইছে।

সভাঘরের বাইরে একটা ছোট মাঠ মতো। তারপরেই কতকগুলো লম্বাটে ঘর টানা চলে গেছে। ঘরের বারান্দায় মাঠে সৈন্যরা ঘুরে বেড়াচ্ছে। ওরা ফ্রান্সিসদের বেশ অবাক চোখেই দেখল। সেনাপতি কাকে ডাকল। একজন সৈন্য এগিয়ে এল। কোমরে ঝোলানো চাবির বড় গোছা।

সেনাপতি একটা ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল। ঘরে তালা ঝুলছে। সেনাপতি চাবিওয়ালা সৈন্যটিকে ইঙ্গিত করল। চাবিওয়ালা সৈন্যটি তালা খুলে দিল। সেনাপতি দরজা খুলে বলল—এই ঘরে আপনারা থাকবেন। প্রয়োজনে আমার খোঁজ করবেন। এখন আপনারা বিশ্রাম করুন।

ফ্রান্সিসরা ঘরটায় ঢুকল। বেশ খোলামেলা ঘর। ভালো হাওয়া খেলছে। ঘরের মেঝেয় মোটা কাপড়ের চাদর পাতা। ফ্রান্সিস বসল। শুধু ফ্রান্সিস শুয়ে ড়ল। শুয়ে থেকেই বলল—বিস্কো, বাইরে গিয়ে দাঁড়াও। শাঙ্কো ফিরে এসে মাদের খুঁজবে। ও সহজেই যেন আমাদের দেখা পায়।

বিস্কো বাইরের বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল। তখনই দেখল শাঙ্কো সভাঘরের সামনে দাঁড়িয়ে। বিস্কো চিৎকার করে ডাকলো—শাঙ্কো, আমরা এখানে।

শাঙ্কো তখন বিস্কোকে দেখতে পেয়েছে। মাঠ পার হয়ে বিস্কোর কাছে এল। দুজনে ঘরে ঢুকল। শাঙ্কো বলল—ফ্রান্সিস, রানি তাহলে আমাদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করল।

—হ্যাঁ। বদলে অবশ্য বলতে হল লড়াই হলে রানির হয়ে আমরা লড়বো।

—নিরুপায়। এমনি এমনি কে কাকে আশ্রয় দেয়, খাদ্য দেয়। স্বার্থের ব্যাপারটা থেকেই যায়। ফ্রান্সিস বলল।

—যাক গে। তোমার অভিমতের বিরোধিতা কখনও করিনি, করবোও না। সব মেনে নিলাম। প্রয়োজনে লড়াই করবো। শাঙ্কো বলল।

—রাজা পারকোনের অবস্থা কী দেখলে? পারবে নিজের দেশে ফিরে যেতে? হ্যারি বলল।

—পারবে। তবে বন পার হতে কষ্ট হবে। পেছল গাছের গুঁড়ি। তার মধ্যে দিয়ে যাওয়া। কী আর করার আছে। উনি তো আমাদের সঙ্গে থাকতে রাজি হলেন না। শাঙ্কো বলল।

—উনি যা ভালো বুঝেছেন, করেছেন। আমাদের কিছু করণীয় নেই। ফ্রান্সিস বলল।

ফ্রান্সিসদের একঘেয়ে দিন কাটতে লাগল। সকাল বিকেল ওরা সৈন্যদের কুচকওয়াজ দেখে। এখানে ওখানে ঘুরে বেড়ায়।

বিকেলে ফ্রান্সিস একা সদর রাস্তায় যায়। তারপর নাক বরাবর হাঁটতে শুরু করে। বাড়িঘর দোকানপাট দেখে। রাত হতেই ফিরে আসে। এভাবেই দিন কাটছিল ফ্রান্সিসদের।

সেদিন সকালে সৈন্যদের মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা গেল। সবাই ব্যস্ত। একজন সৈন্যকে কাছে পেয়ে শাঙ্কো জিজ্ঞেস করল—কী হয়েছে ভাই?

—বুনো রাজা আমাদের দেশ আক্রমণ করতে আসছে। সৈন্যটি বলল।

—তাহলে তো লড়াই। শাঙ্কো বলল।

—হ্যাঁ। সৈন্যটি বলল।

শাঙ্কো ফ্রান্সিসদের কাছে এল। লড়াইয়ের কথা বলল।

রানি ইরিনা সভাঘরের বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। সৈন্যরা সেখানে গিয়ে জড় হল।

রানি ইরিনা গলা চড়িয়ে বলতে লাগলেন—আমার বীর সেনানীরা, দূত খবর এনেছে—বুনো রাজা আমাদের দেশ আক্রমণ করতে আসছে। সব তৈরি হও। এর আগেও ওদের আমরা লড়াইয়ে হারিয়ে দিয়েছি। এবারও ওদের

হারাতে হবে। জানপ্রাণ দিয়ে লড়াই চালাতে হবে। জয় আমাদের হবেই। রানি ইরিনা থামলেন।

রানি ইরিনার গায়ে আঁটোসাঁটো পোশাক। মাথার চুল চেপে বাঁধা। হাতে খোলা তরোয়াল। বোঝা গেল রানি ইরিনাও লড়াই করবেন।

উত্তরের পাহাড়ি এলাকা দিয়ে বুনো রাজার সৈন্যরা ছুটে আসতে লাগল। হাতে বর্শা। মাত্র কয়েকজনের হাতে তরোয়াল। ওরা রানি ইরিনার সৈন্যদের কাছে আসতেই ইরিনার সৈন্যরা বুনো রাজার সৈন্যদের আক্রমণ করল। লড়াই শুরু হল। আর্ত্তনাদ গোঙানি।

হ্যারি ফ্রান্সিসকে বলল—কী করবে?

—কথা দিয়েছি। রানি ইরিনার হয়ে লড়াই করবো। ভাইসব—সেনাপতি আমাদের তরোয়াল দিয়ে গেছে। উনি আগে থেকেই আঁচ করেছিলেন—দু'একদিনের মধ্যে বুনোরা আক্রমণ করতে পারে। তরোয়াল নাও। লড়াই।

ফ্রান্সিসরা অল্পক্ষণের মধ্যেই তরোয়াল নিয়ে লড়াইয়ের মাঠে নামল। বুনোরা বর্শা বিঁধিয়ে দিতে লাগল। কিন্তু একবার বর্শা বিঁধিয়ে দিলেই ওদের বর্শা হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে। ফ্রান্সিসরা সেই সুযোগ নিল। তরোয়াল চালিয়ে ওদের আহত করতে লাগল।

নিজের সৈন্যদের সঙ্গে মিশে রানি ইরিনাও লড়াই করতে লাগলেন। নিপুণ হাতে তরোয়াল চালাতে লাগলেন।

ফ্রান্সিসরা ঘুরে ঘুরে লড়াই করতে লাগল। ফ্রান্সিস অবাক হয়ে দেখল রানি ইরিনা নিপুণ হাতে তরোয়াল চালাচ্ছে। বুনো সৈন্য মারা পড়ছে। পরিশ্রমে রানির মুখ লাল টকটকে হয়ে গেছে। তবু তরোয়াল চালানোয় বিরাম নেই।

ফ্রান্সিসদের দুই বন্ধু আহত হল। শাঙ্কো লড়াই থামিয়ে বন্ধু দুজনকে এক এক করে ওদের থাকার ঘরে নিয়ে এল।

ফ্রান্সিস বুনোদের রাজাকে দেখল। মুখে হলদেটে গোঁফ দাড়ি। মাথার হলদেটে চুল চুড়ো করে বাঁধা। হাতে তরোয়াল। ফ্রান্সিস এগিয়ে গেল। বুনো রাজার সঙ্গে লড়াই করতে লাগল। ফ্রান্সিস বুনো রাজার মাথার ওপর দিয়ে তরোয়াল ঘুরিয়ে আনল। বুনো রাজা চমকে গেল। ফ্রান্সিস সেই সুযোগ ছাড়ল না। বুনো রাজার হাত লক্ষ্য করে তরোয়াল চালাল। বুনো রাজার হাত বেশ গভীরভাবে কেটে গেল। বুনো রাজা বসে পড়ল। ফ্রান্সিস দাঁড়িয়ে পড়ল। দু'জন বুনো সৈন্য রাজাকে ধরে ধরে লড়াইয়ের জায়গা থেকে সরিয়ে নিল।

ওদিকে কোন বুনো সৈন্যের ছোঁড়া বর্শা রানি ইরিনার কাঁধে লাগল। রানি তরোয়াল ফেলে হাত দিয়ে কাঁধ চেপে ধরলেন। রক্ত পড়তে লাগল।

দু'তিনজন সৈন্য রানি ইরিনাকে ধরে ধরে লড়াইয়ের জায়গা থেকে সরিয়ে

নিয়ে গেল। সভাঘরের বারান্দায় রানিকে শুইয়ে দিল। একজন সৈন্য কোমরের ফেট্টি খুলে রানির ক্ষতস্থানে বেঁধে দিল। রক্ত পড়া বন্ধ হল।

রানির আহত হওয়ার সংবাদে রানির সৈন্যদের একাংশ কেমন মুষড়ে পড়ল। লড়াইয়ে আর মন নেই যেন। বুনো সৈন্যরা এই সুযোগ কাজে লাগল। পূর্ণোদ্যমে আক্রমণ চালাল। রানির সৈন্যরা হেরে যেতে লাগল।

অভিজ্ঞ ফ্রান্সিস বুঝল জেতার আশা নেই। রানির সৈন্যরা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালাতে শুরু করল। কিছু সময় পরে যুদ্ধক্ষেত্রের ছবি স্পষ্ট হল। চারদিকে প্রচুর বুনো সৈন্যরা। রানির সৈন্যরা নেই বললেই চলে।

ফ্রান্সিস হাতের তরবারি মাটিতে ফেলে গলা চড়িয়ে বলল—ভাইসব—আর লড়াই নয়। অস্ত্রত্যাগ কর।

বুনোরা যুদ্ধজয়ের আনন্দে আত্মহারা। নিরস্ত্র ফ্রান্সিসদের আক্রমণ করল না। একদল বুনো সৈন্য ফ্রান্সিসদের ঘিরে ধরল। ফ্রান্সিসরা আত্মসমর্পণ করল। বুনোরা ফ্রান্সিসদের নিয়ে চলল রানির কয়েদঘরের দিকে। যেতে যেতে হ্যারি বলল—ফ্রান্সিস, আবার কয়েদঘর। বুনোরা আমাদের নিয়ে কী করবে জানি না। এবার পালানোর পরিকল্পনা।

—সেটা আমি আগে থেকেই ভাবছি। একটা আশা—বুনোরা বোধহয় আমাদের হত্যা করবে না। শুধু বন্দী করে রাখবে। ফ্রান্সিস বলল।

—কিছুই বলা যায় না। ওদের মতলব এখনো ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। হ্যারি বলল।

—দেখা যাক। ফ্রান্সিস বলল।

রানির কয়েদঘরের বেশ বড়। আগে থেকেই কিছু বন্দী ছিল। তাদের হাতপা বাঁধা নয়। ফ্রান্সিস বলল—হয়তো আমাদেরও হাত-পা বাঁধবে না। ফ্রান্সিসরা কয়েদঘরের ঘাসের বিছানায় বসল। শাঙ্কো বলল—ফ্রান্সিস, যে করেই হোক পালাতে হবে।

—সব দেখিটেখি। তারপর পালানোর উপায় ভাববো। ফ্রান্সিস বলল।

কয়েদগরের লোহার দরজা বন্ধ হয়ে গেল। বুনো সৈন্যরা খোলা তরোয়াল হাতে কয়েদঘর পাহারা দিতে লাগল।

ওদিকে কয়েকজন প্রহরী রানি ইরিনাকে ধরাধরি করে অন্তঃপুরে নিয়ে গেল। বিছানায় শুইয়ে দিল। রানি ব্যথায় গোঙাতে লাগলেন।

কিছুক্ষণ পরে বৈদ্য এল। রানির চিকিৎসা শুরু হল।

বুনোদের আহত রাজাকে বারান্দায় শুইয়ে দেওয়া হল।

বুনো রাজা সেনাপতিকে ডেকে পাঠাল। সেনাপতি বুনো রাজার কাছে এল।

রাজা বলল—রানিকে যে বৈদ্য চিকিৎসা করতে এসেছে তাকে ধরে নিয়ে এসো। সে আমারও চিকিৎসা করবে।

সেনাপতি অন্তঃপুরের দিকে চলল।

রানির প্রহরীরা সেনাপতিকে বাধা দিতে সাহস পেল না। বৈদ্য তখন রানির ক্ষতস্থানে সবজে রঙের আঠালো একটা ওষুধ লেপে দিচ্ছিল।

রানির শয়নকক্ষে ঢুকে সেনাপতি দেখল—বৈদ্য রানির শয্যার পাশে বসে আছে। বুনো সেনাপতিকে দেখে রানি উঠে বসতে গেল। বৈদ্য বলল—এখন নড়াচড়া করবেন না। রানি বুনো সেনাপতিকে বলল—এখানে কী চাই? প্রহরী? প্রহরীর এগিয়ে এল। কিন্তু চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

সেনাপতি বলল—আপনি তো এখন আমাদের বন্দিনী। আমরা যা বলবো আপনি তাই শুনতে বাধ্য। তবে আমি আপনার কাছে আসি নি। আমাদের রাজাও আহত। ঐ এক ভাইকিং দস্যুর অস্ত্রাঘাতে। তার চিকিৎসার জন্য বৈদ্যকে নিয়ে যেতে এসেছি।

—ও। রানি আর কিছু বললেন না। সেনাপতি বৈদ্যকে বলল চলুন। বৈদ্য উঠে দাঁড়াল। বলল—চলি মাননীয়া রানি। যে ওষুধগুলো দিয়ে গেলাম নির্দেশমত খাবেন। ভয়ের কিছু নেই। এক সপ্তাহের মধ্যে ঘা শুকোতে থাকবে। অল্পদিনের মধ্যেই ভালো হয়ে যাবেন। বৈদ্য সেনাপতির সঙ্গে রানির শয়নকক্ষ থেকে বেরিয়ে এল।

সভাঘরের বারান্দায় সেনাপতির পেতে দেওয়া মোটা চাদরের ওপর বুনো রাজা শুয়েছিল। বৈদ্যকে দেখে উঠে বসল। সৈন্য পাশে বসল। বুনো রাজার ক্ষতস্থান দেখতে লাগল। বলল দেখছি—রক্ত এখনও চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়ছে। যাকগে—আমি রক্তপড়া বন্ধ করে দিচ্ছি।

বৈদ্য কাঁধ থেকে ঝোলা নামল। ঝোলায় হাত ঢুকিয়ে একটা কাচের বোতল বের করল। বোতলে কালো কালো বড়ি। সেনাপতিকে বলল—জল আনুন। সেনাপতি প্রায় ছুটে গেল। একটু পরেই কাঠের গ্লাশে জল নিয়ে এল। বৈদ্য বলল—মাননীয় রাজা—এই বড়িটা খেয়ে ফেলুন। বুনো রাজা বড়িটা খেল।

বৈদ্য এবার রানিকে যে ওষুধ দিয়েছিল সেটাই সেনাপতিকে দিল। একটা ন্যাকড়ায় বাঁধা বড়িগুলো সেনাপতি নিল। রানির ক্ষতস্থানে যে ওষুধ লাগিয়েছিল সেই ওষুধই বুনো রাজার ক্ষতস্থানেও লাগিয়ে দিল। বুনো রাজা একটু কঁকিয়ে উঠে চুপ করে গেল।

সন্ধ্যে হয়ে এল। বুনো রাজা সেনাপতিকে ডাকল। সেনাপতি এলে বলল—এখন আমার অনেক ভালো বোধ হচ্ছে। আমি দেশে ফিরে যাবো।

—অসুস্থ শরীরে পারবেন? সেনাপতি বলল।

—হ্যাঁ পারবো। এবার তোমাকে কী করতে হবে বলি। রানি কোথায় আছে?

—অন্তঃপুরের শয়নকক্ষে। সেনাপতি বলল।

—রানিকে কয়েদখানায় ঢোকাও। বুনো রাজা বলল।

—কিন্তু অন্তঃপুরে থাকলেও তো একরকম বন্দিনীই থাকবে। সেনাপতি বলল।

—উঁহু।—যে কোন মুহূর্তে প্রহরীদের সাহায্যে পালাতে পারবে। কয়েদঘরই উপযুক্ত জায়গা। বুনো রাজা বলল।

—কিন্তু ঐ কয়েদঘর—সেনাপতি আমতা আমতা করে বলল।

—আরে, রানি আর রানি নেই। যুদ্ধে হেরে এখন তো সাধারণ মানুষ। যেখানে থাকতে বলবো সেখানেই থাকতে হবে। তুমি যাও—রানিকে কয়েদঘরে নিয়ে যাও। বুনো রাজা বলল।

সেনাপতি রানির শয়নকক্ষে এল।

—আবার কী হল? রানি বলে উঠলেন।

—হল অনেক কিছু—সেনাপতি বলল—রাজার হুকুম আপনাকে কয়েদঘরে থাকতে হবে। সেনাপতি বলল।

—কী বললে? রানি ভীষণভাবে চমকে উঠে বসলেন।

—রাজার হুকুম। আপনার রাজবাড়িতে থাকা চলবে না। সেনাপতি বলল।

—আমি যাবো না। রানি বললেন।

—তাহলে আপনাকে জোর করে নিয়ে যাওয়া হবে। রাজার হুকুম আমাকে তালিম করতেই হবে। সেনাপতি বলল।

—বেশ। জোর করেই নিয়ে যাও। রানি বললেন। রানির প্রহরীরা কয়েকজন সবই দেখছিল শুনছিল। তারা আশ্চর্য হয়ে গেল। তাদের সকলের মাননীয় রানিকে কয়েদঘরে থাকতে হবে?

সেনাপতি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। একটু পরে পাঁচ-ছ'জন সৈন্য নিয়ে ঢুকল। বলল—রানিকে কয়েদঘরে নিয়ে চলো। বুনো সৈন্যরাও একটু অবাক হলো। কিন্তু সেনাপতির নির্দেশ। মানতেই হবে।

ওরা বিছানার কাছে গিয়ে রানির ডানহাত ধরল। রানির বাঁ কাঁধে বর্শার ক্ষত। রানি একবার তাঁর প্রহরীদের দিকে তাকালেন। কিন্তু কিছু বললেন না। আস্তে আস্তে বিছানা থেকে উঠে সৈন্যদের কাছে গেলেন। তারপর হেঁটে চললেন। রানিকে ঘিরে সৈন্যরাও চলল।

কয়েদঘরের কাছে এসে দাঁড়ালেন। লোহার দরজার ফাঁক দিয়ে ফ্রান্সিসরা রানিকে দেখল। ওরা অবাক হয়ে গেল। রানি কয়েদঘরে থাকবেন?

ঢং-ঢং শব্দে কয়েদঘরের দরজা খোলা হল। রানি কয়েদঘরে ঢুকলেন।

ফ্রান্সিস ঘরের কোণার দিকে রানির জন্যে একটা জায়গা করে দিল। রানি বসলেন। একটু কষ্ট করেই বসতে হল। বাঁ কাঁধে বর্শার ক্ষত।

রানির থমথমে মুখের দিকে তাকিয়ে ফ্রান্সিস আর কোন কথা বলল না। নিজের জায়গায় চলে এল। হ্যারি বলল—বুনো রাজা বুনোর মতই এই কাণ্ড করল। রানিকে কয়েদঘরে ঢোকাল। রানি তো একজন মহিলা তাকে এই জঘন্য পরিবেশে বন্দী করে রাখা—কোনভাবেই এটাকে মেনে নেওয়া যায় না।

রানি ব্যাপারটাকে অত্যন্ত অপমানজনক মনে করলেন। নিজের তৈরি কয়েদঘরে নিজেই বন্দী। রানি মাথা নিচু করে চুপ করে বসে রইলেন।

ফ্রান্সিস তার আহত দুই বন্ধুর চিকিৎসার ব্যবস্থা করছিল। বৈদ্য তাদের ওষুধ দিয়েছিল। ওষুধ ক্ষতস্থানে লাগিয়ে বড়ি খেয়ে ওরা এখন অনেকটা সুস্থ।

বিকেলে বৈদ্য এল। কয়েদঘরে ঢুকে রানির ক্ষতস্থানে ওষুধ লাগিয়ে দিল। খাওয়ার জন্যে কয়েকটা বড়িও দিয়ে গেল। ফ্রান্সিসের বন্ধুদের খাওয়ার জন্যে কালো বড়ি দিয়ে গেল। ফ্রান্সিসদের বন্ধুদেরও জন্য কালো বড়ি দিয়ে গেল। রানি অনেকটা সুস্থ বোধ করতে লাগলেন।

একদিন পরে সন্ধ্যেবেলা বুনো সৈন্যদের খুব হৈ হল্লা শোনা গেল।

রাত হতেই হৈ-হল্লা বাড়ল। হুল্লোড় চলল।

প্রহরীরা রাতের খাবার দিতে এল। খেতে খেতে হ্যারি জিজ্ঞেস করল—এত হৈ হুল্লা কীসের ভাই?

—ব্বাঃ আমরা যুদ্ধে জিতেছি না। যুদ্ধজয়ের উল্লাস আনন্দ চলছে। দেশ থেকে পাঁচ পিপে আরক আনা হয়েছে। একটু পরেই নেশার আরক খাওয়া শুরু হবে।

প্রহরীরা চলে গেল। হ্যারি বলল—ফ্রান্সিস বুঝলে কিছু?

—হ্যাঁ। বুঝলাম সৈন্যরা নেশাটেশা করবে। ফ্রান্সিস বলল।

—আমাদের পালানোর সুবর্ণ সুযোগ। বুনোদের নেশার আরক। মানে সাংঘাতিক নেশার জিনিস। আরক খেলে কেউ উঠে দাঁড়াতে পারবে না। হ্যারি বলল।

উত্তেজনায় ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়াল। চাপাস্বরে বলল—ভাইসব, মুক্তির উপায় পেয়ে গেছি। ঘটনা আমাদের স্বপক্ষে এলে আমরা অনায়াসে পালাতে পারবো।

ওদিকে সৈন্যদের হৈ-হল্লার শব্দ স্থিমিত হয়ে এল।

কিছু পরে চারিদিক নিস্তব্ধ হয়ে গেল। নেশার আরক খেয়ে সৈন্যরা সব মাঠে গাদাগাদি হয়ে পড়ে আছে। এমন কি প্রহরী দুজনও কয়েদঘরের সামনে খোলা তরোয়াল হাতে শুয়ে পড়েছে। বোঝাই যাচ্ছে নেশার আরক সবাই খেয়েছে।

ফ্রান্সিস দরজার কাছে গেল। দেখল চাবিওয়ালা পাহারাদারটি লম্বালম্বি পড়ে আছে। অনড়। কোমরে চাবির গোছা। ফ্রান্সিস দরজার ফাঁক দিয়ে হাত বাড়াল। প্রহরীটিকে ধরতে পারল না। কিন্তু প্রহরীটিকে ধরতে না পারলে চাবির গোছা পাওয়া যাবে না।

বন্ধুরা অনেকেই এসে তখন দরজার কাছে দাঁড়িয়েছে। সবাই উত্তেজিত। পালাবার সুযোগ এসেছে।

—হ্যারি, প্রহরীটাকে কী করে কাছে আনা যায়? ফ্রান্সিস বলল।

হ্যারি বলল—শাঙ্কো—খাবার দেবার আগে প্রহরীরা একটা লোহার ডান্ডা দিয়ে দরজায় ঘা দেয়—ঐ ডান্ডাটা নিয়ে এসো।

শাঙ্কো দ্রুত দরজায় ঝোলানো লোহার ডান্ডাটা নিয়ে এল। হ্যারি ডান্ডাটা দেখে লাফিয়ে উঠল। বলল—ফ্রান্সিস যা চেয়েছি ঠিক পেয়ে গেছি।

—ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলো। ফ্রান্সিস বলল।

—বুঝলে না? ডান্ডাটার মাথাটা দেখ বাঁকানো। ডান্ডাটা দরজার ফাঁক দিয়ে বের করে বাঁকানো মাথাটা চাবিওয়ালা প্রহরীর কোমরের ফেট্টিটায় আটকে নাও। তারপর ওকে টেনে টেনে দরজার কাছে নিয়ে এসো। তখন চাবি হাতের মুঠোয়।

ফ্রান্সিস মৃদুস্বরে বলল—সাবাস হ্যারি।

ফ্রান্সিস কাজে লাগল। লোহার ডান্ডাটা দরজার ফাঁক দিয়ে বাইরে বের করল। তারপর চাবিওয়ালা প্রহরীর কোমরের ফেট্টিতে আটকে টানতে লাগল। আস্তে আস্তে প্রহরীর শরীরটা দরজার কাছে আসতে লাগল। তারপর একেবারে নাগালের মধ্যে। ফ্রান্সিস চাবি খুঁজতে লাগল। শাঙ্কো বলল—আমি দেখেছি দরজার চাবিটা। শাঙ্কো সবচেয়ে বড় চাবিটা দেখাল। প্রহরী জড়ানো গলায় কী বলল। উঠতে পারল না।

এবার দরজা খোলা। ফ্রান্সিস ভেতর থেকে হাত বাড়িয়ে তালায় চাবি ঢোকাতে লাগল। একটু এদিক ওদিক করতে চাবি ঢুকে গেল। ফ্রান্সিস ডানদিকে মোচড় দিল। তালা খুলে ঝুলে রইল!

ফ্রান্সিস দ্রুত রানির কাছে গেল। বলল—মাননীয়া রানি কয়েদঘরের দরজা খুলেছি। আমরা পালাচ্ছি। আপনি অসুস্থ। কী করবেন?

—তোমাদের সঙ্গে ছুটোছুটি করতে পারবো না। আমি মন্ত্রীর বাড়িতে আত্মগোপন করবো। পরে আরো সৈন্য সংগ্রহ করে বুনোদের তাড়াবো। রানি বললেন।

—তাহলে আমার বন্ধু আপনাকে মন্ত্রীর বাড়িতে পৌঁছে দেবে। চলুন। ফ্রান্সিস বলল।

ফ্রান্সিসরা কয়েদঘর থেকে বেরিয়ে এল। দেখল মাঠে সব সৈন্য জড়াজড়ি করে পড়ে আছে। চাঁদের আলোয় দেখল বুনোদের রাজা একটা কাঠের সিংহাসনে চিৎপাৎ হয়ে পড়ে আছে।

ফ্রান্সিসরা খুব সাবধানে মাটিতে পড়ে থাকা সৈন্যদের গায়ে পা না ঠেকিয়ে মাঠটা পার হল।

ওদিকে শাঙ্কো রানিকে ধরে ধরে মন্ত্রীর বাড়ির দিকে চলল। রানি ছুটতে পারছিলেন না। যতটা দ্রুত সম্ভব চললেন। মন্ত্রীর বাড়ির সামনে এল দুজনে। শাঙ্কো আস্তে বলল—ডাকাডাকি করা যাবে না বা দরজায় ধাক্কা দেওয়া যাবে না—কোনরকম শব্দ করা চলবে না। নিশ্চয়ই পেছনের দিকে দরজা আছে। সেদিকে চলুন।

দুজনে পেছনের দরজার কাছে এল। শাঙ্কো দরজায় মৃদু টোকা দিল। কিন্তু ভেতরে কারো সাড়াশব্দ নেই।

এবার শাঙ্কো গলা দিয়ে হাত ঢুকিয়ে ছোরাটা বের করল। দরজার ফাঁক দিয়ে ছোরাটা ঢোকাল। তারপর খুব জোরে ওপরের দিকে ছোরাটা টানল। খিল খুলে গেল।

—ঢুকে পড়ুন। শাঙ্কো বলল। রানি দ্রুত ঢুকে পড়ল। শাঙ্কো ছুটল ফ্রান্সিসদের ধরবার জন্যে।

সদর রাস্তায় এসে চাঁদের আলোয় দেখল ফ্রান্সিসরা বেশ দূরে চলে গেছে। শাঙ্কো প্রাণপণে ছুটল। কিছুক্ষণের মধ্যেই ফ্রান্সিসদের ধরল।

এবার ভাইকিংরা দ্রুত ছুটতে লাগল। গভীর রাত। রাস্তা জনশূন্য। ফ্রান্সিসরা ছুটল।

ছুটতে ছুটতে ওরা গৃহকর্তার বাড়ির কাছে এল। শাঙ্কো বলল—চলো না—এই গৃহকর্তার বাড়িতে বাকি রাতটা কাটিয়ে—

—পাগল হয়েছো। এই কালজেন ছেড়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পালাতে হবে। ফ্রান্সিস বলল।

ফ্রান্সিসরা ছুটতে ছুটতে সেই বনভূমির কাছে এল। তারপর বনভূমিতে ঢুকে প্রায় নিকষ অন্ধকারে কিছুদূর গেল। ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে বলল—দাঁড়াও। এবার বিশ্রাম।

সবাই দাঁড়িয়ে পড়ল। এখানে ওখানে গাছের গুড়িতে ঘাসে ঝরাপাতায় সবাই বসে পড়ল। অনেকটা পথ ছুটে এসেছে। কমবেশি সবাই হাঁপাচ্ছে তখন।

হ্যারি বলল—ফ্রান্সিস এবার কী করবে?

—এই অন্ধকারে বন পার হতে গেলে জখম হওয়ার সম্ভাবনা। তার চেয়ে

দিনের বেলা—একটু আধটু আলো পাওয়া যাবে তখন পার হওয়াই নিরাপদ। ভোর হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

সবাই ভোরের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। কেউ কেউ গাছের গুঁড়িতেই শুয়ে পড়ল। কেউ ঝরাপাতায়, কেউ ঘাসে।

ভোর হল। পাখিপাখালির ডাক শুরু হল। ফ্রান্সিসরা সজাগ হলো। ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়াল। বলল—চলো।

সবাই উঠে দাঁড়ালো। বনতল দিয়ে চলল। আবছা দেখা যাচ্ছে গাছের গুড়ি ডালপাতা। সেসবের মধ্যে দিয়ে ফ্রান্সিসরা চলল।

হঠাৎই দেখল বিদ্রোহী পারেলাদের বড় ঘরটা পুড়ে ছাই হয়ে পড়ে আছে। ফ্রান্সিস দুঃখ পেল। ও মনেপ্রাণে পারেলাদের সাফল্য কামনা করল।

বনভূমি শেষ। ফ্রান্সিস একটু গলা চড়িয়ে বলল—আমরা ছুটে রাজা কাদর্জার রাজ্য পার হয়ে যাবো। কেউ দাঁড়িয়ে পড়বে না। প্রাণপনে ছুটবে।

ফ্রান্সিসের কথামতোই বন্ধুরা প্রাণপনে ছুটল। রাস্তার লোকজন দাঁড়িয়ে দেখল। এরা ছুটছে কেন?

রাস্তায় টহলরত কিছু সৈন্য ফ্রান্সিসদের চিনল। কিন্তু ওরা কী করবে বুঝে ওঠার আগেই ফ্রান্সিসরা অনেক দূরে চলে গেল। রাজা কাদর্জার রাজ্য জামিনা শেষ হল।

এবার রাজা কাদর্জার সেনাপতির রাজত্ব।

তখন দুপুর। সবারই খিদে পেয়েছে। হ্যারি বলল—ফ্রান্সিস, চলো কারো বাড়িতে আশ্রয় নি। খেয়ে বিশ্রাম করে সন্ধ্যের সময় এই রাজত্ব পার হই।

ফ্রান্সিস একটুক্ষণ ভাবল। তারপর বলল—তা মন্দ বলোনি। অন্ধকারে পার হয়ে যাবো।

—তাহলে একটা বাড়ি দেখি। শাঙ্কো বলল। তারপর এদিক ওদিক ঘুরে এসে আঙ্গুল দিয়ে একটা বড় বাড়ি দেখাল। বলল—ঐ বাড়িতেই চল।

ওরা ঐ বাড়ির দরজার কাছে এল। বাইরের দরজা খোলা। দেখল একজন মাঝবয়সী স্ত্রীলোক উঠোনে পাতা মোটা কাপড়ের ওপর বসে আসন বুনছে। দুটি ছেলেমেয়ে ছুটোছুটি করেছে।

দরজায় ফ্রান্সিসদের দেখে মহিলাটি একটু চমকালো। ফ্রান্সিসদের বিদেশী পোশাকই তার কারণ।

মহিলা দরজার কাছে এগিয়ে গেল। হ্যারি মহিলার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। বলল—মা, আমরা বিদেশি। সেই কানজেন রাজ্য থেকে আসছি। আমরা খুবই ক্ষুধার্ত। খাদ্য চাই। বিশ্রাম চাই। আপনি কি তার ব্যবস্থা করতে পারবেন?

একটু চুপ করে থেকে মহিলা বলল—আমার স্বামী তো কাজে গেছে। সে

থাকলে ভাবতাম না। কিন্তু তোমরা বিদেশী অতিথি। তোমাদের কি না খাইয়ে ফেরাতে পারি? তোমরা উঠোনে বসো। আমি সব জোগাড়-টোগাড় করছি।

মহিলাটি উঠোনে আর একটা মোটা চাদর বিছিয়ে দিল। ফ্রান্সিসরা বসল। ফ্রান্সিস শুয়ে পড়ল।

মহিলা বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল। তখনই একটি বড় মেয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। ছোট ছেলেমেয়ের সঙ্গে খেলতে লাগল। ফ্রান্সিসরা কেউ কেউ ছেলেমেয়ে দুটিকে ডেকে নিয়ে আদর করল।

কিছুক্ষণ পর মহিলাটি ঝোলাভর্তি বোধহয় আলুটালু, আনাজ নিয়ে ঢুকল। বলল—তোমাদের ভাগ্য ভাল মাছ পেয়েছি।

রান্না চলল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই রান্না হয়ে গেল। ফ্রান্সিসরা উঠোনেই খেতে বসল। মাছ ঝোলতরকারি শাক দিয়ে ফ্রান্সিসরা মোটামুটি পেট পুরেই খেল।

ফ্রান্সিসরা শুয়ে বসে বিশ্রাম করতে লাগল।

বিকেল হল। মহিলাটির স্বামী ফিরল। হ্যারি গৃহকর্তার কাছে গেল। বলল—আমরা বিদেশী। আপনার বাড়িতে অতিথি হয়েছি। আপনার স্ত্রী আমাদের খেতে দিয়েছেন। আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ। সন্ধ্যে হলেই আমরা চলে যাবো।

—রাতেও থেকে যেতে পারেন। গৃহকর্তা হেসে বলল।

—না। আমাদের তাড়া আছে। হ্যারি বলল।

শাঙ্কো কোমরবন্ধনী থেকে একটা সোনার চাকতি বের করে বলল—এটা আপনাকে নিতেই হবে।

—না-না। আপনারা অতিথি। ভদ্রলোক বললেন।

—তবু কিছু তো কেনাকাটা করতে হয়েছে। নিন। শাঙ্কো বলল।

—বেশ। দাও। গৃহকর্তা সোনার চাকতি নিল।

সন্ধ্যে হল। চারিদিক অন্ধকার হয়ে গেল।

ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়াল। বলল—আর দেরি নয়। ছোটো। রাজা কাদর্জার সেনাপতির রাজত্বে ছুটে আমরা দক্ষিণ দিকে চলে যাবো। সেখানে পাহাড়ি এলাকায় কোন গুহায় আশ্রয় নেব।

ফ্রান্সিসরা বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল। তারপর অন্ধকারে ছুটল। কিছুক্ষণের মধ্যেই ওরা সৈন্যাবাসের কাছে এল। ফ্রান্সিসরা গলা চড়িয়ে বলল—কেউ দাঁড়িয়ে পড়বে না। সমান গতিতে ছুটবে।

সৈন্যাবাস থেকে কয়েকজন সৈন্য অলস দৃষ্টিতে ফ্রান্সিসদের দৌড়ে যেতে দেখল। ফ্রান্সিসরা দৌড়ুচ্ছে কেন ওরা বুঝল না।

পাহাড়ি এলাকার কাছাকাছি এসেছে তখনই সেনাপতির একদল সৈন্যকে

দক্ষিণ দিক থেকে আসতে দেখা গেল। সৈন্যদের কয়েকজন ফ্রান্সিসদের চিনল। ওরা নিরস্ত্র। খালি হাতে ফ্রান্সিসদের ধরতে এল। খালি হাতে লড়াই লেগে গেল। অল্পক্ষণের মধ্যেই কয়েকজন সৈন্য আহত হয়ে মাটিতে পড়ে গেল।

ফ্রান্সিসরা আর দাঁড়াল না। আবার ছুটতে শুরু করল। সৈন্যরা আর পিছু ধাওয়া করল না।

ম্লান জ্যোৎস্নায় পাহাড় জঙ্গল এলাকা দেখা গেল।

ফ্রান্সিস স্থির করেছিল পাহাড়ের কোন গুহায় ওরা আত্মগোপন করবে। দিনকয়েক অপেক্ষা করে রাজা পারকোনের খোঁজ করবে। রাজা পারকোনকে পেলে তাঁর সৈন্যদের জড়ো করবে। নিজেরাও যুদ্ধের জন্য তৈরি হবে। রাজা কাদর্জা তার সেনাপতি আভিন্দাকে এই রাজ্যের রাজা করে দিয়ে গেছে। ফ্রান্সিস স্থির করল আভিন্দার সৈন্যদলকে আক্রমণ করবে। এখন ওরা নিশ্চিন্ত। এই সুযোগেই আক্রমণ করতে হবে।

ফ্রান্সিসরা ঝোপজঙ্গলের মধ্য দিয়ে পাহাড়টার ঢালের দিকে চলল। ওরা অনেকটা নিশ্চিন্ত ছিল যে বর্তমান রাজা আভিন্দার সৈন্যদের মুখোমুখি হতে হবে না। ওরা নিশ্চিন্ত মনেই বনের মধ্য দিয়ে চলল। বনজঙ্গল শেষ হতেই ওদের থমকে দাঁড়াতে হল। সামনেই পাহাড়ের পাদদেশে রাজা আভিন্দার একদল সৈন্য বর্শা হাতে দাঁড়িয়ে। এই আকস্মিক ঘটনায় নিরস্ত্র ফ্রান্সিসরা কী করবে বুঝে উঠতে পারল না।

ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে বলল—আমাদের হাতে অস্ত্র নেই। ওদের ওপর পাথর ছোঁড়ো। ভাইকিংরা সঙ্গে সঙ্গে নিচু হয়ে পাথরের টুকরো তুলে নিয়ে রাজা আভিন্দার সৈন্যদের দিকে ছুঁড়তে লাগল। এবার আভিন্দার সৈন্যরাও ফ্রান্সিসদের দিকে পাথর ছুঁড়তে লাগল। পাথর ছোঁড়াছুঁড়ি চলল। দুপক্ষেই কয়েকজন আহত হল।

শাঙ্কো আর বিস্কো পাহাড়ের ধার থেকে একটা বড় পাথরের চাঁই ঠেলে গড়িয়ে দিল। পাথরের চাঁই গড়িয়ে আভিন্দার সৈন্যদের ওপর পড়ল। সবাই সরে যেতেও পারল না। পাথরের চাঁই-এর নিচে চাপা পড়ে কয়েকজন সৈন্য মারা গেল। কিন্তু সৈন্যরা দলে ভারি। অল্পক্ষণের মধ্যেই দ্রুত ওরা ফ্রান্সিসদের ঘিরে দাঁড়াল। ফ্রান্সিস বুঝল—এখন লড়াই করতে যাওয়া বোকামি। ওদের হাতে লড়াইয়ের অস্ত্র নেই। লড়তে গেলে মরতে হবে। ততক্ষণে সৈন্যরা ফ্রান্সিসদের ঘিরে ফেলেছে। ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে বলল—আত্মসমর্পণ কর। এছাড়া বাঁচার কোন উপায় নেই।

ভাইকিংরা আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হল। সৈন্যদের দলনেতা এগিয়ে এল। বলল—রাজবাড়ির দিকে চলো। কেউ পালাবার চেষ্টা করবে না।

সৈন্যরা ফ্রান্সিসদের ঘিরে নিয়ে চলল। সবাই বনের মধ্যে ঢুকল। ছাড়া ছাড়া গাছের বন। বনতল ততটা অন্ধকার নয়। এখানে ওখানে ভাঙা ভাঙা রোদ দেখা যাচ্ছে। যেতে যেতে হ্যারি বলল—ফ্রান্সিস আবার বন্দীদশা।

—পালাবার উপায় বের করতে হবে। ফ্রান্সিস বলল।

—দেখ ভেবে। হ্যারি বলল।

সবাই চলল। যেতে যেতে দু'একজন ভাইকিং বন্ধু দেশীয় ভাষায় বলল—ফ্রান্সিস—লড়াই করে পালাতে পারতাম।

—না। পারতে না। লড়াই করতে গেলে বেশ কিছু বন্ধুর প্রাণ যেত। আমি সেটা চাই না। সময়সুযোগ বুঝে ঠিক পালাবো। এখন বন্দীদশাই মেনে নাও। ফ্রান্সিস বলল।

সবাই চলল। রাস্তার লোকেরা ওদের দেখে একটু অবাকই হল। এই বিদেশীরা এখানে কেন?

সবাই পাথরের সিঁড়ি দিয়ে গর্ভগৃহে নেমে গেল। রাজসভার একপাশে ফ্রান্সিসদের দাঁড় করিয়ে রাখা হল। ফ্রান্সিস তখনও ভেবে পাচ্ছে না রাজা আভিন্দা ওদের নিয়ে কী করবে। বন্দী করে রাখবে না মুক্তি দেবে। তবে এটাও বুঝল মুক্তির সম্ভাবনা খুবই কম। ওদের কয়েদঘরেই পাঠানো হবে।

বিচারসভা শেষ। সৈন্যদের দলনেতা এগিয়ে গিয়ে রাজা আভিন্দাকে কিছু বলল। রাজা ফ্রান্সিসদের এগিয়ে আসতে ইঙ্গিত করল। ফ্রান্সিস এগিয়ে গেল।

—তোমরা রাজা পারকোনের হয়ে আমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছো। রাজা আভিন্দা বলল।

—হ্যাঁ। করেছি। ফ্রান্সিস বলল।

—কেন? রাজা আভিন্দা বলল।

—রাজা পারকোনকে একজন সৎ ও ন্যায়পরায়ণ রাজা বলে মনে করেছি। ফ্রান্সিস বলল।

—রাজা পারকোন এখন পালিয়ে বেড়াচ্ছে।

—হ্যাঁ। শুনেছি। ফ্রান্সিস মাথা ওঠানামা করে বলল।

—তোমরা ফাঁসির মঞ্চ থেকে পালিয়েছো। আভিন্দা বলল।

—হ্যাঁ। ফ্রান্সিস আবার মাথা ওঠানামা করল।

—কিন্তু এবার আমার পাল্লায় পড়েছো। পালাবার সব রাস্তা বন্ধ করে দেব। আভিন্দা বলল।

—আপনি রাজা। নিশ্চয়ই তা পারেন। ফ্রান্সিস বলল।

রাজা আভিন্দা দলনেতার দিকে তাকাল। বলল—সব কটাকে কয়েদঘরে ঢোকাও। পরে ফাঁসিতে লটকাবো।

দলনেতা ফ্রান্সিসদের কাছে এল। বলল—চলো সব।

ফ্রান্সিসরা দলনেতার পেছনে পেছনে চলল। কয়েকজন সৈন্য বর্শা হাতে ফ্রান্সিসদের পেছনে পেছনে চলল। বোঝা গেল আভিন্দা ওদের পালাবার কোন সুযোগই দেবে না।

গর্ভগৃহের একটা ঘরের সামনে এল সবাই। ঘরটার দরজা লোহার। দরজায় তালা ঝুলছে। দুজন প্রহরী বর্শা হাতে দাঁড়িয়ে। একজন চাবির গোছা কোমর থেকে খুলে দরজার দিকে এগিয়ে গেল। তালা খুলল। দলপতি হাতের ইঙ্গিতে ফ্রান্সিসদের ঘরে ঢুকতে বলল। ফ্রান্সিসরা একে একে ঘরটায় ঢুকল। ঘরে একটা মশাল জ্বলছে। মশালের অলোতে দেখা গেল ঘরটা বেশ ছোট। পাথর-কাটা দেয়াল। মেঝেয় গম গাছের শুকনো পাতা বিছানো। দুজন বন্দী শুয়ে আছে। ফ্রান্সিসদের ঢুকতে দেখে ওরা উঠে বসল। ফ্রান্সিসরা বসল। বেশ অসুবিধার মধ্যেই বসতে হল। ঘরের ঐ ছোট মেঝেয় ছড়িয়ে বসার উপায় নেই। ফ্রান্সিস দুপা গুটিয়ে শুয়ে পড়ল। ভাইকিং বন্ধুরাও কেউ কেউ হাত পা গুটিয়ে কেউ কেউ কুকুর কুণ্ডলী হয়ে শুল। হ্যারি ফ্রান্সিসের পাশেই বসে ছিল। বলল—পালানোর উপায় ভাবো।

—বন্দী হবার সময় থেকেই ভাবছি। এবার সব ভালোভাবে নজর দিতে হবে। দেখা যাক—কোন ফাঁক পাই কিনা। ফ্রান্সিস বলল।

বিকেল হল। প্রহরীরা বিকেলের খাবার দিয়ে গেল। পোড়া রুটি আনাজপাতির ঝোল। ক্ষুধার্ত ফ্রান্সিসরা গোগ্রাসে খেল। অনেকে আবার খাবার চাইল। প্রহরীরা কোন কথাই বলল না। চলে গেল। অগত্যা অপেক্ষা করতে হবে রাতের খাবারের জন্যে।

কয়েকদিন কাটল। শুয়ে বসে। আভিন্দা মাত্র একদিন এসেছিল। হেসে বলেছিল—রাজা কাদর্জা শুনেছেন তোমাদের বন্দী করা হয়েছে। আমাদের একসঙ্গে ফাঁসি দেবার দিন স্থির করবেন রাজা কাদর্জাই। এরকম একটা গণফাঁসি দেখবার জন্যে উনি উদ্‌গ্রীব হয়ে আছেন। মানুষের মৃত্যু দেখতে উনি খুব ভালোবাসেন। ফ্রান্সিসরা কেউ কোন কথা বলল না।

—দেখা যাক রাজা কাদর্জা কোনদিনটা স্থির করেন? আভিন্দা হেসে বলল।

—দিনটা রাজা কাদর্জার জন্মদিন হলে ভালো হয়। হ্যারি বলল।

—ব্বাঃ আভিন্দা প্রায় লাফিয়ে উঠল—ভালো বলেছো তো। এ মাসের বাইশ তারিখ রাজা কাদর্জার জন্মদিন। আজকে আঠারো তারিখ। মাত্র চারদিন পরে। ব্বাঃ। আজকেই এই কথাটা রাজা কাদর্জাকে বলার জন্যে লোক পাঠাবো। এবার ফ্রান্সিস বলল—এখানে কি অন্য কোন কয়েদঘর নেই?

—কেন বলো তো? রবার্তো বলল।

—এই ছোট ঘরটায় আমাদের গাদাগাদি করে থাকতে হচ্ছে।

আভিন্দা হা হা করে হেসে উঠল। হাসি থামিয়ে বলল—আর তো মোটে তিন রাত বেঁচে থাকবে। চারদিনের দিন তো তোমাদের জীবন শেষ। এ'কটা দিন একটু কষ্ট করে থাকো। ফ্রান্সিসরা আর কেউ কোন কথা বলল না।

আভিন্দা চলে গেল। যাবার সময় প্রহরীদের বলে গেল—কড়া পাহারায় রাখছি। একজনও যাতে পালাতে না পারে। যদি পালায় তোরা মরবি।

রাতে খাওয়া শেষ হল। হ্যারি ডাকল—ফ্রান্সিস।

—হুঁ। বলো।

—রাজা কাদর্জা নরপশু। সে গণ ফাঁসি দেখার জন্যে মুখিয়ে আছে। তার আগেই আমাদের পালাতে হবে। গভীরভাবে ভেবে উপায় বের কর। হ্যারি বলল।

—উপায় একটা আছে। ফ্রান্সিস বলল।

—উপায় আছে? হ্যারি সাগ্রহে বলল।

—হ্যাঁ। তবে পালানো নয়। অন্যভাবে। ফ্রান্সিস বলল।

—কীভাবে? হ্যারি জানতে চাইল।

—রাজা আভিন্দাকে লোভানি দিতে হবে। ধনভাণ্ডারের লোভ বড় সাংঘাতিক। ফ্রান্সিস বলল।

—পারবে ওকে কব্জা করতে? হ্যারি বলল।

—অবশ্যই পারবো। কাল সকালে রাজা আভিন্দার সঙ্গে কথা বলবো। দেখা যাক—ও কতটা লোভী হয়।

পরদিন সকালের খাবার খাওয়া শেষ হল। ফ্রান্সিস দরজার কাছে গেল। একজন প্রহরীকে হাতছানি দিয়ে ডাকল। প্রহরী এগিয়ে গেল। কিন্তু ফ্রান্সিসের থেকে দূরত্ব বজায় রেখে দাঁড়াল। ফ্রান্সিস বুঝল প্রহরীরা খুব সাবধান হয়ে গেছে।

—রাজা আভিন্দাকে একবার আসতে বলো।

—কেন? প্রহরী বলল।

—সেটা রাজাকেই বলবো। ফ্রান্সিস বলল।

—রাজা এখন রাজসভায় বসবেন। প্রহরী বলল।

—বিচারটিচার সেরেই যেন আসেন। ফ্রান্সিস বলল।

—তোমার কথায় রাজা আসবেন না। প্রহরী বলল।

—তুমি গিয়ে বলবে এই গর্ভগৃহের গুপ্ত ধনভাণ্ডার নিয়ে আমি কথা বলবো। ফ্রান্সিস গলা নামিয়ে বলল।

—বেশ। বলে দেখি। প্রহরী বলল।

প্রহরী আর একজন প্রহরীকে পাহারায় রেখে চলে গেল।

অল্পক্ষণের মধ্যেই হন্তদন্ত হয়ে প্রহরীটি ফিরে এল। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল—রাজা আসছেন। ফ্রান্সিস মৃদু হেসে হ্যারির দিকে তাকিয়ে বলল—বোঝ ধনলিপ্সা কী জিনিস। রাজকার্য ছেড়ে রাজা ছুটে আসছে।

ফ্রান্সিসের কথা শেষ হতেই রাজা আভিন্দা এসে হাজির। হেসে বলল—গুপ্ত ধনভাণ্ডারের ব্যাপারে তোমরা কী বলতে চেয়েছো শুনলাম।

—হ্যাঁ। ঠিকই শুনেছেন। এখানকার গর্ভগৃহগুলোর মধ্যে কোথাও আছে রাজা পারকোনের পিতামহের গুপ্ত ধনভাণ্ডার। ফ্রান্সিস বলল।

—তোমরা শুনেছো তবে। রাজা আভিন্দা বলল।

—হ্যাঁ। রাজা পারকোনই বলেছেন—ফ্রান্সিস বলল।

—তোমার নাম কী? আভিন্দা জানতে চাইল।

—ফ্রান্সিস। ফ্রান্সিস বলল।

—তুমি পারবে সেই গুপ্ত ধনভাণ্ডার খুঁজে বের করতে? আভিন্দা বলল।

—হ্যাঁ। পারবো। ফ্রান্সিস মাথা কাত করে বলল। এবার হ্যারি বলল—ফ্রান্সিস এর আগে অনেক গুপ্তধন খুঁজে বের করেছে। বুদ্ধি খাটিয়ে অনেক চিন্তাভাবনা করে।

—বেশ। দেখ চেষ্টা করে। আভিন্দা বলল।

—কিন্তু আমার শর্ত আছে। ফ্রান্সিস বলল।

—তার মানে সেই ধনভাণ্ডার তুমি নেবে। আভিন্দা বলল।

—না। একটা স্বর্ণমুদ্রাও নেব না। ফ্রান্সিস বলল।

—তবে কী শর্ত? আভিন্দা বলল।

—আমরা দুজন কয়েদ হয়ে থাকবো। বাকি আমার সব বন্ধুদের মুক্তি দিতে হবে। ফ্রান্সিস বলল।

—আগে গুপ্তধন আবিষ্কার কর। তারপর তোমাদের মুক্তির কথা ভাবা যাবে। আভিন্দা বলল।

—না। আগে বন্ধুদের মুক্তি চাই। ফ্রান্সিস বলল।

আভিন্দা মাথা নিচু করে কিছুক্ষণ ভাবল। তারপর মাথা তুলে বলল—ঠিক আছে। আমার গুপ্তধন চাই। গুপ্তধন উদ্ধার হলে তার ভাগীদার কেউ হবে না। তুমি তো কিছুই পাবে না। আভিন্দা বলল।

—আমি কিছু চাইবোও না। ফ্রান্সিস বলল।

—বেশ। আর একটা কথা। এই গুপ্তধনের খোঁজাখুজির ব্যাপারটা রাজা কাদর্জাকেও জানানো চলবে না। আভিন্দা বলল।

—তার মানে আপনি একাই গুপ্তধনের সবটাই নেবেন। ফ্রান্সিস বলল।

রাজা আভিন্দা হেসে বলল—তুমি বেশ বুদ্ধিমান।

বন্ধুরাও বলে বটে। ফ্রান্সিস এতক্ষনে হেসে বলল।

—মনে হয়, তুমি পারবে। আভিন্দা বলল।

দেখি চেষ্টা করে। তবে আমার কিছু বলার আছে। ফ্রান্সিস বলল।

—বেশ। বলো। আভিন্দা বলল।

—আমাদের দুজনকে সবরকম স্বাধীনতা দিতে হবে। সব গর্ভগৃহ আমরা খুজবো। যেখানে প্রয়োজন পড়বে যাবো। কেউ আমাদের বাধা দেবে না। ফ্রান্সিস বলল।

—ঠিক আছে। তবে খোঁজার কাজ সন্ধ্যার আগেই এই কয়েদ ঘরে থাকতে হবে। আর এই রাজ্যের বাইরে কোথাও যেতে পারবে না। আভিন্দা বলল।

—বেশ। আমি মেনে নিলাম। ফ্রান্সিস মাথা কাত করে বলল।

এবার রাজা আভিন্দা প্রহরীদের দিকে তাকাল। বলল—কাল সকালে দুজন বাদে বাকি সবাইকে ছেড়ে দিবি। রাজা আভিন্দা চলে গেল।

রাতে খাওয়া শেষ হল। ফ্রান্সিস শুয়ে পড়ল। হ্যারি ডাকল—ফ্রান্সিস।

—হুঁ। ফ্রান্সিস হ্যারির দিকে তাকাল।

—বন্ধুরা বলছিল তোমার আমার বন্দীত্বের বিনিময়ে ওরা মুক্তি চায় না। হ্যারি বলল।

—ওরা আবেগ তাড়িত হয়ে এসব বলছে। ঠিক আছে আমি সব বুঝিয়ে বলছি। ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়াল। ওর দেশীয় ভাষায় বলল—ভাইসব তোমরা আমাকে আর হ্যারিকে ভালোবাসো। তাই আমারা বন্দী হয়ে থাকবো এটা মেনে নিতে পারছো না। কিন্তু এখন আবেগটাবেগের কথা বলো না। শোন—তোমরা মুক্তি পেয়ে জাহাজে ফিরে যাবে না। দক্ষিনের পাহাড়ের কোন গুহায় আশ্রয় নেবে। রাজা পারকোন ঐ এলাকায় কোন গুহায় আশ্রয় নিয়েছেন। সঙ্গে তাঁর বিশ্বস্ত সৈন্যরাও নিশ্চয়ই রয়েছে। তোমরা ওখানে আশ্রয় নিয়ে রাজা পারকোনোর খোঁজ করবে। সময় লাগলেও এটা করবে। রাজা পারকোনকে পেলে তাঁর সৈন্যদের সন্ধান করে বের করবে। যত সৈন্য এভাবে জড়ো করা সম্ভব হবে। আমি সময়মত তোমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করবো। তারপর দলে ভারি হয়ে আমরা রাজা আভিন্দার নিশ্চিন্ত সৈন্যদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বো। তারপর লড়াই। রাজা আভিন্দাকে এই রাজ্য থেকে তাড়াবো। রাজা পারকোনকে সিংহাসনে বসাবো। তারপর গুপ্তধন খুঁজবো। খুঁজে পাই তো রাজা পারকোনকে সব দিয়ে আমরা জাহাজে ফিরে যাবো। এছাড়া অন্য কোন উপায়ে আমি হ্যারি মুক্তি পাবো না। এবার বলো আমার পরিকল্পনা সঠিক কিনা। ফ্রান্সিস থামল। বন্ধুদের মধ্যে গুঞ্জন শুরু হল। কিছু পরে শাঙ্কো উঠে দাঁড়িয়ে বলল—ফ্রান্সিস

তোমার পরিকল্পনা আমরা মেনে নিলাম। অন্য দু'চারজন বন্ধুও বলল—আমাদের কোন আপত্তি নেই।

—আমি তোমাদের কাছ থেকে এটাই আশা করেছিলাম। ফ্রান্সিস বলল। তারপর বসে পড়ল। একটু পরেই শুয়ে পড়ল।

পরেরদিন সকালের খাবার খেয়ে ভাইকিংরা তৈরি হল। সকলেরই চিন্তা সামনে অনেক কাজ।

ঢং ঢং শব্দে কয়েদঘরের দরজা খুলে গেল। একজন প্রহরী দরজায় দাঁড়িয়ে বলল—তোমরা কোন দু'জন বন্দী থাকবে? হ্যারি উঠে দাঁড়িয়ে ফ্রান্সিসকে দেখিয়ে বলল—ও আর আমি।

—বেশ। বাকিরা বেরিয়ে এসো। রাজার হুকুম মুক্তি পেয়ে তোমরা সবাই তোমাদের জাহাজে চলে যাবে। এই রাজ্যে থাকবে না। প্রহরী বলল।

—ঠিক আছে। শাঙ্কো বলল।

এবার সবাই একে একে কয়েদঘর থেকে বেরিয়ে এল। গর্ভগৃহগুলোর মধ্যে দিয়ে হেঁটে সিঁড়ির কাছে এল। দেখল সিঁড়ির গোড়ায় মন্ত্রীমশাই দাঁড়িয়ে। মন্ত্রীমশাই ওদের দিকে তাকিয়ে বলল—সব শুনেছি। তোমাদের দুই বন্ধু কি পারবে গুপ্ত ধনভাণ্ডার উদ্ধার করতে?

—চেষ্টা তো করুক। শাঙ্কো বলল।

—না পারলে কিন্তু নতুন রাজা সহজে ছেড়ে দেবে না।

—হতে পারে। তবে আমাদের দুই বন্ধুকে কয়েদঘরে রাখা অসম্ভব। শাঙ্কো বলল।

—দেখা যাক। মন্ত্রী বললেন।

সিঁড়ি দিয়ে শাঙ্কোরা ওপরে উঠে এল। চলল দক্ষিণমুখো রাজ্যের সীমান্তের দিকে। রাজা আভিন্দার সৈন্যরা দেখল সেটা। পাহাড়টা জঙ্গল বাঁদিকে রেখে শাঙ্কোরা অনেক দূরে চলে এল।

শাঙ্কো হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল। গলা চড়িয়ে বলল—আর দূরে যাবো না। এবার পাহাড় জঙ্গলের আড়ালে আড়ালে পাহাড়ে যাবো।

সবাই ফিরে দাঁড়াল। ফিরে চলল পাহাড়ের দিকে। নিঃশব্দে। পাহাড়টার তলায় এসে সবাই থামল। তারপর দল বেঁধে পাহাড়ে উঠতে লাগল। কিছুদূর উঠতেই একটা গুহা দেখতে পেল। গুহার মুখে এসে দাঁড়াল। শাঙ্কো আস্তে আস্তে গুহার মধ্যে ঢুকল। বাইরের আলো থেকে এসে কিছুই দেখতে পেল না। অন্ধকার চোখে সরে আসতে দেখল গুহাটা খুবই ছোটো। ও গুহা থেকে বেরিয়ে এল। বন্ধুদের কাছে এসে বলল—গুহাটা ছোট। বড় গুহা খুঁজতে হবে। চলো সব। ওপর দিকে। ওপর দিকে উঠে ওরা গুহা খুঁজতে লাগল। পেলও একটা গুহা।

শাঙ্কো গুহাটায় ঢুকতে যাবে, চারপাঁচজন যোদ্ধা খোলা বর্শা হাতে ছুটে এল। বন্ধুরা দাঁড়িয়ে পড়ল। শাঙ্কো যোদ্ধাদের দেখেই বুঝল—ওরা রাজা পারকোনের যোদ্ধা। গায়ে নীল পোশাক। শাঙ্কো দ্রুত দুহাত ওপরে তুলে বলল—আমরা ভাইকিং। তোমাদের বন্ধু। রাজা পারকোনের যোদ্ধারা দাঁড়িয়ে পড়ল। ওরা শাঙ্কোদের চিনল—ভাইকিং এরা। শাঙ্কো এগিয়ে গেল। বলল—রাজা পারকোন কোথায়?

—এই গুহাতেই আছেন। একজন যোদ্ধা বলল।

—আমাদের তাঁর কাছে নিয়ে চলো। শাঙ্কো বলল।

—এসো। একজন যোদ্ধা বলল।

সবাই গুহার মধ্যে ঢুকল। অন্ধকার চোখে সরে আসতে সবাই দেখল একটা মোটা কাপড়ের ওপর রাজা পারকোন বসে আছেন। বেশ বড় গুহা। আর যোদ্ধারা ছড়িয়ে ছিটিয়ে শুয়ে বসে আছে। একপাশে উনুন জ্বেলে রান্না হচ্ছে। শাঙ্কোর খিদে বেড়ে গেল। সেই সকালে খেয়েছে। এখন শেষ বিকেল। গুহার পাথরের গর্তে মশাল জ্বলছে।

শাঙ্কো রাজা পারকোনের কাছে গেল। রাজা পারকোন হেসে বললেন—তোমরা আমার প্রাণ বাঁচিয়েছো। তোমাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

—কিন্তু মান্যবর, আপনি এখনও আপনার রাজত্ব ফিরে পান নি।

একটু চুপ করে থেকে রাজা পারকোন বললেন—সে কি আর ফিরে পাবো?

—নিশ্চয়ই পাবেন। আমরা আপনাকে আপনার রাজত্ব ফিরিয়ে দেব। শাঙ্কো বলল।

—সেটা কি পারবে? রাজা পারকোন বললেন।

—সেটা নির্ভর করছে আপনার সৈন্যদল কতটা আমাদের সাহায্য করতে পারবে তার ওপর। কারণ আমরা সংখ্যায় বেশি নই। আপনার অন্য সৈন্যরা কোথায় আছে? শাঙ্কো জানতে চাইল।

—এই পাহাড়ের কোন গুহায় পাহাড়ের নিচের জঙ্গলে। পারকোন বললেন।

—তাদের আমরা একত্র করবো। তারপর সময় সুযোগ বুঝে নতুন রাজা আভিন্দার সৈন্যদের আক্রমণ করবো। শাঙ্কো বলল।

—লড়াই হবে।

—নিশ্চয়ই লড়াই হবে। আমরা অবশ্যই জয়ী হবো। আপনি নিশ্চিত জানবেন। শাঙ্কো বলল।

—দেখ চেষ্টা করে। রাজা বললেন।

—এবার আমাদের খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা করুন। সেই সকালে খেয়ে বেরিয়েছি। আমরা ক্ষুধার্ত। শাঙ্কো বলল।

—নিশ্চয়ই ব্যবস্থা হবে। রাজা পারকোন গলা চড়িয়ে ডাকলেন—

—মিনাকা—। মিনাকা রান্নার জায়গাতে ছিল। রাজার কাছে এগিয়ে এল।

—এদের খেতে দাও। রাজা পারকোন বললেন।

—এদের জন্যে রান্না করা হচ্ছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই খাবার দেওয়া হবে। মিনাকা নিজের জায়গায় চলে গেল।

কিছুক্ষণ পরে মিনাকা শাঙ্কোর কাছে এল। বলল—আপনারা খেতে আসুন।

শাঙ্কোরা খেতে বসল। কোন গাছের তিনকোনা পাতা পেতে দেওয়া হল। খেতে দেওয়া হল রুটি আর আনাজপাতির ঝোল। ক্ষুধার্ত শাঙ্কোরা তাই পেট পুরে খেল। তারপর শুয়ে বসে বিশ্রাম করতে লাগল।

শাঙ্কো আর দেরি করল না। মিনাকাকে নিয়ে সন্ধ্যের মুখে গুহা থেকে বেরিয়ে গেল। পাথর ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে অন্য গুহার খোঁজ করতে লাগল। মিনাকাই ওকে একটু দূরের এক গুহামুখে নিয়ে এল। বলল—এই গুহাতেও কিছু সৈন্য আশ্রয় নিয়েছে। গুহামুখে দাঁড়িয়ে মিনাকা আস্তে করে নাম ধরে ডাকল। একজন যোদ্ধা বর্শা হাতে বেরিয়ে এল। মিনাকাকে দেখে বলল—এসো। মিনাকা আর শাঙ্কো গুহাটায় ঢুকল। গুহায় মশাল জ্বলছে। সেই আলোয় শাঙ্কো দেখল প্রায় ত্রিশ-চল্লিশজন যোদ্ধা গুহার মেঝেয় শুয়ে বসে আছে। শাঙ্কো গলা চড়িয়ে বলল—ভাইসব আমরা ভাইকিং। আমরা স্থির করেছি নতুন রাজা আভিন্দাকে এই রাজ্য থেকে তাড়াবো। তোমাদের সঙ্গে আমরাও লড়াই করবো। রাজা পারকোনকে তাঁর রাজত্ব ফিরিয়ে দেব। সময় হলেই তোমাদের ডাকা হবে। তোমরা লড়াইয়ের জন্যে তৈরি থেকো। শাঙ্কো থামল। যোদ্ধারা কেউ কোন কথা বলল না। মিনাকা গলা চড়িয়ে বলল—বন্ধুরা—এটাই শেষ লড়াই। আমাদের জিততেই হবে।

দুজনে গুহা থেকে বেরিয়ে এল। চলল পাহাড়ের পূবদিকে। এবার পেল একটা ছোট গুহা। সেখানেও দশ-পনেরোজন রাজা পারকোনের যোদ্ধাদের পেল। শাঙ্কো গলা চড়িয়ে তাদেরও একটা কথা বলল। বেরিয়ে এল।

বাইরে চাঁদের আলো বেশ উজ্জ্বল। সেই আলোয় খুঁজে খুঁজে মিনাকা শাঙ্কোকে আর একটা গুহার মুখে নিয়ে এল। মশালের আলোয় দেখা গেল এখানেও ত্রিশ-চল্লিশজন যোদ্ধা রয়েছে। শাঙ্কো আগের কথাগুলো বলল। যোদ্ধারা নীরবে কথাগুলো শুনল। কেউ কোন কথা বলল না।

বাইরে এসে মিনাকা বলল—আর সব গুহা রাজা রবার্তোর রাজত্বের দিকে। ঐসব গুহায় বোধহয় কেউ আশ্রয় নেয়নি। এবার চলুন নিচের জঙ্গলে। শুনেছি সেখানেও কিছু যোদ্ধা আত্মগোপন করে আছে।

দু'জনে পাহাড় থেকে নিচের বনজঙ্গলে নেমে এল। ছাড়া ছাড়া গাছের

জঙ্গল। গাছের ডালপাতার ফাঁক দিয়ে এখানে ওখানে ভাঙা জ্যোৎস্না পড়েছে। কিছুদুর যেতে ওরা দেখল তিন-চারটে গাছের জটলা। সেই জটলার মাথায় ডাল কেটে তৈরি ডালপাতার ছাউনি। সেই ছাউনির কাছাকাছি আসতে অন্ধকার থেকে একটা বর্শা ছুটে এল। লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে বর্শাটা মিনাকোর মাথার পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল। দুজনেই সঙ্গে সঙ্গে বসে পড়ল। মিনাকো চাপাস্বরে বলল—আমি মিনাকো। বর্শা ছুঁড়ো না। সেই ছাউনি থেকে দুজন যোদ্ধা বর্শা হাতে বেরিয়ে এল। ভাঙা জ্যোৎস্নায় মিনাকোকে চিনল। শাঙ্কোকে দেখিয়ে বলল—এঁরা ভাইকিং। দুঃসাহসী। তোমাদের কিছু বলবেন। শোন। শাঙ্কো চাপাগলায় আগের কথাগুলো বলল। ছাউনির ভেতর থেকে আরো কিছু যোদ্ধা বেরিয়ে এল। সবাই শাঙ্কোর কথা শুনল। কিছু বলল না। শুধু একজন যোদ্ধা বলল—আমরা তৈরি থাকবো।

শাঙ্কোরা রাজা পারকোনের গুহায় ফিরে এল।

ওদিকে ফ্রান্সিস গুপ্ত ধনভাণ্ডারের খোঁজে সব গর্ভগৃহেই খোঁজ করতে লাগল। তিন চারদিন ধরে খোঁজ চলল। হ্যারি সঙ্গেই থাকলো।

সেদিন হ্যারি বলল—ফ্রান্সিস—কিছু হদিশ করতে পারলে?

—আমরা প্রথম যে গর্ভগৃহে নেমেছিলাম সেই গর্ভগৃহটা রাজা পারকোনের পিতামহ প্রথম তৈরি করেছিলেন। ওটাতেই আছে গুপ্ত ধনভাণ্ডার। এখন ঐ গর্ভগৃহের কোথায় গোপনে রাখা আছে সেই ধনভাণ্ডার এটাই খোঁজ করতে হবে। অন্য গর্ভগৃহগুলোও খুঁটিয়ে দেখেছি। সেসব গর্ভগৃহ পরে তৈরি হয়েছে। কাজেই প্রথম গর্ভগৃহই খুঁটিয়ে দেখতে হবে।

—সেটাই দেখ। হ্যারি বলল।

—হুঁ। কিন্তু এখন শুধু খোঁজার ভান করবো। সেসব দেখে রাজা আভিন্দা খুশিই হবে। আগে লড়াই। তারপর ভালোভাবে খোঁজ করবো।

পরদিনই ফ্রান্সিসরা দেখল বেশ বড় এক সৈন্যদল সৈন্যাবাস ছেড়ে রাজা কাদর্জার রাজত্বের দিকে চলেছে। তার মানে রাজা আভিন্দা এখন নিশ্চিন্ত। ধরেই নিয়েছে আর লড়াইয়ের সম্ভাবনা নেই। কাজেই বড় একদল সৈন্য পাঠিয়ে দিচ্ছে। ফ্রান্সিস খুশির স্বরে বলে উঠল—

—হ্যারি আমি এটাই চাইছিলাম। আভিন্দার যে সৈন্যরা রইল তারা যতটা নিশ্চিন্ত হবে ততটাই ওরা হার স্বীকার করবে। আর দেরি না। কালকে গভীর রাতে রবার্তোর সৈন্যাবাস আক্রমণ করতে হবে। দুজনে নয়। আমি কাল একা দুপুরে শাঙ্কোদের খোঁজে যাবো। খবর দেব। কালকে রাতেই আক্রমণ করা হবে। আর সময় নষ্ট করবো না।

পরদিন দুপুরে ফ্রান্সিস একজন প্রহরীকে বলল—আমি ঐ পাহাড়ের নিচের জঙ্গলে যাচ্ছি। গুপ্তধনের খোঁজ করতে।

হয়ে গেল। শুধু দূরের বন থেকে ভেসে আসছে গাছের ডালপাতায় বয়ে যাওয়া বাতাসের শন্‌শন্‌ শব্দ।

ফান্সিস আকাশর দিকে তাকাল। উজ্জ্বল চাঁদ। চারদিকে জ্যোৎস্নার ছড়াছড়ি। তারায় ছাওয়া আকাশ। ভাবল—কোথায় আমার মাতৃভূমি। আর কোথায় আমি ডালপাতার আড়ালে ঘাসের ওপর শুয়ে আছি। অপেক্ষা করছি এক রক্তক্ষয়ী লড়াইয়ের জন্য। যদি এই লড়াই করতে গিয়ে মরে যাই। ফ্রান্সিস মাথা ঝাঁকিয়ে এই চিন্তাটা তাড়াল।

রাত গভীর হল। ফ্রন্সিস পাশ ফিরে পাহাড়ের দিকে তাকাল। শাঙ্কোরা এখনও আসছে না।

কিছু পরেই ও ফিস্‌ ফিস্‌ ডাক শুনল—ফ্রান্সিস। ফ্রান্সিস দ্রুত উঠে দাঁড়াল। দেখল বন্ধুরা তরোয়াল হাতে দাঁড়িয়ে। সঙ্গে বর্শা হাতে রাজা পারকোনের যোদ্ধারা। সংখ্যায় তারা কম নয়।

চাঁদের আলোয় সবই দেখা যাচ্ছিল। ফ্রন্সিস হাত বাড়িয়ে সৈন্যবাসের সামনের দিকে সবাইকে যেতে ইঙ্গিত করল। সৈন্যাবাসের বারান্দায় উঠে ফ্রান্সিস সবাইকে ভাগ ভাগ করে ঘরের দরজার সামনে দাঁড় করাল। দু'জন যোদ্ধাকে দাঁড় করালো অস্ত্রঘরের সামনে কোন প্রহরী ছিল না।

এবার ফ্রান্সিস চাপা গলায় যোদ্ধাদের মধ্যে ঘুরে ঘুরে বলল—দরজা বন্ধ থাকলে লাথি মেরে ভাঙো। ঘরে ঢুকে আক্রমণ কর। একটু থেমে ফ্রান্সিস এবার বলে উঠল—ভাঙো একসঙ্গে।

ভাইকিংরা যোদ্ধারা একসঙ্গে দরজায় লাথি মারতে লাগল। সময়ের একটু এদিক ওদিক হতে দরজা ভেঙে যেতে লাগল । সৈন্যদের ঘুম ভেঙে গেল। কিন্তু কিছু বুঝে ওঠবার আগেই ভাইকিংরা তরোয়াল হাতে। যোদ্ধারা বর্শাহাতে আভিন্দার সৈন্যদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। নিরস্ত্র সৈন্যরা মরতে লাগল আহত হতে লাগল। কয়েকজন সৈন্য অস্ত্রঘরের সামনে এল। দেখল—বর্শা উচিয়ে দু'জন যোদ্ধা দাঁড়িয়ে। ওরা লাফ দিয়ে প্রান্তরের ওপর নামল তারপর ছুটে পালাতে লাগল। যারা মারা গেল না তেমন আহত হল না। তারা প্রান্তরে নেমে ছুটে পালাতে লাগল। আহতদের আর্তনাদে গোঙানিতে ভরে উঠল সৈন্যাবাস। আভিন্দার সৈন্যরা সহজেই হার স্বীকার করল। ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে বলল—আর কাউকে হত্যা করবে না। বন্দী কর। ভাইকিংরা সৈন্যাবাসের মালখানা থেকে দড়ি নিয়ে এল। আভিন্দার সৈন্যদের বন্দী করতে লাগল।

ওদিকে গর্ভগৃহের সৈন্যাবাসের সৈন্যরা এই লড়াইয়ের শব্দ চিৎকার আর্তনাদ অস্পষ্ট শুনল। এই গর্ভগৃহে বেশি সৈন্যদের রাখা যাচ্ছিল না বলে রাজা আভিন্দা ওপরে সৈন্যদের জন্য বাড়ি তৈরি করিয়েছিল। সেই সৈন্যরা হেরে গেল। এবার

গর্ভগৃহের সৈন্যাবাস থেকে সৈন্যরা বেরিয়ে এল। প্রান্তরের ওপর আসতে ফ্রান্সিস এক বন্ধুর হাত থেকে তরোয়াল নিয়ে ওদের দিকে ছুটে গেল। বাঁ হাত তুলে বলে উঠল—তোমরা অস্ত্র ত্যাগ কর। লড়াই করতে এলে কেউ বাঁচবে না। ওপরের সৈন্যাবাসের সবাই হার স্বীকার করেছে। তোমরাও আত্মসমর্পণ কর। লড়াই মৃত্যু রক্তপাত আমরা চাই না।

সৈন্যরা থমকে দাঁড়াল। দেখল ভাইকিংরা রাজা পারকোনের সৈন্যরা ওদের চেয়ে অনেক বেশি। ওদের জেতার কোন উপায় নেই। একজন সৈন্য তার বর্শা মাটিতে ফেলে দিল। একে একে সবাই বর্শা ফেলে দিল। সবাইকে বন্দী করা হল।

তখন আকাশ সাদাটে হয়ে গেছে। পূব আকাশে কমলা রং ধরেছে। সূর্য উঠতে দেরি নেই।

ওদিকে বাইরের লড়াইয়ের শব্দ রাজা আভিন্দার কানে এল। সে বিছানা ছেড়ে উঠে সৈন্যাবাসের দিকে গেল। একজন সৈন্যও নেই। তাহলে ওপরে লড়াই চলছে।

আভিন্দা ওপরে উঠে এল। তখন সূর্য উঠেছে। নিস্তেজ রোদ পড়েছে প্রান্তরে সৈন্যাবাসে। সেই আলোয় রাজা আভিন্দা দেখল তার সৈন্যরা সব বন্দী। তখনও আহতদের গোঙানি শোনা যাচ্ছে।

ফ্রান্সিস এগিয়ে এল। ফ্রান্সিসের দিকে তাকিয়ে আভিন্দা বলল—আমার সৈন্যরা হেরে গেছে।

—হ্যাঁ। আপনার হাত বাঁধবো না। তবে আপনাকে এই মুহূর্তে যে অবস্থায় আছেন সেই অবস্থায় জামিনায় আপনার নরপশু রাজা কাদর্জার কাছে চলে যেতে হবে। আবার রাজা পারকোন এখানকার রাজা হবেন।

—কিন্তু গুপ্তধন? আভিন্দা বলল।

—গুপ্তধনের আশা ছাড়ুন। ফ্রান্সিস বলল।

—তাহলে গুপ্তধন খুঁজে দেবে বলে তুমি আমাকে ধোঁকা দিয়েছিলে? আভিন্দা বলল।

—হ্যাঁ। আপনাকে এখান থেকে তাড়াতে। তবে সেই গুপ্তধন আমি নিশ্চয়ই খুঁজে বের করবো। তবে সেটা পাবেন রাজা পারকোন। আপনি বা কাদর্জা নন।

আভিন্দা ভালো করেই বুঝল লড়াইয়ে সে হেরে গেছে। এখন এই রাজত্ব ছেড়ে চলে যাওয়া ছাড়া কোন উপায় নেই। বলা যায় না যেতে না চাইলে হয়তো এরা তাকে ফাঁসিও দিতে পারে।

—আমার ব্যক্তিগত সম্পদ কিছু নিয়ে যেতে পারবো না? আভিন্দা জানতে চাইল।

—না। যে পোশাক পরে যে ভাবে আছেন সেই ভাবেই এই রাজ্য আপনাকে ছেড়ে যেতে হবে। ফ্রান্সিস বলল।

আভিন্দা আর কিছু বলল না। প্রান্তরের ওপর দিয়ে উত্তরমুখো হেঁটে চলল। ফ্রান্সিস আভিন্দার বন্দী সৈন্যদের দিকে তাকিয়ে বলল—আভিন্দার সঙ্গে সঙ্গে তোমরাও বিদেয় হও। আর এখানে লড়াই করতে এসো না।

বন্দী সৈন্যরা আভিন্দার পেছনে পেছনে চলল। কিছু পরে ওরা প্রান্তরের শেষে চলে গেল।

এবার ফ্রান্সিস শাঙ্কোর দিকে তাকাল। বলল—শাঙ্কো তুমি রাজা পারকোনের গুহায় যাও। রাজাকে সসম্মানে এখানে নিয়ে এসো। এখন আমার দুটো কাজ—রাজা পারকোনকে তাঁর রাজত্ব ফিরিয়ে দেওয়া আর গুপ্ত ধনভাণ্ডার উদ্ধার।

শাঙ্কো কিছু বলল না। চলল উত্তরমুখো পাহাড়টার দিকে।

ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে বলল—রাজা পারকোনের সৈন্যদের আর বন্ধুদের বলছি—যুদ্ধে আমরা জয়ী হয়েছি। ভাইকিংরা ধ্বনি তুলল—ও—হো—হো। পারকোনের সৈন্যরাও বর্শা উঁচিয়ে হৈ হৈ করে উঠল। ফ্রান্সিস বলল—এবার তোমরা বিশ্রাম করতে পারো। বন্ধুরা, সৈন্যরা চলে গেল।

ফ্রান্সিস প্রান্তরেই দাঁড়িয়ে রইল।

কিছুক্ষণ পরে শাঙ্কোর সঙ্গে রাজা পারকোন এলেন। প্রায় ছুটে এসে ফ্রান্সিসকে জড়িয়ে ধরলেন। বলে উঠলেন—সাবাস ফ্রান্সিস। তোমার জন্যেই আমি আমার রাজত্ব ফিরে পেলাম।

—এবার গর্ভগৃহে আপনার রাজসভাঘরে চলুন। আপনাকে আপনার সিংহাসনে বসিয়ে আমি আমার কর্তব্য শেষ করতে চাই। ফ্রান্সিস বলল।

—বেশ। চলো। রাজা পারকোন বললেন।

সম্মুখে রাজা পারকোন পেছনে ফ্রান্সিস শাঙ্কোরা এগিয়ে চলল গর্ভগৃহের দিকে। সবাই সিঁড়ি দিয়ে নামল। রাজসভাঘরে এল। রাজা পারকোন গিয়ে সিংহাসনে বসলেন। তখনই মন্ত্রীমশাই এলেন। শাঙ্কো তাঁকে ধরে ধরে মন্ত্রীর আসনে বসিয়ে দিলেন।

মন্ত্রী ফ্রান্সিসের দিকে তাকিয়ে বললেন—তুমি আমাদের মহামান্য রাজাকে তাঁর রাজত্ব ফিরিয়ে দিলে। কিন্তু আর একটা কাজ যে রইল।

—গুপ্ত ধনভাণ্ডার খুঁজে বের করা। ফ্রান্সিস বলল।

—হ্যাঁ। মন্ত্রী বললেন।

—এবার খোঁজাখুঁজি শুরু করবো। ফ্রান্সিস বলল।

—ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি তুমি যেন সফল হও। মন্ত্রী বললেন।

—মহামান্য রাজা—ফ্রান্সিস বলল—আমি সব গর্ভগৃহই খুঁজেছি। আমার দৃঢ়

—তোমার বন্ধু যাবে না? প্রহরী জানতে চাইল।

—না। আমি একাই যাবো। রাজা জানতে চাইলে বলবে। ফ্রান্সিস বলল।

—বেশ। প্রহরী বলল।

ফ্রান্সিস পাহাড়ের দিকে চলল। কিছু পরে জঙ্গলে ঢুকল। কিছুদূর যেতে যেতে ডালপালা ছাওয়া ছাউনিটা দেখল। ফ্রান্সিস সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর আস্তে আস্তে দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। সঙ্গে সঙ্গে বর্শা হাতে তিন চারজন যোদ্ধা ছুটে বেরিয়ে এসে ফ্রান্সিসকে ঘিরে দাঁড়াল। ফ্রান্সিসও সঙ্গে সঙ্গে দু হাত তুলে চাপাস্বরে বলে উঠল—আমি ভাইকিং। তোমাদের বন্ধু। যোদ্ধারা বর্শা নামাল। ফ্রান্সিস বলল—আজ গভীর রাতে নতুন রাজা আভিন্দার সৈন্য রাজা কাদর্জার রাজ্যে চলে গেছে। ওদের সৈন্য সংখ্যা কমে গেছে। এখনই লড়াইয়ের ঠিক সময়। রাজা আভিন্দা ছেড়ে যেতে বাধ্য। তোমাদের ঠিক সময়ে ডাকা হবে। তোমরা লড়াইয়ের জন্যে তৈরি থাকবে। আমি রাজা পারকোনের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি। তোমরা নিশ্চয়ই জানো উনি কোথায় আছেন? একজন যোদ্ধা এগিয়ে এল। বলল—চলুন। রাজা পারকোনের কাছে আপনাকে নিয়ে যাচ্ছি।

তাহলে খুবই ভালো হয়। ফ্রান্সিস বলল।

যোদ্ধাটি এগিয়ে চলল। পেছনে পেছনে ফ্রান্সিসও চলল।

বনের মধ্য দিয়ে যেতে যেতে যোদ্ধাটি বলল—তাহলে আপনি কিছু সৈন্যকে চলে যেতে দেখেছেন।

—হ্যাঁ। রাজা আভিন্দার সৈন্য সংখ্যা কমে গেছে। এই সুযোগ আর আসবে না।

বনের পরে যোদ্ধাটি পাহাড়ের ঢাল বেয়ে উঠতে লাগল। পেছনে ফ্রান্সিসও চলল।

একসময় ওরা রাজা পারকোনের গুহার সামনে এল। দু'জন যোদ্ধা বর্শা হাতে ছুটে এল। যোদ্ধাটিকে বিকেলের আলোয় দেখে বর্শা নামাল।

দু'জনে গুহার মধ্যে ঢুকল। শাঙ্কো ছুটে এল। ফ্রান্সিসের হাত ধরে রাজা পারকোনের কাছে নিয়ে এল। ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে রাজা আভিন্দার সৈন্যসংখ্যা কমে যাওয়া আর আক্রমণের পরিকল্পনা সবই বলল।

—সন্দেহ নেই বর্তমান অবস্থা আমাদের অনুকূলে। কিন্তু পারবে কি ওদের হারাতে? রাজা পারকোন বললেন।

অনায়সে পারবো। আপনি নিশ্চিন্তে থাকুন। আপনার রাজ্য আপনাকে ঠিক ফিরিয়ে দিতে পারবো। নতুন রাজা আভিন্দাকে এই রাজ্য থেকে তাড়াবো। ফ্রান্সিস বলল।

—দেখো চেষ্টা করে। পারকোন বললেন।

ফ্রান্সিস এবার শাঙ্কোর দিকে তাকাল। বলল রাজার সব সৈন্যকে বলেছো এই লড়াইয়ের কথা?

—হ্যাঁ বলেছি তৈরি থাকতে। সময়মতো সবাইকে জমায়েত করবো। শাঙ্কো বলল।

—আজ গভীর রাতে আক্রমণ করবো। তুমি সবাইকে জড়ো করে রাজা আভিন্দার সৈন্যাবাসের পেছনে নিয়ে আসবে। তারপর নিদ্রিত সৈন্যদের ওরা কিছু বোঝার আগেই আক্রমণ করবো। বুঝেছো? ফ্রান্সিস বলল।

—কিন্তু তুমি কয়েদঘর থেকে বেরোবে কী করে? শাঙ্কো জানতে চাইল।

—আমি আর কয়েদঘরে ফিরে যাবো না। সন্ধ্যের পর থেকেই সৈন্যাবাসের পেছনের চেষ্টনাট গাছটার নিচে থাকবো। ফ্রান্সিস বলল্।

কিন্তু হ্যারি একা থাকবে। ওর কোন বিপদ হবে না তো। শাঙ্কো বলল।

—না। কারণ রাজা আভিন্দা ধরে নেবে বন্ধুকে কয়েদ রেখে পালাবো না। ঠিক ফিরে আসবো। তাছাড়া শুধু আজকের রাতটা। কাল ভোরের এই রাজ্যের ইতিহাস পাল্টে যাবে। ফ্রান্সিস বলল।

—ঠিক আছে। আমরা শেষ রাতে যাবো। শাঙ্কো বলল।

ফ্রান্সিস বসে ছিল। এবার উঠে দাঁড়াল। বলল—মাননীয় রাজা আমি যাচ্ছি। কাল সকালে আপনি আবার এই রাজ্যের রাজা হবেন।

ভাইকিং বন্ধুদের কাছে এল ফ্রান্সিস। বলল ভাইসব—শাঙ্কোকে সব বলে গেলাম। ও যা বলবে শুনবে। শক্ত দেহমন নিয়ে লড়াই করবে। আমাদের জয় হবেই।

—ফ্রান্সিস—তোমার জন্যে আমরা জীবন দিতে প্রস্তুত। বিস্কো বলল।

—সেটা জানি বলেই আজকে রাতের লড়াইয়ে নামতে যাচ্ছি। ফ্রান্সিস বলল।

ফ্রান্সিস গুহার বাইরে এল। মিনাকা এগিয়ে এল। বলল চলুন আপনাকে অন্য দিক দিয়ে পাহাড় থেকে নামিয়ে দিচ্ছি যাতে রাজা অভিন্দার সৈন্যদের নজরে না পড়েন। তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। ফ্রান্সিস কিছু জংলা গাছের ডাল দিয়ে আস্তে আস্তে রাজা আভিন্দার সৈন্যদের আবাসের পেছনে চেস্টনাট গাছটার নিচে পাতলা ডালপাতার আড়াল তৈরি করে মাটিতে শুয়ে পড়ল। ওখান থেকে সৈন্যবাসে সৈন্যদের চলাফেরা কথাবার্তার শব্দ পাচ্ছিল।

রাত হল। সৈন্যাবাসে ঘন্টা বাজল। রাতের খাওয়া শুরু হল। খাওয়াদাওয়া শেষ হল। ফ্রান্সিসদের ক্ষুধাবোধটা এবার মাথা চাড়া দিল। কিন্তু আজ রাতে কিছু খাওয়া হবে না। একেবারে নির্জলা উপোস।

সৈন্যরা যে যার ঘরে এসে শুয়ে পড়ল। কিছুক্ষণের মধ্যেই চারদিক নিস্তব্ধ

বিশ্বাস এই গর্ভগৃহগুলোর কোন একটাতেই আছে গুপ্ত ধনভাণ্ডার। এবার আমার একটা প্রশ্ন—প্রত্যেক গর্ভগৃহের পাথুরে ছাদে আছে চাকার মত কিছু। ওগুলো কী?

ওগুলো আমাদের রাজবংশের প্রতীক চিহ্ন। তাছাড়া ওগুলোর ফাঁকফোকর দিয়ে বাইরের বাতাসও চলাফেরা করে। রাজা পারকোন বললেন।

—এছাড়া ওগুলোর আর কোন গুরুত্ব নেই? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—না। পারকোন মাথা নাড়লেন।

—ওগুলো সবই কি পাথরের? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—হ্যাঁ। পাথর কেটেই ওগুলো বানানো হয়েছে। রাজা বললেন।

—কে তৈরি করে বসিয়েছিলেন? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—আমার প্রপিতামহ। উনিই ওগুলো তাঁর আদেশেই তৈরি হয়েছিল এবং লাগানো হয়েছিল। রাজা বললেন।

—আপনি নিজে কি কখনও ওগুলো ওপরে উঠে কাছ থেকে দেখেছিলেন? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—না—না। অত উঁচুতে উঠে—প্রয়োজন মনে করি নি। রাজা বললেন।

—আমি ঐ প্রতীক চিহ্নগুলো কাছ থেকে ভালো করে দেখবো। ফ্রান্সিস বলল।

—বেশ। দেখো। কথাটা বলে রাজা পারকোন সিংহাসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। মন্ত্রীও উঠে দাঁড়ালেন।

রাজা বললেন—আমার একটু বিশ্রামের প্রয়োজন।

রাজা সিংহাসন থেকে নেমে এলেন। পেছনে মন্ত্রী। দুজনে সিঁড়ির দিকে চললেন। সভা ভঙ্গ হল।

ঘরে এসে ফ্রান্সিস শুকনো গম পাতার বিছানায় শুয়ে পড়ল। হ্যারি এসে পাশে বসল। বলল—কিছু সূত্রটুত্র পেলে?

—না। এখনও পাই নি। তবে গর্ভগৃহগুলো আমি মোটামুটি তন্নতন্ন করে দেখেছি। কিন্তু ধনভাণ্ডার গুপ্তভাবে রাখা যায় এমন কোন জায়গা পাই নি। বাকি আছে ঐ রাজকীয় প্রতীকচিহ্নগুলো খুঁটিয়ে দেখতে। ফ্রান্সিস বলল।

—অত উঁচুতে? কী করে দেখবে? হ্যারি বলল।

—মই বানাবো। গাছের ডাল কেটে। জোড়া দিয়ে দিয়ে মই তৈরি করবো। তারপর মইয়ে উঠে ঐগুলো দেখবো। শাঙ্কোকে বল মন্ত্রীমশাইকে বলে দুটো কুড়ুলের ব্যবস্থা কর। ফ্রান্সিস বলল।

শাঙ্কো চলল কুড়ুল আনতে। মন্ত্রীর নির্দেশে দুটো কুড়ুল পেলও।

ফ্রান্সিস আর শাঙ্কো কুড়ুল নিয়ে গর্ভগৃহ থেকে বেরিয়ে এল। চলল

পাহাড়টার নিচে জঙ্গলের দিকে। খুঁজে খুঁজে দুটো টানা লম্বা গাছ পেল। ফ্রান্সিস কুড়ুল চালিয়ে গাছটা কাটল। দুভাগ করল। খন্ড খন্ড করে ডাল কাটল সিঁড়ির জন্যে। তারপর সেগুলো বুনো শুকনো লতা দিয়ে শক্ত করে বাঁধল। কিছুক্ষণের মধ্যেই একটা উঁচু মই হয়ে গেল।

মই নিয়ে ফিরে এল দুজনে। ফ্রান্সিস বলল—প্রথমে দূরের গর্ভগৃহগুলো দেখবো। চলো।

দূরের গর্ভগৃহটায় এল দুজনে। মেঝেয় এসে দাঁড়াল। গর্ভগৃহের লোকেরা বেশ অবাক হয়েই ওদের কান্ড দেখতে লাগল। মই পাতা হল। ফ্রান্সিস সিঁড়ির ধাপ বেয়ে বেয়ে পাথুরে ছাদের কাছে উঠে গেল। তারপর হাত বাড়িয়ে ঢালমত প্রতীকটা ধরল। ওটার ফোকরগুলোয় হাত রাখল। বাতাস লাগল হাতে। জোর বাতাস নয়। হালকা বাতাস। ফ্রান্সিস হতাশ হল। তাহলে হাওয়া চলাচলের জন্যেই প্রতীকগুলো গেঁথে বসানো হয়েছে।

ফ্রান্সিস মই বেয়ে নেমে এল। শাঙ্কো বলল—তাহলে হাওয়া চলাচলের জন্যেই ওগুলো গাঁথা হয়েছে।

—হ্যাঁ। তাই তো দেখলাম। ফ্রান্সিস বলল।

—অন্য গর্ভগৃহগুলো দেখবে? শাঙ্কো বলল।

—হ্যাঁ। একটা প্রতীক পাবোই যেটা অন্য কারণে গাঁথা হয়েছে। ফ্রান্সিস বলল।

—তাহলে সব কটাই খুঁটিয়ে দেখতে হয়। শাঙ্কো বলল।

—তাই দেখবো। চলো। ফ্রান্সিস বলল।

পরের গর্ভগৃহে এল। ফ্রান্সিস মই বেয়ে উঠল। ততক্ষণে গর্ভগৃহের অধিবাসীরা মই ঘিরে দাঁড়িয়ে পড়েছে। ফ্রান্সিস মইয়ে চড়ে কী দেখছে সেটা ওরা বুঝল। জন্মাবধি ঐ প্রতীকচিহ্ন ওরা দেখে আসছে। কারো মনেই কোনদিন ওটা নিয়ে কোন ঔৎসুক্য জাগে ওরা বুঝল না এই বিদেশীরা ওটা এভাবে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে কেন।

এবারও ফ্রান্সিস হাত বাড়িয়ে মৃদু বাতাস অনুভব করল। তাহলে এগুলো হাওয়া চলাচলের জন্যেই গাঁথা হয়েছে। প্রতীকচিহ্নও রাখা হল আবার ফোকর রেখে বাতাস চলাচলের পথও হল।

একে একে সব গর্ভগৃহের প্রতীকগুলোই দেখা হল। কিন্তু কোন প্রতীকচিহ্নেই নতুনত্ব কিছু নেই। একইরকমভাবে তৈরি সব। ফ্রান্সিস চিন্তায় পড়ল। তবে কি কোন গর্ভগৃহের দেওয়ালে লুকোনো কোন গর্ত আছে? তাহলে তো এবার দেওয়ালগুলো খুঁটিয়ে দেখতে হয়। ফ্রান্সিস শাঙ্কোকে বলল সে কথা।

শাঙ্কো বলল—তাহলে তো সেভাবেই সন্ধান চালাতে হবে।

—তার আগে প্রথম গর্ভগৃহটা দেখতে হয়। এটাই দেখা বাকি। এই গর্ভগৃহটাই রাজা পারকোনের পিতামহ প্রথম তৈরি করেছিলেন। এখানেই রাজাদের সভাঘর। রাজা পারকোনের পূর্বপুরুষরা এই গর্ভগৃহের সিংহাসনে বসেই রাজত্ব করে গেছেন। কাজেই এই গর্ভগৃহের গুরুত্ব রয়েছে। চলো।

প্রথম গর্ভগৃহটায় নামল ওরা। সভাঘরের ওপাশেই যোদ্ধাদের থাকবার ঘর। ফ্রান্সিসরা যখন মই বসাচ্ছে তখনই দুজন তিনজন করে যোদ্ধারা মইয়ের কাছে এসে দাঁড়াল।

ফ্রান্সিস সিঁড়ির মাথায় চলে এল। ভালো করে তাকিয়ে দেখল এই প্রতীকচিহ্নে কোন ফোকর নেই। এটা অন্যরকম। হাত দিয়ে ছুঁতেই হাত পিছলে গেল। পাথর নয় কাচ। কাচের তৈরি এই প্রতীক চিহ্ন। কালো রং করা। তার ভেতরটা অস্পষ্ট। কিছুই দেখা যাচ্ছে না। সবগুলো পাথরের। এটা কাচের কেন? ফ্রান্সিস চমকে উঠল। তাহলে কি এর ভেতরেই কি রাখা আছে গুপ্ত ধনভাণ্ডার?

ফ্রান্সিস নিচের দিকে তাকিয়ে ডাকল—শাঙ্কো?

—বলো। শাঙ্কো ওপরের দিকে তাকিয়ে বলল।

—একটা পাথরের টুকরো নিয়ে এসো।

শাঙ্কো ঘরের এদিক ওদিক তাকিয়ে পাথরের টুকরো খুঁজল। পেলও। পাথরের টুকরোটা নিল। মই ছেড়ে সরে যাওয়া চলবে না। কাজেই ও পাথরের টুকরোটা ফ্রান্সিসের দিকে ছুঁড়ে দিল। ফ্রান্সিস লুফে নিল। তারপর কাচটার ওপরের দিকে আস্তে আস্তে ঠুকতে লাগল। যোদ্ধারা অবাক হয়ে ফ্রান্সিসদের কান্ড দেখতে লাগল।

বারকয়েক আস্তে আস্তে ঠুকে একবার জোরে ঠুকল। কাচ ভেঙে ফুটো হয়ে গেল। কাচের টুকরো নিচে পড়ল। যোদ্ধারা দেখল। পাথর থেকে কাচ পড়ছে। সবাই হতবাক।

ফ্রান্সিস ভাঙা কাচের ফুটো দিয়ে তাকিয়ে আবছা দেখল হীরে পান্না বসানো নেকলেস-এর অংশ। ফ্রান্সিস এক মুহূর্ত চুপ করে রইল। স্থির মইয়ে দাঁড়িয়ে রইল। এখানেই মহামূল্যবান অলঙ্কার-টলঙ্কার সোনার চাকতিও থাকতে পারে। এইসব যদি নিচে পড়ে যায় তাহলে যোদ্ধারা আর সাধারণ লোকেদের মধ্যে লুঠ করার জন্যে হুড়োহুড়ি পড়ে যাবে। খুনোখুনিও লেগে যেতে পারে। এত মূল্যবান গুপ্ত ধনভাণ্ডার। লোভার্ত মানুষেরা উন্মাদ হয়ে যাবে।

ফ্রান্সিস মই বেয়ে বেয়ে আস্তে আস্তে নিচে নেমে এল। দু'তিনজন যোদ্ধা এগিয়ে এল। একজন বলল—কী ব্যাপার? ওখানে উঠেছিলে কেন?

—বাতাস চলাচলের ফোকর খুঁজে গিয়েছিল। মেরামত করে দিয়ে এলাম।

—ও। যোদ্ধাটি মুখে শব্দ করল। যোদ্ধারা সাধারণ লোকেরা একজন দু'জন করে চলে যেতে লাগল।

—পেয়েছো? শাঙ্কো ওদের দেশীয় ভাষায় চাপাস্বরে বলল।

—হ্যাঁ। ফ্রান্সিসও দেশীয় ভাষায় বলল—শিগগির রাজার কাছে যাও। রাজা যেন এক্ষুনি তাঁর দেহরক্ষীদের নিয়ে এখানে আসেন। কোন ব্যস্ততা দেখিও না।

শাঙ্কো আস্তে আস্তে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগল। ওপরে উঠেই ছুটল রাজার গর্ভগৃহের দিকে। সিঁড়ি দিয়ে দ্রুত নেমে রাজার শয়নকক্ষের সামনে আসছে তখনই দেহরক্ষীরা ওকে আটকাল। শাঙ্কো বলল—শিগগির রাজা পারকোনকে আসতে বলো। গুপ্তধন উদ্ধার করা হয়েছে।

রাজার দেহরক্ষীরা রাজার শয়নকক্ষে ঢুকে রাজাকে সংবাদটা জানাল। শোবার পোশাক পরেই রাজা পারকোন বেশ দ্রুত শয়নকক্ষ থেকে বেরিয়ে এলেন। হেসে বললেন—গুপ্তধন পাওয়া গেছে?

—হ্যাঁ। আপনি কয়েকজন সশস্ত্র দেহরক্ষী নিয়ে আসুন।

—কোথায়? রাজা জানতে চাইলেন।

—আপনার সভাগৃহের গর্ভগৃহে।

রাজা প্রহরীদের আসতে ইঙ্গিত করে সিঁড়ির দিকে চললেন।

রাজার সঙ্গে সবাই সেই গর্ভগৃহে নামল। শাঙ্কো মইয়ের নিচে তখনও কিছু অত্যুৎসাহী লোক আর যোদ্ধরা দাঁড়িয়ে আছে।

রাজাকে দেখে সবাই সরে দাঁড়াল। রাজা ফ্রান্সিসকে বললেন—তুমি উদ্ধার করতে পেরেছো?

ফ্রান্সিস বলল—হ্যাঁ। তারপর ওপরের প্রতীক চিহ্নটি আঙ্গুল তুলে দেখিয়ে বলল—ওটা পাথরের তৈরি নয়। কাচের তৈরি। কালো রং করা। ওটা ভাঙলে মহা মূল্যবান হীরে মুক্তো সোনা ঝরে পড়বে। আপনার প্রহরীদের বলুন—সেসময় এই জায়গাটা ঘিরে রাখতে।

—বেশ। তুমি কাচ ভাঙো। রাজা বললেন। তারপর প্রহরীদের গোল করে দাঁড় করালেন।

ফ্রান্সিস সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠল। তারপর হাতের পাথরটা সজোরে কাচের ঢাকনাটায় ঘা মারল। কালো কাচ ভেঙে পড়ল। সঙ্গে ঝর ঝর করে পড়তে লাগল দামি দামি অলঙ্কার সোনা রুপোর চাকতি। মেঝের ঝরে পড়ল সেসব। যোদ্ধারা লোকেরা অবাক বিস্ময়ে সেই গুপ্ত ধনভাণ্ডারের দিকে তাকিয়ে রইল। ফ্রান্সিস বা শাঙ্কো অবাক হল না। এরকম দৃশ্য ওরা আগেও দেখেছে।

রাজা পারকোনও বিস্ময়ে হতবাক। দীর্ঘদিন চেষ্টা করেও এই গুপ্ত ধনভাণ্ডার তিনি উদ্ধার করতে পারেননি। তিনি হা হা করে হাসতে হাসতে মূল্যবান হীরের অলঙ্কার মুক্তোর মালা দুহাতে তুলে তুলে রেখে দিতে লাগলেন।

তারপর হাসি থামিয়ে দুজন দেহরক্ষীকে বললেন—তোমরা এইসব একটা কাপড়ে বেঁধে নিয়ে আমার সঙ্গে চলো। দেহরক্ষী দুজন একটা কাপড় পেতে সেই গুপ্ত ধনভাণ্ডার বাঁধল। সেটা তুলে নিয়ে রাজা পারকোনের পেছনে দাঁড়াল।

এবার রাজা পারকোন ফ্রান্সিসের দিকে তাকিয়ে বললেন—তোমারও তো কিছু প্রাপ্য হয়।

—না। আমরা কিছু নেব না। একটাই বিনীত নিবেদন—রাজা তুরীন যেন তাঁর প্রাপ্য পান।

—এই ধনভাণ্ডার আমার পূর্বপুরুষের। তুরীনের প্রাপ্য হয় কী করে? রাজা পারকোন বললেন।

—কিন্তু গুপ্ত ধনভাণ্ডারের কিছু অংশ রাজা তুরীনও পাবেন এই কথা বলেই আপনাদের শত্রুতা আমি মিটিয়েছিলাম।

—সে পরে দেখা যাবে। রাজা পারকোন বললেন।

—ঠিক আছে। না হয় পরেই দেখবেন। ফ্রান্সিস বলল।

উদ্ধার করা ধনভাণ্ডার নিয়ে রাজা পারকোন চলে গেলেন।

ফ্রান্সিস বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে গলা চড়িয়ে বলল—ভাইসব—এখন আমরা জাহাজে ফিরে যাবো। আর সময় নষ্ট করবো না।

গর্ভগৃহ থেকে সবাই বেরিয়ে এল। চলল দক্ষিণমুখো। ওদিকেই বন্দর, যেখানে ওদের জাহাজ রয়েছে।

কিছুদূর যেতেই পূব আকাশে কমলা রং ছড়িয়ে সূর্য উঠল। ফ্রান্সিসরা হাঁটতে লাগল।

জাহাজঘাটে যখন পৌঁছল তখন একটু বেলা হয়েছে। ফ্রান্সিসরা দেখল মারিয়া আর কয়েকজন ভাইকিং জাহাজের রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে আছে।

ভাইকিংরা জাহাজে উঠতে উঠতে ধ্বনি তুলল—ও—হো—হো। মারিয়া হাসিমুখে এগিয়ে এল। ফ্রান্সিস হেসে বলল—মারিয়া এবারও আমার হাত খালি। কিছুই আনতে পারিনি।

—আমার তাতে কোন দুঃখ নেই। মারিয়া হেসেই বলল।

ফ্রান্সিস ডাকল—ফ্রেজার। ফ্রেজার এগিয়ে এল।

—এখনই জাহাজ ছাড়ো—আমাদের মাতৃভূমির দিকে। সবাই হৈ হৈ করে উঠল। তারপর যে যার কাজে লেগে গেল।

ঘর্ ঘর্ শব্দে নোঙর তোলা হল। জাহাজ চলতে শুরু করল। খুলে দেওয়া পালে জোর হাওয়া লাগল। হাওয়ার তোড়ে পালগুলো ফুলে উঠল।

পূর্ণবেগে জাহাজ সমুদ্রের ঢেউ ভেঙে চলল।